রবি-দীপিতা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

যদানন্দাভিষেকেন চেতো মম নবায়তে।
তৎপ্রীতিপূতচিত্তেন তুভ্যমেতৎ প্রদীয়তে॥

আলোচন

আলোচন বলিতে বুঝা যায় দেখা—দেখা শব্দটির অর্থের যে কোথায় আরম্ভ, কোথায় শেষ, তাহার সীমারেখা নির্ণয় করা সুকঠিন। কবি যে দৃষ্টিতে তাঁহার কাব্য বা কবিতাকে কাব্যরচনার সময় দেখেন, সে দৃষ্টির মধ্যে কাব্যের বস্তুভাগ শব্দ ও ছন্দের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকিয়া রসাবেগের মধ্যে স্পন্দিত হইতে থাকে। সেই স্পন্দিত সত্তা একটি পূর্ণ সত্তা। সেই সত্তার মধ্যে বস্তু বা অর্থ, শব্দ ও ছন্দ, ইহাদের কাহাকেও পৃথক করিয়া পাওয়া যায় না। হৃদয়ের পদ্মকোরকের মধ্যে যেমন সমস্ত শিরা ও ধমনীর রক্তস্রোত তালে তালে নাচিয়া উঠিয়া জীবশরীরের প্রাণপ্রক্রিয়াকে তাহার স্বচ্ছন্দগতিতে প্রতিষ্ঠিত করে, অথচ সেই শোণিতনর্ত্তনের মধ্যে অবিভক্তভাবে অবস্থিত বিচিত্র প্রণালীকে পৃথক করিয়া দেখা যায় না, তেমনি কবির হৃদয়স্পর্শের মধ্যে যে অমূর্ত্ত আলোচন রূপ-পরিগ্রহের বেদনায় অন্তর্গূঢ় তপঃপ্রেরণার ফলে আপনাকে কাব্যশরীরে বিভক্ত করে, সেই আলোচনের মধ্যে শব্দ, অর্থ, ছন্দ, রস বিভজ্যমান অথচ অবিভক্ত হইয়া কবিচিত্তকে স্পন্দিত করিয়া তোলে। কোনও কোনও চিন্তাশীল লেখক বলেন, যে কবিচিত্তের অনুভূতিব মধ্যে এই যে কাব্যের আদিম আলোচন ইহাই কাব্যসৃষ্টি। কারণ ইহা একদিকে যেমন অনুভব, অপরদিকে তেমনি প্রকাশ। ধ্বন্যাকারে যাহা সৃষ্টি তাহা বাহ্য ও গৌণ সৃষ্টি মাত্র, কবিহৃদয়ের কাব্যের আলোচনেই কাব্যের সৃষ্টি।

দ্বিতীয় স্তরে দেখা যায় যে কবি তাঁহার রসানুভূতিকে যখন অজ্ঞাত বীক্ষা-শক্তি esthetic activity) দ্বারা শব্দ ও ছন্দের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার তপস্যায় নিরত থাকেন, তখন নানা বিরোধী শব্দের আকর্ষণ হইতে আপনাকে আপন রসযোগমার্গে ধারণ করিবার চেষ্টায় বাহ্য আভ্যন্তর এই উভকেই বিধারণ করিয়া তাঁহার একটি আলোচনক্রিয়া চলে, যাহার ফলে কবি তাঁহার রসানুগামী শব্দ, অর্থ

ছন্দ ও উপমাকে অনুকূল সন্নিবেশবৈচিত্র্যে বিভবশালী করিয়া তুলিয়া অন্তর্লোকের সাক্ষাৎকারকে বহির্লোকে মূর্ত্ত করিয়া তোলেন।

তৃতীয় স্তরে দেখা যায় যে কবি তাঁহার মূর্ত্ত সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার অমূর্ত্ত সৃষ্টির প্রতিবিম্ব দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ওঠেন, ইহাই তাঁহার তৃতীয় আলোচন।

ইংরাজীতে Personality নামে একটি শব্দ আছে, কিন্তু তাহার পরিচয়ের বিশেষ নির্ণয় নাই। সেইজন্য এই শব্দটির আড়ালে বিদ্যা অপেক্ষা অবিদ্যার প্রাচুর্য্য বেশী। কোন বিখ্যাত দার্শনিক বলিয়াছেন, যে "Quality of Personality is known to me because I have Perception—in the strict sense of the word—of one being which possesses the quality, namely myself."

এই প্রসঙ্গে অনেক তত্ত্বালোচনার দ্বার উন্মোচিত হইতে পারে, কিন্তু তত্ত্বে পৌঁছান যাইতে পারে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অনেকে বলেন, যে কবিতা কবির personalityর প্রকাশ। এখানে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ যে বিশেষ খাটে, তাহা মনে হয় না। কবি যে তাঁহাকে জানেন তাহারই পরিচয় যে তাঁহার কবিতায় পাওয়া যায় একথা বলা চলে না। কিন্তু কবি তাঁহার কবিতায় যাহা প্রকাশ করেন, তাহার একদিকে আছে ভোগ, আনন্দোপলব্ধি, অপরদিকে আছে বস্তু বা অর্থ। কোন্ বস্তুকে অবলম্বন করিয়া কবির আনন্দোপলব্ধি কি রকম বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় তাঁহার অন্তরকে রঙ্গীন্ করিয়া তোলে, শব্দ, ছন্দ ও উপমার ত্রিদণ্ডের উপরে কবি তাহাই সংস্থাপিত করিয়া লোকলোচনের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করেন। প্রত্যেক আনন্দোপভোগেরই একটি বিশেষ রীতি আছে, বৈশিষ্ট্য আছে, স্বতন্ত্রতা আছে। ইহা মানুষের সমগ্র ইতিহাসের সহিত জড়িত। চিত্তপটের ভাবপদ্ধতির মধ্যে ইহার নিয়ন্ত্রণের সূত্রটি ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা জন্মান্তর মানেন, তাঁহাদের মতে মানুষের চিত্তপটের ভাবপদ্ধতির ইতিহাস অনাদি। এই অনাদি ইতিহাসকে তাঁহারা বাসনা বলেন। যাঁহারা জন্মান্তর মানেন না, তাঁহাদের মতে এই ইতিহাসের ফল লইয়াই মানুষের আরম্ভ। ইহাই মানুষের চিত্তধাতু।

এই চিত্তধাতুর সংস্পর্শে আসিয়া সমস্ত জীবনের সর্ব্ববিধ অনুভব অন্তরের মধ্যে যে রূপ পায়, সেই রূপের প্রতিফলনে বিভিন্ন বস্তু আবার বিভিন্ন বিভিন্নরূপে নানামুখী আনন্দধারার সম্পাতে চিত্তকে অভিষিক্ত করিয়া তোলে। কবি তাঁহার সমগ্র চিত্ত লইয়া যখন কোন বিষয়-বস্তুর সম্মুখীন হন, তখন তাঁহার চিত্তধাতুর সম্পর্কে সেই বিষয়বস্তু যে নবতর রূপ ধারণ করে কবি তাহা আলোচন করেন। আপনাকে বাহিরে, ও বাহিরকে আপনার মধ্যে, এই যে আলোচন, ইহাই শিল্পীর আলোচন, কবির আলোচন। সেইজন্য কবির চিত্তধাতু যেমন নানা বিষয়বস্তুর সম্পর্কে আসিয়া তরুণ বনস্পতির ন্যায় নানা দিক হইতে রস আকর্ষণ করিয়া, পত্রে পুষ্পে আপনাকে মঞ্জরিত করিতে থাকে, তেমনি কবিচিত্তের সুপ্ত, অর্দ্ধসুপ্ত ও সুপ্রকট ভাবধারার নব নব সন্নিবেশবৈচিত্র্যের অনুরূপ গতিতে, কাব্যসৃষ্টির নব নব বিকাশ উৎপন্ন হইতে থাকে। কাব্যপথের পথিক আপন কাব্যযাত্রার মধ্যে তাঁহার জীবনের গতির পদচিহ্ন রাখিয়া যান। সোমলতার যেমন প্রতি তিথিতে একটি একটি নূতন পত্রোদ্গম হয়, কবিরও তেমনি জীবনের পরিস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন মসীচিহ্নিত পত্রোদ্গম হইয়া থাকে। এই হিসাবে কবির কাব্য তাঁহার চলন্তজীবনের এক একটি স্বতন্ত্র ছবি মাত্র। রবীন্দ্রনাথের জীবন যেমন দীর্ঘ তেমন নিত্য-নব-চঞ্চলতায়, নানা ভঙ্গীতে লীলায়িত। এই সমগ্র জীবনকে কবি নিজেও হয়ত একদৃষ্টিতে আলোচন করিতে পারেন না। সেদিন যাহা প্রত্যক্ষ ছিল, স্ফুট ছিল, উপভোগ্য ছিল, আজ নানা অনুভূতির অতিথি-সমাগমে তাহার পদচিহ্ন ম্লান। কাল যাহা দিনের আলোকের ন্যায় উগ্র ছিল, আজ তাহা জ্যোৎস্নাপাতের ন্যায় নবনীতকোমল। জীবনকে কোথাও বাঁধিয়া রাখা যায় না, তাই কবির সমগ্র কাব্যকে কবি তাহার চিত্তের মধ্যে সমালোচন করিয়া রাখিতে পারেন না। অনেক বিষয় আমরা প্রত্যক্ষতঃ দেখিয়া জানি (knowledge by acquaintance), আর অনেক বিষয় আমরা লক্ষণের দ্বারা জানি (knowledge by description)। কিন্তু যাহা জানি তাহা ছাড়াও আরও নানাবিধ সংস্কার ও বিশিষ্ট ভাবপদ্ধতি চিত্তপটকে বিচিত্রভাবে সংগঠিত করিয়া রাখে—'জানা'

'অজানার' মধ্যে আত্মপরিবর্ত্তন করিয়া এমন করিয়া চিত্তপটের বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করে, যে সমস্তের সমবায়ে আমাদের চিত্ত বনস্পতির ন্যায় বিশিষ্টরূপে ও লাবণ্যে জৈব প্রক্রিয়ার ন্যায় একটি বিশিষ্ট চিত্তপ্রক্রিয়ায় চিত্তজগতের আহার্য্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া বিশিষ্টরসে ও ভোগে প্রচুর হইয়া আপন চিত্তলীলায় জীবনযাত্রা সম্পাদন করে। চিত্তের এই যে সমগ্র ও বিশিষ্ট রূপ তাহাই কবিপ্রেরণা, কাব্যসৃষ্টি ও কাব্যোপভোগের মূল। এই সমগ্র-পুরুষটি তাহার জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, সুখ, দুঃখ, দ্বেষ, আকর্ষণ, আত্ম-জিজ্ঞাসা, আত্মানুসন্ধিৎসা, এই সমস্তকে লইয়া যে দৃষ্টিতে রূপময় লোকজগৎ ও ভাবময় আলোকজগৎকে নিরীক্ষণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে তাহাই কবির আলোচন। স্ফুট, সুপ্ত ও প্রসুপ্ত সমস্ত অনুভব লইয়া যে সমগ্র-পুরুষটি তাহার জীবনের মাল্য হইতে একটি পুষ্প আনিয়া আমাদের সম্মুখে ধরে, তাহার মধ্যে তাহার জীবনের সম্পূর্ণ পরিচয় গুপ্ত হইয়া থাকে। সেই পুষ্পটি হয়ত তাহার জীবন-মাল্যের একটিমাত্র অনুভব হইতে প্রসূত, কিন্তু সেই অনুভবটি তাহার সমগ্র জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত, একাত্মীভূত হইয়াছিল এবং সেইজন্যই সমগ্র-পুরুষের সর্ব্বাঙ্গীন অনুভবের সহিত তাহার যে পরিচয় রহিয়াছে, সে পরিচয় কখনই তাহা হইতে বিযুক্ত হইতে পারে না।

যে আলোচক কবির কাব্য কবির সমগ্র-পুরুষীয় অনুভবের সহিত একান্বয়ে দেখিতে চেষ্টা করে তাহার প্রধান বিপদ এই যে কবির সমগ্র-পুরুষের সহিত তাহার অপরোক্ষ যোগ নাই। কবির নিজের পক্ষেও তাঁহার কাব্যসমালোচন করার বিপদ কম নহে, কারণ নিজের সমগ্র-পুরুষীয় অনুভবটি কবির কাছেও কাব্য রচনার সময় কিংবা কাব্য সমালোচনের সময় অপরোক্ষ নহে। কবির অনুভবটি যখন তাঁহার হৃদয়-সাগর হইতে অমৃত-পাত্র লইয়া কাব্যাকারে উদ্ভূত হয়, তখন সেই সাগরের জলে তাঁহার সমস্ত শরীর অভিষিক্ত হইয়া থাকে, এবং সাগরমাতার নাড়ী-বন্ধনের যোগ তাঁহার মধ্যে থাকিয়াই যায়। সে যোগের পদ্ধতি কোনরূপে কোনও কোনও অংশে অনুমেয়, কিংবা অর্থাপত্তিগম্য কিন্তু অপরোক্ষ নহে। সেইজন্য

সমস্ত সমালোচকের পক্ষেই কোন কবির কাব্যকে তাঁহার সমগ্র-পুরুষীয় অনুভবের সহিত একান্বয়ে আলোচন করিবার সুযোগ সম্ভব নয়।

কিন্তু কবির কাব্যকে যে কেবলমাত্র সেই কবিরই সমগ্র-পুরুষীয় অনুভবের সহিত একান্বয়ে আলোচন করিতে হইবে এমন কোনও দাবী ন্যায়সঙ্গত নহে। সাগরগর্ভসম্ভূতা লক্ষ্মীর পরিচয় যে কেবল সাগরেই পাওয়া যায় তাহা নহে, তাঁহার পরিচয় গৃহে গৃহে প্রত্যেকের হৃদয়ের পূজামন্দিরে। কবি যে পুষ্পকে তাঁহার মাল্য হইতে খসাইয়া দিলেন, তাহা তাঁহা হইতে সমুদ্ভূত হইলেও তাহা তাঁহার একান্ত নিজস্ব নহে, তাহা বিশ্বমানবের। প্রত্যেক মানুষের সমগ্র-পুরুষীয় অনুভবের সহিত একান্বয়ে তাহার এক একটি নূতন পরিচয় আছে, সেজন্যই কাব্যবিচারে এত মতভেদ। এই বিভিন্ন মতগুলি যতই পরস্পরবিরোধী হোক, তাহাদের প্রত্যেকটিরই সেই সেই মানবহৃদয়ে একটি পরিস্ফুট স্থান আছে। কবির সমগ্র-পুরুষীয় অনুভবের সহিত যদি দৈবক্রমে তাহাদের কোনও একটির মিলও থাকে, তথাপি তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। যদি জানাও যাইত তাহা হইলেও তাহাই যে সেই কাব্যের যথার্থ আলোচন, তাহাও বলা যাইত না। কবির সমগ্র-পুরুষীয় ক্ষেত্র হইতে ব্যাপকতর ক্ষেত্রের সংস্পর্শে আসিলে কবির কাব্য আরও মহিমময় হইয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে। বকুলের ফুল বকুলতলায় যে সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে, ভক্তের অর্ঘ্য লইয়া শিবলিঙ্গের উপরে তাহার প্রকাশ তা অপেক্ষা অধিক মহিমময়। কবির কাব্যরচনাই যে রচনা তাহা নয়, আলোচনও একটি মহতী রচনা। উভয়ের মধ্যে এইটিই প্রধান পার্থক্য, যে কবির রচনা দৃশ্য বিষয় ও তাহার স্বকীয় অনুভবকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, সমালোচকের রচনা উৎপন্ন হয় কবির কাব্যকে লইয়া। উভয়েরই উদ্ভূতি সমগ্র-পুরুষীয় অনুভব হইতে। সমালোচক যখন কবির কাব্য পড়েন, তখন কবির সমগ্র কাব্যের মধ্যে তাহার যে সমগ্র-পুরুষীয় অনুভবটি স্তরে স্তরে প্রকাশ লাভ করিয়াছে, সমালোচক সেই সমগ্র-পুরুষীয় অনুভবটির সহিত নিজের সমগ্র-পুরুষীয় অনুভবের পরিচয় করিবার চেষ্টা করেন।

এই পরিচয় সম্বন্ধের ফলে একদিকে যেমন রস উৎপন্ন হয়, অপরদিকে তেমনি জ্ঞানের দিকের, প্রবৃত্তির দিকের, কর্ম্মের দিকের, নানা অভিব্যঞ্জনায় সমালোচকের চিত্ত ভাবময়, প্রকাশময় হইয়া উঠে। পৃথিবীর সৌন্দর্য্যকে কবি যখন আমাদের কাছে ফিরাইয়া দেন, তখন তাহা হইতে অনেক মহত্তররূপে তাহা বিতরণ করেন। তিনিই আদর্শ সমালোচক, যিনি কবির দানের মহত্ত্বকে মহত্ত্বস্বরূপে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। এরূপ আদর্শ সমালোচক পাওয়া কঠিন, কিন্তু তথাপি আদর্শকে খর্ব্ব করা যায় না। কিন্তু সমালোচনের এখানে একটি সীমারেখা আছে, যে তাহা কবির সমগ্র কাব্যের অনুগত হইবে ও তাহার তাৎপর্য্যকে প্রকাশ করিবে। এই আনুগত্যকে অবহেলা করিয়া কেবল ব্যোমমার্গে বিচরণ করিবার অধিকার সমালোচকের নাই। কিন্তু এই আনুগত্যকে রক্ষা করিয়া সমালোচকের রচনা একদেশস্থ হইয়াও কবির সমগ্র কাব্যকে যখন প্রদীপের ন্যায় অভিপ্রদীপ্ত করিয়া তোলে, তখন সেই অভিপ্রদীপ্তির ফলে যদি কবির কাব্যের সঙ্গতিতে তাহার তাৎপর্য্য স্বরূপটি বিচিত্র ব্যঞ্জনায় ব্যাপকতর ও উত্তানদীর্ঘ হইয়া উঠে, তবেই সমালোচকের রচনা সার্থক হইবে। কবির মধ্য দিয়া কবির সহিত একাত্মযোগে সমালোচক তাহার আত্মপরিচয় দিয়া থাকে।

কবির কাব্য বিশ্লেষণ করিলে তাহাতে পাওয়া যায় শব্দ, অর্থ, এই উভয়ের সন্নিবেশবৈচিত্র্যে ছন্দ, উপমা ও ধ্বনি। ধ্বনি প্রধানতঃ দ্বিবিধ, বস্তুধ্বনি ও রসধ্বনি। রসধ্বনি লইয়া কোনও সমালোচনা চলে না। তাহা দুইটি সমগ্র-পুরুষীয় পরিচয়ের দ্রবীভাবে হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি মাত্র। বিশ্লেষণে তাহাকে পাওয়া যায় না। তাহা একান্ত সাঙ্ঘটিক বা synthetic। কিন্তু রসধ্বনির ভিত্তিস্বরূপে যেখানে একটি জ্ঞান-প্রক্রিয়া থাকে, একটি মর্ম্মকথা বা তত্ত্বদৃষ্টি থাকে, সমালোচক তাহাকে পরিস্ফূর্ত্ত করিতে পারে না। সুধী সমাজে অনেকদিন হইতে এই একটি দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, যে কাব্য বুঝিবার জন্য সমালোচনের আবশ্যক আছে কি না। চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এই দ্বন্দ্ব অনেক পরিমাণে নির্ম্মূল, কারণ রস বুঝাইতে যদিও সমালোচনের আবশ্যক নাই, তথাপি বস্তুধ্বনি বুঝাইতে, কাব্যের

পঞ্জরীভূত সত্যকে বুঝাইতে সমালোচনের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। যে কাব্য কেবলমাত্র রসধ্বনি লইয়া ব্যস্ত, যাহাতে বস্তুধ্বনি অত্যন্ত শিথিল, সে কাব্যের আলোচন বাগাড়ম্বর মাত্র। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে একথা খাটে না। কারণ রসধ্বনির মর্ম্মস্বরূপ হইয়া যে বস্তুধ্বনি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বিঘটন বা analysisএর দ্বারা লোক-লোচনের সম্মুখে না আনিলে সেই বস্তুধ্বনির অনুগত রসধ্বনিও স্ফুট হইয়া উঠিতে পারে না এবং সেইজন্য রসপ্রতীতির অস্ফুটতা ও বিলম্ব একরূপ অনিবার্য্য। রবীন্দ্রনাথের জীবনটি কাব্যলীলায় ফুটিয়া উঠিয়াছে সেজন্য তাঁহার কাব্যগুলির সহিত পরস্পর একটি নিগূঢ় একান্বয় সম্পর্ক রহিয়াছে। এই একান্বয় সম্পর্ককে না বুঝিতে পারিলে কবির সমগ্র-পুরুষীয় অনুভবের সহিত পরিচয় দুর্ঘট এবং সেইজন্য যে সমালোচক কবির কাব্যগুলিকে একান্বয়ে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন তিনি যে কেবল বস্তুধ্বনিকে, তত্ত্বদৃষ্টিকে, কবির পঞ্জরীভূত সত্যকে প্রকাশ করেন তাহা নয়, কবির কাব্যের রসাস্বাদেরও প্রচুর অনুকূলতা করেন।

রবি-প্রভব কাব্যকে আমার অল্পবিষয় মতির দ্বারা প্রকাশ করিতে পারিব এই দুরাশা লইয়া এই সমালোচনগুলি লিখিত হয় নাই। তাঁহার কাব্য পড়িয়া মনে যে স্পন্দন আসিয়াছে, আমারই চিত্তবিনোদনের জন্য তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইহা রবীন্দ্রনাথের প্রকাশের দীপিকা নহে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দ্বারা চিত্তের যে উদ্দীপনা অনুভব করিয়াছি তাহারই ক্ষণস্থায়ী স্ফুলিঙ্গ মাত্র। হয়ত রবীন্দ্রনাথকে স্থানে স্থানে বুঝিয়াছি, হয়ত বুঝি নাই! কতটুকু বুঝিয়াছি, কতটুকু বুঝি নাই, তাহা পাঠকেরা বিচার করিবেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ মাসিকপত্রে লিখিয়াছি। প্রথম দুইটি প্রবন্ধ প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন আমি চলতি ভাষায় লিখিতাম, সেইজন্য এই দুইটি প্রবন্ধের সহিত অন্য তিনটি প্রবন্ধের ভাষাগত অনুযোগিতা নাই। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্রপরিষদে পাঁচ বৎসর ধরিয়া অনেক কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি, নানা মাসিকপত্রে অনেক

প্রবন্ধ প্রকাশিতও হইয়াছে। সুযোগ হইলে সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। নানা কার্য্যভারের মধ্যে দুর্লভ অবসরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, অতি অল্পদিনের মধ্যে শেষের তিনটি প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। সেইজন্য স্থানে স্থানে হয়ত প্রকাশভঙ্গীর দীনতা লক্ষিত হইবে, মুদ্রাকর প্রমাদেরও অভাব ঘটে নাই। তথাপি আমার ছাত্রী শ্রীমতী সুরমা মিত্র এম্-এ অনেক সময় প্রুফ দেখিয়া সাহায্য না করিলে মুদ্রাকর প্রমাদ ও অন্যবিধ প্রমাদ আরও বেশী ঘটিত তাহাতে সন্দেহ নাই, সেইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

রবি-দীপিতা

কড়ি ও কোমল

রবীন্দ্রনাথের "মানসী" কাব্যটিকে আমরা যে অবস্থায় পাই তাহাতে সৃষ্টির অনিয়মের নিবিড় উত্তাপ ও উচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হ'য়ে গেছে। শক্তির প্রবল তাড়নায় নিরালম্ব শূন্যের উপর ভর করে যে ঘূর্ণীপাক হয়েছিল, লক্ষ্যহীন অনুসন্ধানের মধ্যে আত্মপ্রকাশের গভীর মর্ম্মবেদনায় যে ঘন বাষ্প ও ধূমরাশি আপনাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল, সৌন্দর্য্যময় আনন্দলোকের সৃষ্টিনিয়মের মধ্যে "মানসী"তে তার পরিস্ফূর্ত্ত উন্মেষের সন্ধান পাওয়া যায়। কৈশোরক, ভানুসিংহের পদাবলী, সন্ধ্যা সঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত, ছবি ও গান, প্রকৃতির পরিশোধ, কড়ি ও কোমল, মায়ার খেলা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নানা রূপের বিচিত্র সমাবেশে কাব্য-লক্ষ্মীর যে সুন্দর ছবিটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল "মানসী"তে তাহাই পরিকল্পিত-সত্ত্বযোগ হ'য়ে পূর্ণ প্রাণের দীপ্তি নিয়ে আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে।

সেই জন্য আমরা এর পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে দেখতে পাই যে কবি বুঝতে পারছেন, যে, তাঁর এমন একটা কিছু বলবার আছে, যা বলতে পারলে তাঁর জীবনের কৃত্য শেষ হ'য়ে গেল, এবং যা বলবার জন্যে তাঁর প্রাণ ছটফট করছে, অথচ সে কথা তিনি মুখ ফুটে বলতে পারছেন না। পাই পাই ক'রে তা পাচ্ছেন না, ছুঁই ছুঁই করে তাকে ধরতে পারছেন না এবং সেই অভাবে তাঁর অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত ব্যথার আঘাতে কম্পিত হ'য়ে উঠছে।

মনে হয় কি একটা শেষ কথা আছে,
যে কথা হইলে বলা সব বলা হয়।
কল্পনা কাঁদিয়া ফেরে তারি পাছে পাছে,
তারি তরে চেয়ে আছে সমস্ত হৃদয়।
শত গান উঠিতেছে তারি অন্বেষণে;
পাখীর মতন ধায় চরাচরময়।
শত গান, মরে গিয়ে, নূতন জীবনে
একটি কথায় চাহে হইতে বিলয়।
সে কথা হইলে বলা নীরব বাঁশরী,
আর বাজাব না বীণা চিরদিন তরে,
সে কথা শুনিতে সবে রবে আশা করি
মানব এখনো তাই ফিরিছে না ঘরে।
সে কথায় আপনারে পাইব জানিতে,
আপনি কৃতার্থ হব আপন বাণীতে।

জন্ম থেকেই কবি অতুল রাজসম্পদের অধিকারী হয়ে জন্মেছিলেন, তাই গোড়া থেকেই আমরা দেখতে পাই যে স্বভাবের সঙ্গে তাঁর মিলন অব্যাহত। বাতাস, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা প্রতিদিনের চারিপাশের বাহিরের জগৎ, সমস্ত জিনিষের সঙ্গে এমন এক নিবিড় গ্রন্থিতে তিনি বদ্ধ ছিলেন এবং তাদের প্রতি স্পর্শে তাঁর হৃদয় এমন করে নেচে উঠত যে তাকে তাঁর অন্তরের অন্তঃপুরের মধ্যে তিনি চেপে রাখতে পারতেন না। তারা আপনা থেকেই উচ্ছল হয়ে উঠে তাঁকে ছাপিয়ে উঠত। আনন্দানুভবের উদ্দাম শক্তিই তাঁকে কাব্য রচনায় নিয়োজিত করেছিল। জগতের সঙ্গে মানুষের গভীর প্রেমই তাঁর কাব্যশক্তির মূল।

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

এই সূর্য্য করে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চির প্রবাহিত,
বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়,
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে ব'লে সকাল বিকাল
নব নব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই।

বিশ্বপ্লাবিত প্রেমের ঢেউ যখন কবিকে নাচিয়ে তুলত, তখন আর তাঁর মনে ধনের গৌরব স্থান পেত না, সমস্ত ছেড়ে দিয়ে কাঙ্গালিনী মেয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন, উৎসবের দিনে তার মলিন বসন দেখে তাঁর চক্ষু সিক্ত হয়ে উঠত। আবার তাঁর যৌবনের প্রৌঢ়তা ভুলে গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে বসে' "বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" গাইতে বসতেন, নয় সাত ভাই চম্পার গল্প বলতে বসতেন। "একরত্তি মেয়ে" "বাবলা রাণী"কে দেখে তাঁর কত আনন্দ, পাখীর পালকের অনাদর দেখে তাঁর কত ব্যথা। কিন্তু তা সত্বেও এ কথা বলতে হবে যে তখনকার দিনে সাগরের ঢেউগুলি এসে ভেঙ্গে ভেঙ্গে তাঁর গায়ে প'ড়ে তাঁকে আকুল করে তুলত, কিন্তু সাগরে ভাসতে তিনি কখনও শেখেন নি। সমস্ত সৌন্দর্য্যকে এক ক'রে দেখতে পারেন নি। হাত, পা, মুখ, চোখ, কান যখন যেটি আঁকতেন তা বেশ চমৎকার করেই আঁকতে পারতেন বটে, কিন্তু সে সমস্তগুলিকে নিয়ে এবং সেগুলিকে ছাড়িয়ে যে এক অনির্ব্বচনীয়, প্রাণময় ছবি, অসীম ও সসীমের আলোছায়ায় বিচিত্র হ'য়ে রয়েছে তার সন্ধান পান নি। সুর ও ছন্দের হাওয়ায় তাঁর কাব্যের ঘুঁড়িখানাকে তিনি আকাশে উড়িয়ে দিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু অন্তরের সুতো যেখানে বাঁধা আছে—সেই নাটাইটা তখনও তিনি হাতে পান নি। তিনি

বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর ঘুঁড়িখানা কোন অসীমে ছুটে যেতে চাচ্ছে ; তাকে ঠেকিয়ে রাখা দায়, তথাপি তার মধ্যে এমন একটা কিসের অভাব রয়েছে যাতে তাঁর সমস্ত চেষ্টা সমস্ত উদ্যম তাঁর নিজের চারিদিকেই বার বার পাক খেয়ে মরছে। কবি তাঁর নিজের শক্তিকে অন্তঃকরণের মধ্যে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, এবং তার প্রামাণ্যে বুঝতে পারছেন যেন লোকে তাঁর কাছে অনেক আশা ক'রে রয়েছে, অথচ তিনি তা দিতে পারছেন না, আর সেই ব্যথাটা তাঁকে সকল সময়েই অঙ্কুশের মতন আহত করছে।

সকলে আমার কাছে যত কিছু চায়
সকলেরে আমি তাহা পেরেছি কি দিতে ?
আমি কি দিইনি ফাঁকি কত জনে হায়
রেখেছি কত না ঋণ এই পৃথিবীতে।
আমি তবে কেন বকি সহস্র প্রলাপ
সকলের কাছে চাই ভিক্ষা কুড়াইতে,
এক তিল না পাইলে দিই অভিশাপ
অমনি কেন রে বসি কাতরে কাঁদিতে।

এই যুগের মাধুর্য্য রসের আস্বাদের মধ্যেও এমন একটা উগ্র গন্ধের আবেশ, এমন একটা অন্ধ আকর্ষণ, এমন একটা বিহ্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়, যে সহজে বুঝতে পারা যায়, শুধু ঐ দিকটা নিয়ে পড়ে থাকতে হলে বেশী দিন চলতে পারত না ; কবির মদির প্রাণের ব্যাকুলতায় তাঁকে পাগল করে রেখেছিল, তিনি সমস্ত জগৎময় একটা প্রেমের স্বপ্ন দেখতেন।

আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মত,
পরাণে পুলক বিকাশিয়া বহে কেন দক্ষিণা বাতাস
যেথা ছিল যত বিরহিণী সকলের কুড়ায়ে নিঃশ্বাস।

বসন্ত কাননে বসন্ত সমীরে প্রিয়ার বারতা শুনতে পেতেন। বসন্তের আবেশের

মধ্যে মিলন চুম্বনের স্পর্শ পেতেন; মেঘের পাশে মেঘ দাঁড়ালে তাদের ক্ষণিক চুম্বনের ছোঁয়াছুঁয়ি দেখতে পেতেন :—

আকাশের দুইদিক হতে দুইখানি মেঘ এল ভেসে
দুইখানি দিশাহারা মেঘ,—কে জানে এসেছে কোথা হ'তে।
সহসা থামিল থমকিয়া আকাশের মাঝখানে এসে,
দোঁহাপানে চাহিল দুজনে চতুর্থীর চাঁদের আলোতে।

* * * * *

মেলে দোঁহে তবুও মেলে না, তিলেক বিরহ রহে মাঝে,
চেনা বলে মিলিবারে চায়, অচেনা বলিয়া মরে লাজে।
মিলনের বাসনার মাঝে আধখানি চাঁদের বিকাশ;
দুটি চুম্বনের ছোঁয়াছুঁয়ি, মাঝে যেন সরমের হাস,
দুখানি অলস আঁখি পাতা, মাঝে সুখ-স্বপন আভাস।
দোঁহার পরশ ল'য়ে দোঁহে ভেসে গেল কহিল না কথা,
বলে গেল সন্ধ্যার কাহিনী, ল'য়ে গেল উষার বারতা।

কবির সমস্ত দেহ মন যেন একটা ঝড়ের দোলায় এক সঙ্গে কেঁপে উঠেছে; কবি আর নিজেকে নিজের মধ্যে সঞ্চিত রাখতে পারছেন না। কবি তখন পঞ্চবিংশতি বর্ষের নবীন যুবক। যৌবনের রঙ্গীন আভায় তাঁর সমস্ত শরীর তখন ঝিম্‌ঝিম্ করছে। মনের চেয়ে দেহের সৌন্দর্য্যই তখন বেশী। শরীরকে আরম্ভ ক'রেই প্রেমের অঙ্কুরের প্রথম উন্মেষ, শরীরকে অবলম্বন ক'রেই তার বৃদ্ধি ও বিকাশ। তখন সাধনার প্রদীপ্ত অনলে অতনুর তনু ভস্ম হয় নাই, সেই জন্যই "কড়ি ও কোমলে"র মধ্যে কবির বাসনাকে আমরা এত প্রদীপ্ত, এত তীব্র, এত মূর্ত্তিমতীরূপে দেখতে পাই।

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন

হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মূরছি পড়িতে চায় তব দেহ পরে।

দেহের সাগরের মধ্যে হৃদয় লুকিয়ে রয়েছে, কবি দেহের মধ্যে ডুব দিয়ে তার মধ্যে সন্ধান পেতে চান;

হৃদয় লুকান আছে দেহের সাগরে
চিরদিন তীরে বসি করি গো ক্রন্দন,
সর্ব্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য মাঝে হইবে মগন।
আমার এ দেহ মন চির রাত্রি দিন
তোমার সর্ব্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।

ওই তনুখানি তব আমি ভালবাসি
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী।

বিস্তারিত ভাবে কড়ি ও কোমল প্রভৃতি গ্রন্থের সমালোচনা আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে সংক্ষেপে এইটুকু বলা যেতে পারে যে এই যুগে দেহের সৌন্দর্য্য নিয়ে তিনি বিভোর ছিলের। বাহু, চরণ, হৃদয়, আকাশ, দেহের মিলন, তনু, হৃদয় আসন, হাসি, পূর্ণ মিলন, শ্রান্তি, বিরহ, বন্দী, বিলাপ প্রভৃতি যে কোনও কবিতা থেকেই তার স্পষ্ট প্রতিভাস পাওয়া যেতে পারে। বৈষ্ণব কবির "প্রতি অঙ্গ কাঁদে মোর প্রতি অঙ্গ লাগি"র চেয়ে এই আবেগ কোন অংশে কম মূর্ত্তিমান নয়। তথাপি এমন একটা ক্ষণ আসৃত, যখন তিনি এতে সন্তুষ্ট থাকৃতে পারতেন না; তাঁর মনের থেকে এমন একটা কিসের সন্ধান এসে তাঁকে জাগিয়ে তুলত যে শুধু এই শরীর নিয়ে থাকাটা তাঁর কাছে নিতান্ত দুঃসহ বোধ হ'ত।

শুধু ইন্দ্রিয় নিয়ে পড়ে থাকলে, সৌন্দর্য্যকে তারি মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে গেলেই, ধীরে ধীরে তাতে বিতৃষ্ণা ও বিরক্তি আসবেই আসবে।

সুখশ্রমে আমি সখি শ্রান্ত অতিশয় ;
পড়েছে শিথিল হ'য়ে শিরার বন্ধন।
অসহ্য কোমল ঠেকে কুসুম-শয়ন,
কুসুম রেণুর সাথে হয়ে যাই লয়।
স্বপনের জালে যেন প'ড়েছি জড়ায়ে
যেন কোন অস্তাচলে সন্ধ্যাস্বপ্নময়
রবির ছবির মত যেতেছি গড়ায়ে ;
সুদূরে মিলিয়া যায় নিখিল নিলয়।
ডুবিতে ডুবিতে যেন সুখের সাগরে
কোথাও না পাই ঠাঁই, শ্বাস রুদ্ধ হয়,
পরাণ কাঁদিতে থাকে মৃত্তিকার তরে।
এ যে সৌরভের বেড়া পাষাণের নয়
কেমনে ভাঙ্গিতে হবে ভাবিয়া না পাই
অসীম নিদ্রার ভরে পড়ে আছি তাই।

অগ্নিময় পিণ্ড থেকে জগতের যে ক্রমবিকাশ হয়েছে তাতে যেমন স্তরের পর স্তর এসে ক্রমশঃ জমাট বেঁধে উঠেছে, কবির চিত্তের ক্রমবিকাশের মধ্যেও প্রাণের ক্রিয়া সেই একই রকমের। একটা যুগের প্রথম প্রকাশের থেকে, ক্রমশঃ সেইটিরই বিকাশ, স্ফূর্ত্তি ও পরিণাম চলতে থাকে ; সেই যুগের যত বিচিত্র সৃষ্টি তা নিতান্তই সেই যুগের। তার ফুল ফল রঙ্‌ঢঙ্ সমস্তই সেই যুগের অনন্যসাধারণ। ক্রমশঃ একটি যুগের পূর্ণ অভিব্যক্তি সম্পন্ন হ'লে সেই যুগের সীমার মধ্যে যখন আর বৃদ্ধির অবকাশ পাওয়া যায় না, এবং নিজের বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিলাসের মধ্যেও অনাগত বিকাশের অপরিস্ফুট বেদনায় যখন সমস্ত সৃষ্টি অভাবক্লিষ্ট ও দীন হয়ে ওঠে তখন প্রাণশক্তির প্রবল অন্তরালোড়নে যে "বহু স্যাম্" উত্থিত হয় তার ফলেই আর একটি নূতন যুগের সৃষ্টি হয় ও তারপর সেই পরবর্ত্তী যুগের মধ্যে নূতন স্তরের নানা বিচিত্র

বিকাশ উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। এক একটি যুগের চিত্তের এক একটি স্তর ক্রমে পরিস্ফুট হ'তে থাকে, কাজেই সেই যুগে যত বিভিন্ন প্রকারের ভাবের উদ্ভব হয় সে সমস্তগুলিই একটা যুগের বিকাশ। যুগের বিকাশ বললেই সেই স্তরের চিত্তভূমির সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যে ধীরে ধীরে সুপরিস্ফুট হ'তে থাকে তাই বুঝা যায়। মানুষের দিকে, চিত্তভাব যে ভাবে উন্মেষিত হ'তে থাকে, তাতেই কবির চিত্তভাবের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ বুঝা যায়। ক্রমশঃ যখন কোন যুগের চিত্তভাবের সীমা পূর্ণ ক'রে তার সৃষ্টির আনন্দ ক্রমশঃ উদ্বেল হয়ে উঠতে চায় তখন সৃষ্টির সেই নূতন উদ্যমের সহিত পুরাতন বৃত্তিগুলির আর সে রকমের সামঞ্জস্য থাকে না; নিজের পরিচিত সৃষ্টিব্যাপারে কবির অতৃপ্তি উপস্থিত হয়। বিরাগাত্মক বা অভাবাত্মক স্বভাবের দ্বারা পুরাতন সৃষ্টির দ্বারটি সহজেই অর্গলবদ্ধ হ'য়ে যায়, উদ্বেল প্রস্রবণ নিরুদ্ধ হয়। এই নিরোধের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল তপস্যায়, প্রলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই একটি নূতন যুগের দ্বার উদ্ঘাটিত হ'য়ে যায়, এবং তার মধ্যে কবির সৃষ্ট চরিত্রের একটি নূতন পরিণাম সংঘটিত হ'তে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা দেখ্‌তে পাই যে "সন্ধ্যাসঙ্গীত" থেকে যে যুগটি আরম্ভ হয় "প্রভাত সঙ্গীতে"র মধ্যে যার একটা অপরিস্ফুট পরিসমাপ্তি দেখা যায় সেই যুগেরই একটা বিকাশ "কড়ি ও কোমল" পর্য্যন্ত এসে পৌঁছেছে। সমস্ত প্রাণ দিয়ে কবি পার্থিব সৌন্দর্য্যকে ভালবেসেছিলেন, একদিকে পত্রপুষ্প-ফলশালিনী বসুন্ধরা অপরদিকে বিশ্ববিমোহিনী নারী। এই দুইটিতেই তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আকৃষ্ট করেছে, বিভোর করেছে, মাতাল করেছে। সে এমনই পূর্ণতা যে তাঁর মনে হচ্ছে যে এ পথ তাঁর কাছে শেষ হয়ে গেছে, তাই তিনি তখন পূর্ণ হয়েও রিক্ত, সমাপ্তির শূন্যতায় দীন ও নিঃসম্বল। এতদিনের সৃষ্টি বিলোপ করবার জন্য তাঁর রাজ্যের সিংহদ্বারে প্রলয়ের শিঙ্গা বেজে উঠেছে। কবি শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, সৃষ্টিতে আর তাঁর উৎসাহ নাই।

এই যেমন একটা প্রলয়ের মূর্ত্তি এসে পূর্ব্ব সৃষ্টির ব্যাবর্ত্তক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তেম্নি আবার অপর দিক দিয়ে দেখতে গেলে, সেই ব্যাবর্ত্তকতার মধ্যেই আমরা

আর একটি নূতন স্বষ্টির বীজকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। কবি একদিকে যেমন 'অসীম নিদ্রার ভারে' আচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছেন অপরদিকে তেমনি বিশ্বমানবের জন্য কি একটা শেষ কথা পরিবেশন করবেন ব'লে, অন্তরের মধ্যে একটা নূতন বোধনার উপলব্ধি করছেন। তিনি একদিকে যেমন বুঝেছেন যে তাঁর সে সৃষ্টি আর চলবে না, অপরদিকে আবার তেম্নি করে নব চৈতন্যের জন্য হুঙ্কার দিয়ে উঠছেন। সেই জন্যেই একদিকে যেমন ইন্দ্রিয়াচ্ছন্ন পরিচ্ছন্ন প্রেমের একটি লৌকিক বিগ্রহ দেখতে পেয়েছি, আবার তেম্নি অপরদিকে তার প্রাণস্বরূপ একটি নব চৈতন্যের উন্মেষও আমাদের চোখে পড়ে। একদিকে যেমন—

এ মোহ কদিন থাকে, এ মায়া মিলায়।
কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে।
কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়,
মদিরা উথলে নাকো মদির আঁখিতে।
কেহ কারে নাহি চিনে আঁধার নিশায়
ফুল ফোটা সাঙ্গ হলে গাহে না পাখিতে।
কোথা সেই হাসি প্রান্ত চুম্বন-তৃষিত
রাঙা পুষ্পটুকু যেন প্রস্ফুট অধর।
কোথা কুসুমিত তনু পূর্ণ বিকশিত
কম্পিত পুলক ভরে যৌবন কাতর।
তখন কি মনে পড়ে সেই ব্যাকুলতা,
সেই চির পিপাসিত যৌবনের কথা,
সেই প্রাণ-পরিপূর্ণ মরণ অনল
মনে প'ড়ে হাসি আসে? চোখে আসে জল?

অপর দিকে তেম্নি,

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ওরে দাঁড়াও সরিয়া
ম্লান করিয়ো না আর মলিন পরশে।

ওই দেখ তিলে তিলে যেতেছে মরিয়া,
বাসনা-নিশ্বাস তব গরল বরষে।

* * * *

* * * *

যে প্রদীপ আলো দেবে তাহে ফেল শ্বাস
যারে ভালবাস’ তারে করিছ বিনাশ।

আবার

এ নহে খেলার ধন, যৌবনের আশ,
বোল না ইহার কানে আবেশের বাণী
নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস,
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিও না টানি।
এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল আশ্বাস,
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি।

শুধু তাই নয়, এক জায়গায় এমনও দেখতে পাওয়া যায় যে এক নিমিষের অনুভবের মধ্যে সমস্ত অনন্তের ছায়া এসে কবির মুখে প’ড়ে তাঁকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

ওই দেহ পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্ব্ব জনমের স্মৃতি।
সহস্র হারান’ সুখ আছে ও নয়নে,
জন্ম জন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি!
যেন গো আমারি তুমি আত্মবিস্মরণ;
অনন্ত কালের মোর সুখ দুঃখ শোক;
কত নব জগতের কুসুম কানন, ;
কত নব আকাশের চাঁদের আলোক।

কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা,
কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ,
সেই হাসি সেই অশ্রু সেই সব কথা
মধুর মুরতি ধরি দেখা দিল আজ
তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশিদিন
জীবন সুদূরে যেন হতেছে বিলীন।

ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন যে লৌকিক ইন্দ্রিয় লালসা তমসাচ্ছন্ন ছায়ার মত দিগ্বিদিক্ একেবারে আচ্ছন্ন ক'রে ব'লে উঠেছিল

বিজন বিশ্বের মাঝে মিলন শ্মশানে
নির্ব্বাপিত সূর্য্যালোক লুপ্ত চরাচর।

এখানে সে ভাব অন্তর্হিত হয়েছে। অসীমের বিরাট আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কবি উধাও হ'য়ে গেছেন, সমস্ত ইন্দ্রিয় গিয়ে আত্মায় সংহত হয়েছে, সমস্ত রূপ গিয়ে সেই অরূপের লীলা সাগরে অভিষিক্ত হ'য়েছে এবং প্রাণ তার আপন অখণ্ডতা ও অমরতার দ্বারা সমস্ত খণ্ডকে, সমস্ত নশ্বরকে আপন অমৃতাকর্ষণে উত্তান-দীর্ঘ ক'রে অনন্তের পথে ছুটেছে। অভঙ্গ ও অক্ষয়ের মধ্যে ভঙ্গুর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জগতের সমস্ত সুন্দর সেই এক অনন্তের সূতায় চিরদিনের জন্য আবদ্ধ হ'য়ে রয়েছে, আত্মা তার আপন অন্তরের স্বচ্ছ দর্পণের মধ্য দিয়ে তার সন্ধান পেয়েছে! অনন্তের গুটিকা কবির করপল্লবে এসে পড়েছে।

অভিজ্ঞান শকুন্তলে রূপলোলুপ দুষ্যন্ত তাঁর বিলাস ভবনে সুখাসীন। অন্তঃপুরে হংসপদিকা সঙ্গীতের বর্ণপরিচয় করিতেছেন—

অহিণব মহুলোলুবো তুমং তহ পরিচুম্বিঅ চুঅমঞ্জরীম্।
কমলবসইমেত্তণিব্বুদো মহুঅর বিসুমরিদোসি ণং কহং।
চুত মঞ্জরীরে করিয়া চুম্বন আকুল আবেগ ভারে
অলি মধুলোভি কমলে বসিয়া ভুলিলে কেমনে তারে।

সমস্ত পার্থিব সুখ সম্ভোগ, বিলাসবিলোল ক্ষুধাতুর ইন্দ্রিয়কে উদ্দাম ভাবে উৎক্ষিপ্ত করে তুলেছে, আর সেই আকর্ষণে নাগলোকের মণিরেখার অনুসরণ ক'রে রাজা দুষ্যন্ত পাতালপুরীর গহ্বরের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন। এমন সময় তাঁর আত্মার গোপন অন্তঃপুরে ঠিক এমনি করে প্রেমের সেই চির দেদীপ্যমান বর্ত্তিকাটি জ্বলে উঠেছিল।

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকীভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি ॥
সুন্দর নেহারি, শুনি সুমধুর গান
উৎকণ্ঠায় শিহরে যে সুখতৃপ্তপ্রাণ।
অজ্ঞাত মিলন স্মৃতি জন্মান্তর হতে
ছুটে যেন অনাহত বাসনার পথে ॥

যখন ভোগের মধ্যে, বাহিরের বর্ণ গন্ধ গানের মধ্যে, লালসার মধ্যে, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আমরা ডুবে যেতে চাই, তখন চির আকাঙ্ক্ষাময় বিরাট প্রাণের মঙ্গল প্রদীপটি আরতির শিখায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল হয়ে সীমার মধ্যে অসীমের অভিষেক সম্পাদন করে আমাদের জীবনকে সার্থক করে তোলে। প্রমাতৃচৈতন্য নিজে অসীম সেই জন্যেই, তার মুখ দিয়ে যে সীমার আস্বাদ পাওয়া যায় তাও অসীম হয়ে দাঁড়ায়। স্পর্শমণির সংযোগে লৌহধাতু স্বর্ণময় হয়ে উঠে।

এ বোধটা একদিকে যেমন কতকটা psychological বা বৃত্তিগোচর, অপরদিকে ঠিক সেই পরিমাণে তাত্ত্বিক বা metaphysical। প্রমাতা ও বিষয় উভয়কে বাদ দিয়ে উদাসীন ভাবে দেখতে গেলে, একে সীমার সঙ্গে অসীমের মিলনের ফল বলা যেতে পারে; প্রমাতার মধ্য দিয়ে দেখতে গেলে একেই বলে বৃত্তির মধ্যে তত্ত্বের সাক্ষাৎ, এইখানেই আত্মা অজর ও অমর। এ প্রকাশ করবার

ভাষা নেই বলেই কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতন জন্মান্তরবাদের রূপক আশ্রয় করেছেন। এ জন্ম হতে পূর্ব্বজন্ম, সেখান থেকে তৎপূর্ব্বজন্মে, এম্নি করে আমরা যতই জন্ম থেকে জন্মান্তরে ভ্রমণ করি না কেন, কিছুতেই আমাদের অমৃতত্বের সন্ধান পাই না ; কারণ এই কল্পনার পথে যতই আমরা জন্ম হতে জন্মান্তরে উড্ডীন হতে প্রয়াসী হই, আমরা সেই খণ্ডের মধ্যে, অন্তের মধ্যে, সীমার মধ্যে পড়ে থাকি। কারণ এ জন্ম যেমন সান্ত, পূর্ব্বজন্মও তেমনি সান্ত। একটি সান্তের উপর বা একটি খণ্ডের উপর যতই সান্ত বা খণ্ড চাপাই না কেন, তাতে কখনই অনন্ত ও অখণ্ডের বোধ বা তৃপ্তি হতে পারে না। তার পাল্লা যতই লম্বা হোক, সে কেবল অন্ত থেকে অন্তে ছুটোছুটি। বাস্তবিক অসীমের যতটুকু বোধ বা প্রত্যয় আমাদের সম্ভব, সে কেবল এই চিচ্ছায়াপত্তির দ্বারাই সঙ্ঘটিত হতে পারে। যতক্ষণ বৃত্তি ও তার বহির্বিষয় নিয়ে মানুষ ব্যস্ত থাকে; ততক্ষণ অন্তরের চিদাভাসের ছায়াপাত সত্বেও কোনও অভিব্যঞ্জনা হয় না। কিন্তু যখন বহির্বিশ্বের এই ক্রমসঞ্চারী পর্য্যায়ধারায় মানুষের তৃপ্তি সম্পাদন করতে পারে না, তখন ভোগে বিরাগ উপস্থিত হয় এবং মিলনের পূর্ণতায় শ্মশানের রুদ্রদীপ্তি খাঁ খাঁ করতে থাকে। সীমার ভারে মন প্রপীড়িত হয়, তাই সে অসীমের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। সেই অবসরে যদি অনন্ত ও অসীমের প্রতিবিম্ব তার চক্ষুতে প্রতিফলিত হয়, তবে সেই অঞ্জনের অমৃতনিষেকে সে সমস্ত সীমার মধ্যে, সমস্ত খণ্ডতার মধ্যে, অসীমের বহুধা বিচিত্র আত্মবিকাশ উপলাভ করে ধন্য হয়। সমস্ত ক্ষুদ্রতা তার চোখে এক মুহূর্ত্তে বৃহৎ হয়ে দাঁড়ায়। দুদিনের পার্থিব ভালবাসা বা আকর্ষণের মধ্যে জন্মজন্মান্তরের অনন্ত প্রেম ও অনন্ত মিলনের পরিচয় পেয়ে থাকে।

আমাদের প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে তাঁরাও পার্থিব প্রেমের ভাষায় একটা অপার্থিব নিত্য প্রেমের বর্ণনা করেছেন। অগ্নিময়ী ভোগক্ষুধার সঙ্কেতে একটা অনন্ত বিরাট ক্ষুধার ছবি এঁকেছেন, ভোগের রক্তমাংস দিয়ে ভোগাতীতের মূর্ত্তি গড়েছেন, সীমার কুটিরে অসীমকে নিমন্ত্রণ করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই জন্তেই অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের

কবিতার মধ্যে আমরা বৈষ্ণব কবিদের একটা ছায়া দেখতে পাই এবং রবীন্দ্র-নাথের ভোগস্পর্শী বর্ণনার মধ্যে জয়দেব ও বিদ্যাপতির আভাস অনুভব করি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব এইখানে যে বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে যেমন কেবল মাত্র একটা রূপকের সাহায্যে তত্ত্বটিকে পরিস্ফূর্ত্ত করবার চেষ্টা রয়েছে তাঁর মধ্যে সে ভাবে সেটা প্রকাশ পায় নাই। সৌন্দর্য্যাকাঙ্ক্ষী প্রাণের যে বিশ্ব প্রসার আমরা তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করি, সুন্দরের অন্বেষণে সমস্ত বিশ্ব পরিক্রম ক'রে যেমন একটা "নেতি নেতি" ধ্বনির সন্ধান পাই, বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে তা পাওয়া যায় না। সেখানে যত স্ফূর্ত্তি, যত অভিব্যক্তি, যত বিকাশ তা কেবল একটা রূপককে অবলম্বন করেই সংঘটিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের হৃদয় শতদল, ধীরে ধীরে লৌকিক থেকে অলৌকিকের দিকে ফু'টে উঠেছে, একটি বিকাশের মধ্যে লোকদ্বয় বিধৃত হয়ে রয়েছে। অথচ বৈষ্ণব কবিদের মতন এই বিধারণ সিদ্ধস্বরূপে উপস্থাপিত না হয়ে, সৌন্দর্য্যসাধকের সাধন ব্যাপারের প্রাণময় ক্রিয়াময় তপস্যার মধ্যে স্তরে স্তরে পরিস্ফুট হয়েছে। বৈষ্ণব কবিরা একটা প্রাপ্ত বা স্বীকৃত তত্ত্ব মূর্ত্তিময় করেছেন। আর রবীন্দ্রনাথের কবিহৃদয় একটা অপ্রাপ্তের সন্ধানে বহির্গত হয়ে, আকুল অন্বেষণে নানা পথে ভ্রমণ করে, শুধু প্রীতির বলে হিরণ্ময় পাত্র উদঘাটন করে সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর কাব্যের মধ্যে আমরা বেদনাময় সৌন্দর্য্যলিপ্সু প্রাণের যেমন একটা জীবন্ত ইতিহাস দেখতে পাই বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে তা পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা ক্রিয়া, একটা ব্যাপার, একটা movement আছে, বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে আছে দিব্য প্রেমের একটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপশিখা। সে আলো রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের আগুনের মতন রাশীকৃত ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে ফুৎকারে ফুৎকারে জ্বলে ওঠে নি। আরতির ঘৃত প্রদীপের মতন কৃষ্ণপ্রেমের অগ্নিসংস্পর্শে একেবারেই তা জ্বলে উঠেছে। তাই সেখানে ধোঁয়া ও কালোর চিহ্ন নাই। বেদনাতুর মানবহৃদয়ের স্খলন পতন ভয়ের তাড়না নাই, আছে কেবল একটি দিব্য আকাঙ্ক্ষার স্বচ্ছদীপ্তি ; ভোগাতীতের সঙ্গে মানুষের আত্মার যে একটি নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধ রয়েছে, সেইটিই সেখানে

ভোগের ভাষার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হচ্ছে। সেখানে প্রাকৃত ভোগ শুধু কথার কথা মাত্র, অপ্রাকৃত ভোগই সেখানে বাস্তবিক তথ্য। রবীন্দ্রনাথের কিন্তু তা নয়। সেখানে প্রাকৃত ভোগ নিয়েই আরম্ভ, ভক্তি বা কৃষ্ণ প্রেম নিয়ে আরম্ভ নয়। কিন্তু প্রাকৃত ভোগটা শুধু প্রাকৃত হ'য়েই স্থির হ'য়ে থাকে নি! সেটা খালি অনবরত ঘুরপাক খেয়েছে এবং এই ঘুর্ণীর ফলে প্রাকৃত ভোগের মধ্যে দিয়ে একটা অপ্রাকৃত ভোগের আস্বাদ জেগে উঠেছে এবং তার ফলে প্রাকৃত ভোগের প্রতি একটা বিরাগ এসেছে ও এই উভয়ের পরস্পরসন্নিবেশে রবীন্দ্রনাথের চিত্ত ধীরে ধীরে ভোগাতীতের সন্ধানে পাড়ি দেবার উদ্যোগ করেছে।

মানসীর অব্যবহিত পূর্ব্বস্তরে, কড়ি ও কোমলে আমরা তাই দেখতে পাই যে কবির চিত্ত ভোগময় সৌন্দর্য্যে গাঢ়ভাবে আচ্ছন্ন হ'য়ে মূঢ় অনুসন্ধানে বহির্গত হ'য়ে কেমন ধীরে ধীরে আপন অজ্ঞাতে একটি অমৃত উৎসের নিকটবর্ত্তী হয়ে আসছে। ধর্ম্মকে নিয়ে তিনি আরম্ভ করেন নাই, কোনও কাব্যের theory বা মত নিয়ে তিনি আরম্ভ করেন নাই, তিনি আরম্ভ করেছেন এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর প্রতি একটা ঐকান্তিক গাঢ় অনুরাগ নিয়ে। প্রকৃতির প্রতি এই গাঢ় অনুরাগকেই একমাত্র সম্বল ক'রে তিনি সংসারে সৌন্দর্য্যের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। একেবারে স্থূলকে ক্ষুদ্রকে নিয়ে তিনি আরম্ভ করেছেন। কড়ি ও কোমলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে হংসপদিকার যে "অহিনঅমহুলোলুব" উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিল তা'রই মধ্য দিয়ে জন্মজন্মান্তরের অস্পষ্ট প্রতিভাসা প্রমুষ্টচ্ছায়া মানসী মূর্ত্তির রাগিণী শুনতে পেয়ে সমস্ত সুখসুপ্তির মধ্যে কবিসম্রাট পর্য্যুৎসুক হ'য়ে উঠলেন।

ফাল্গুনী

পূর্ব্বে আমাদের দেশে ছলিক ব'লে একরকম গীতাভিনয় হোত, সেই অভিনয়ে অভিনেতা আপন মনের কোনও গূঢ় অভিপ্রায়, অভিনয় ও গানের অছিলায় প্রকাশ করত; নাচ ও গান ছিল তার প্রধান অঙ্গ, পাত্রপাত্রীর চরিত্র সমাবেশের বাহুল্য তা'তে কোনও স্থান পেত না। কাব্য-রসের মধ্য দিয়ে অভিনেতার কোনও ইঙ্গিত যাতে সূক্ষ্মভাবে ফুটে উঠ্‌তে পারে—এই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য।

ফাল্গুনীকেও আমরা একরকমের নূতন ধরণের ছলিক বল্‌তে পারি। তবে এতে কোনও ব্যক্তিগত ইঙ্গিত নেই। সমস্ত জগতের লীলাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে যে ইঙ্গিতটি যুগযুগান্তর ধ'রে নিত্য নব ভাবে ফুটে উঠ্‌ছে, সেইটিই হচ্ছে এই ছলিকের ভিতরকার কথা। গ্রীষ্মের রুদ্র-নিঃশ্বাসের প্রবল ঘূর্ণিতে যখন দিক্‌বিদিক্‌ থেকে যেন একটা চিতা-ভস্মের কুহেলিকা টেনে এনে আকাশের মণিঝলসিত দেহখানিকে ধূসরিত ক'রে দেয়, তখনই দেখ্‌তে পাই যে মেঘের শ্যামল জটাভার থেকে স্বর্গমন্দাকিনীর ধারাকে উন্মুক্ত ক'রে মহাযোগী আর এক নূতন মূর্ত্তিতে সম্মুখে উপস্থিত। শ্মশানের ছাই, পথের ধূলো কোথায় উড়ে গেছে, কোথায় গেছে নীল আকাশের নিরালম্ব নগ্নতা। মেঘের কৃত্তিবাস পরে সৌদামিনী গৌরীকে উৎসঙ্গে নিয়ে দিগন্তব্যাপী মৃদঙ্গনিনাদের মধ্যে এ আর এক নূতন অভিনয়। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আবার পট পরিবর্ত্তন হোল; চারিপাশে কাশের চামর দুলে উঠেছে, কৃত্তিবাসের সে মেঘবাস আর নাই, এখন তাঁর শুভ্রজ্যোৎস্না-দুকূলের রাজবেশ। শিউলি ফুলের খই ছড়িয়ে তাঁর অভ্যর্থনা আরম্ভ হয়েছে। আবার দেখতে দেখতে বানপ্রস্থের সময় এসে পড়্‌ল, পৃথিবী যেন একটা জীর্ণতা ও ভঙ্গুরতায় একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়্‌ল। আর সেই সঙ্গেই দেখি যে আমের মুকুলের মুকুট প'রে,

কোকিল ও মধুকরের স্তুতিগানের মধ্যে মহারাজের আবার নূতন ক'রে যৌবরাজ্যের অভিষেক আরম্ভ হয়ে গেছে। এমনি ক'রে ঋতুর পর ঋতুর যে খেলা চিরকাল থেকে চলে আস্‌চে, তার থেকে রূপের বিকাশকে কেবলই দেখতে থাকি রূপান্তরের মধ্যে। যাকে এক দিক্ থেকে দেখি হারানো, তাকেই অপর দিক্ থেকে দেখি পাওয়া! পাওয়ার আরম্ভেই হারানো উপস্থিত হয়, আবার সেই হারানোর পরিসমাপ্তিতেই পাওয়ার সম্পূর্ণতা। বসন্তের গুপ্ত আবির্ভাবের নামই শীত। পুরোণোকে যে আমরা হারাই, নূতনকে যে আমরা পাই, এ দুটি একই সৃষ্টির নৃত্যের দুই পদবিক্ষেপ। কিন্তু রূপের প্রকাশ, রূপের লয় ও রূপান্তরের উদয় এ তিনকে আমরা কোনও একটা প্রাণক্রিয়ার মধ্যে এক ক'রে দেখি না বলেই রূপ ও ধ্বংসটুকুই আমাদের চোখে পড়ে, বিলয়ের মধ্যে দিয়ে যে বিকাশেরই কাজ চল্‌চে, এ কথা আমরা বুঝতে পারি না। সমস্ত প্রকৃতির প্রতিদিনের পরিণামের মধ্যে এই যে ইঙ্গিতটি জেগে উঠছে যে পুরোণোর ভিতর দিয়ে হারিয়ে ফেলেই আমরা নূতনকে নূতন করে পেয়ে থাকি, এই কথাটিই ফাল্গুনীর বসন্তরাগিণীর তারে রী রী ক'রে বাজচে। অনেক দিন পূর্ব্বে কবি একবার জন্ম ও মৃত্যুর দেওয়া নেওয়ার লুকোচুরি প্রত্যক্ষ ক'রে বলেছিলেন—

চিরকাল একি লীলা গো
　　অনন্ত কলরোল!
অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে
　　অদ্ভুত এই দোল।
দুলিছ গো দোলা দিতেছ।
পলকে আলোকে তুলিছ, পলকে
　　আঁধারে টানিয়া নিতেছ।
সমুখে যখন আসি
　　তখন পুলকে হাসি,

পশ্চাতে যবে ফিরে যায় দোলা
ভয়ে আঁখি জলে ভাসি !
সমুখে যেমন পিছেও তেমন
মিছে করি মোরা গোল,
চিরকাল একি লীলা গো
অনন্ত কলরোল।

এই জন্ম মৃত্যুর সমস্যা কবি ব্রাউনিংএর সাম্‌নেও এসেছিল। এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে ইহজন্মের জরা বার্দ্ধক্য মৃত্যু প্রভৃতি অপূর্ণতা দ্বারা আমরা এইটুকু অনুমান করতে পারি যে পরলোকে আমাদের জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবন অপেক্ষা করে রয়েছে, সেইখানেই আমাদের জীবনতন্ত্রীর সমস্ত ভাঙাসুর একত্র হ'য়ে একটী পরিপূর্ণ সঙ্গীতের সৃষ্টি করবে। কাজেই জরা ও মৃত্যু হচ্ছে আমাদের পরিপূর্ণতার সূচনা। কিন্তু সে পূর্ণতার স্থান এখানে নয়, ভবিষ্যতের অজ্ঞাত স্বর্গরাজ্যে। La saisiaz কবিতায় এ বিষয়ে তিনি খুব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন, কিন্তু Rabbi Ben Ezra, Deaf and Dumb, Abt Vogler প্রভৃতি নানা কবিতায় এর আভাস পাওয়া যায়; দৃষ্টান্তস্বরূপ Abt Vogler থেকে একটা শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল।

And what is our failure here but a triumph's evidence
For the fullness of the days? Have we withered or agonised?
Why else was the pause prolonged but that singing might issue thence?
Why rushed the discords in but that harmony should be prized?
Sorrow is hard to tear and doubt is slow to clear,

Each sufferer says his say ; his scheme of the weal and woe ;

But God has a few of us whom he whispers in the ear ;

The rest may reason and welcome ; it is we musicians know.

সংসারের ব্যর্থতাই বহে সার্থকতা
জীর্ণতাই পূর্ণতার এনেছে বারতা।
তানে কেন মাঝে মাঝে দীর্ঘচ্ছেদ আসে,
আবার ভরিবে বলে সঙ্গীত উচ্ছ্বাসে।
ক্ষণে ক্ষণে ছুটে এসে কঠোর বেসুর,
সুরের মাধুরী আরো করে সুমধুর।
কত সে সংশয় জাল, বেদনার ক্ষত,
সংসারের ব্যথা ভার আসে কতমত।
আছে কোন ভাগ্যবান শোনে দৈববাণী,
কেহ তর্ক করে, মোরা গান গেয়ে জানি।

আবার La saisiazএও দেখতে পাই—

......Only grant a second life, I acquiesce in this present life as failure, count misfortune's worst assaults.

Triumph, not defeat, assured that loss so much the more exalts

Gain about to be. For at what moment did I so advance

Near to knowledge as when frustrate of escape from ignorance ?

Did not beauty prove most precious when its opposite obtained

Rule, and truth seem more than ever potent because falsehood reigned ?

While for love—Oh how but, losing love does who so loves succeed.

By the death pang to the birth throe—learning what is love indeed ?

জন্মান্তর আছে সত্য যদি মনে করি
এ জন্মের বিফলতা লই শিরে ধরি।
জয় বলে মেনে নেব দুঃখের বিধান,
ক্ষতিরে জানিব লাভ। যখন অজ্ঞান
পথ রোধ করে; তখনি নিশ্চয় জানি
এসেছি জ্ঞানের দ্বারে। সৌন্দর্য্যেরে মানি
কদর্য্যের নিকষেতে। মিথ্যা যবে উঠে
দণ্ড ল'য়ে, সত্যের প্রভাব উঠে ফুটে,
পরাভূত হ'য়ে প্রেম মিলায় বাঞ্ছিতে;
ভাঙ্গা গড়া মাঝে স্বর ফুটিছে সঙ্গীতে
বিরহেতে জাগে যার নূতন চেতনা
সেইত পেয়েছে সত্য প্রেমের বেদনা।

কবি এর কোনটি দিয়েই দেখেন না, তিনি দেখেন তাঁর হৃদয় দিয়ে। দর্শনের ভিতর দিয়ে জিনিষটাকে পরোক্ষভাবে দেখা যায়, তাই সেখানে তর্কযুদ্ধের ছাঁ না চালানো যায়, কিন্তু ফাল্গুনীর বাউলের মতন কবি তাঁর সমস্ত শরীর ও হৃদয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করেন, কাজেই তাঁর অনুভূতির উপর যতই তর্কের তলোয়ার চালাও না কেন কোনও আঁচড় লাগতে পারে না।

ফাল্গুনী নাটকে দুই অংশ আছে—প্রথমটি হচ্ছে গীতিকলা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে নাট্যকলা। একটিতে আছে প্রকৃতির কথা; আর একটিতে মানুষের। কাব্য-সংসারের অপূর্ব্ব প্রজাপতি রবীন্দ্রনাথ উভয়কে পাশা-পাশি বসিয়ে তাদের নিগূঢ়

মর্ম্মকথার মধ্যে যে একটি সুগভীর উপমা নিহিত রয়েছে সেইটুকু অভিব্যঞ্জিত করেছেন।

ফাল্গুনের কাননে কবি বেরিয়ে প'ড়ে দেখলেন, বেণুবনে দখিন-হাওয়ার দোলোৎসব, পাখীরা আকাশে গানের আবীর হান্‌চে; চাঁপা গাছের প্রাণের চঞ্চলতা তার পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে ফেটে বেরিয়েচে; দুরন্ত বসন্তের দূতেরা এসে জলস্থল আকাশের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেবার জন্যে বিষম উৎপাত বাধিয়ে দিয়েছে; শীত তার জীর্ণ কাঁথা গায়ে দিয়ে বিদায় নেবার পথে যমের দক্ষিণ দুয়ারের মুখে চলেছিল; কিন্তু তাকেও এরা ছাড়্‌বে না; তার বেশ বদল ক'রে তাকেও এরা খেলার সাথী করে তুল্‌বে।

সমস্ত ভুবন ব্যেপে নবীনের জয়ধ্বনি উঠ্‌ল, বকুল পারুল আমের মুকুল কামিনীফুল এমন কি শিমুল পর্য্যন্ত নানা রঙে বরণডালা নিয়ে ফুল দিতে লেগে গেল। যে বসন্ত বারে বারে বিদায় নিয়ে গিয়েছিল সে আবার নূতন হয়ে ফিরে এসেছে। শীতের ভিতরে যে বসন্ত লুকানো ছিল তার আজ ছদ্মবেশ কিছুতে টিক্‌ল না। যৌবনের কাছে তারো হার মান্‌তে হোল, মৃত্যুর কুঁড়িকে বিদীর্ণ করে তার অমৃত ফুটে উঠ্‌ল। চারিদিকে একেবারে আনন্দরূপমমৃতং।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বের লেখার মধ্যেও এই রকমের একটা সংশয়ের ছায়া মধ্যে মধ্যে দেখা যায়:—

হেথায় যে অস   সহস্র আঘাতে চূর্ণ   বিদীর্ণ বিকৃত,
কোথাও কি একবার   সম্পূর্ণতা আছে তার   জীবিত কি মৃত
জীবনে যা প্রতিদিন   ছিল মিথ্যা অর্থহীন   ছিন্ন রূপ ধরি
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি   তারে গাঁথিয়াছে আজি   অর্থপূর্ণ করি?
হেথা যারে মনে হয়   শুধু বিফলতাময়   অনিত্য চপল,
সেথায় কি চুপে চুপে   অপূর্ব্ব নূতন রূপে   হয় সে সফল
চিরকাল এই সব   রহস্য আছে নীরব   রুদ্ধ ওষ্ঠাধর,
জন্মান্তর নবপ্রাতে   সে হয়ত আপনাতে   পেয়েছে উত্তর॥

উপনিষদে দেখা যায় যে নচিকেতাও যমকে এই প্রশ্ন করেছিলেন আর তিনি তার উত্তর দিয়েছিলেন যে জন্মমৃত্যু কল্পনা মাত্র, একমাত্র চিৎ-স্বরূপ ব্রহ্মই সত্য-বস্তু। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এ সমস্ত এড়িয়ে যে জায়গা থেকে উত্তর দিতে চেয়েছেন তা'তে দেখা যায় যে তিনি ব্রাউনিংএর মতন এই জীবনের অপূর্ণতা থেকে অন্য এক জগতে পরিপূর্ণ সমাপ্তির বার্ত্তা পেয়েছেন এমন কথা বলেন নি। এবং বেদান্তের মত সমস্ত অপূর্ণতাকে তুচ্ছ ও অসত্য বলেন নি। ছবির মধ্যে যেমন আলোছায়ার পরম্পরার ভিতর দিয়ে আলোর নব নব বর্ণবিকাশ ঘটে থাকে, তেমনি জরার ভিতর দিয়ে, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে সমস্ত প্রকৃতির এবং মানুষের যৌবনের নব নব অভিব্যক্তি ঘ'টে থাকে।

সাধারণ ভাবে দেখ্‌তে গেলে এ কথাটা বোঝা একটু শক্ত হয়। প্রকৃতির পক্ষে সর্ব্বদা আমরা বুঝতে পারি যে জরার মধ্য দিয়ে প্রকৃতি তার যৌবনের বসন্তোৎসব নিত্য নবভাবে উপভোগ ক'রে থাকেন এবং এই বিচিত্র উপভোগের ও বিকাশের লীলাতেই ঋতুপর্য্যায়ের সৃষ্টি ; তথাপি মানুষ যে কেমন ক'রে জরার মধ্য দিয়ে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপনার যৌবনকে প্রতিবার ফিরিয়ে ফিরিয়ে নূতন ক'রে নিতে পারে এ কথা বোঝা আমাদের পক্ষে একটু কঠিন। মানুষের দেহটা একেবারে ছাই হয়ে যায়, কাজেই তার যে আবার পুনরুত্থান হ'তে পারে তা আমরা কল্পনা করতে পারি না। আর যদি বা পারি, হয়ত জন্মান্তরবাদের রূপক আশ্রয় করতে হয়। কিন্তু প্রকৃতির এই শীতবসন্তের লীলাপ্রচারকে, যদি কেবল তরুলতাকে নিয়ে পৃথিবী ব্যেপে একই রমণীয়া প্রকৃতি সুন্দরীকে সজীবভাবে দেখ্‌তে শিখি তা হ'লেই বুঝতে পারব যে প্রতি শীতের মধ্য দিয়ে তিনিই তাঁর যৌবনকে নব নব ভাবে প্রস্ফুটিত ক'রে উপভোগ করছেন। তা'তে পৃথক্ ভাবে কোনও বৃক্ষের বা লতার কোনও বিশেষ দাবী নেই, তাদের মধ্যে আমরা যে পরিবর্ত্তনটা লক্ষ্য করতে পারি, সেটা একটা সমষ্টিভূত প্রাণশক্তির ব্যষ্টিগত প্রকাশ। তরুলতা জল স্থল আকাশ সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র এই সমস্ত নিয়েই প্রকৃতির দেহ ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছে, এর মধ্যে কোনটারই এর থেকে স্বতন্ত্রভাবে

কোনও প্রাণ নেই; এরা সব তাঁরই অবয়বের মতন, তাঁরই প্রাণের ছটায় এরা প্রাণবন্ত হয়ে রয়েছে। প্রতি বসন্তে এই প্রকৃতিসুন্দরীরই নবযৌবন ফুটে উঠেছে।

সমস্ত মানুষকে নিয়েও যদি আমরা এমনি ক'রে একটা বিরাট প্রাণশক্তির বিপুল চেতনার সন্ধান করি, যদি মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে না দেখে, সমস্ত মানুষকে ব্যেপে যে একটা চৈতন্য পর্য্যাপ্ত হয়েছে, তাকে আমরা দেখতে পারি, তবে বুঝব যে শতদল পদ্মের যেমন সমস্ত দলগুলির বিকাশ নিয়ে একটি পদ্মের অখণ্ড বিকাশ, তেমনি সমস্ত মানুষকে নিয়ে বিশ্বের চিৎপদ্মের একটা অখণ্ড বিকাশ চলছে। সমষ্টিকে বাদ দিয়ে যখন খণ্ডভাবে ব্যক্তি হিসাবে আমরা এই ব্যাপারটিকে তথ্য সম্বন্ধে বিচার করতে যাই তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে মিল বা সামঞ্জস্য রাখতে পারি না। দেখি যে, জরা মৃত্যুর এক একটা প্রকাণ্ড বিশ্বগ্রাসী গহ্বর একের থেকে অপরকে একেবারে তফাৎ ক'রে রেখেছে। কিন্তু সমস্ত প্রাণপর্য্যায়কে যদি একই প্রাণের বিকাশ ব'লে বুঝতে পারি, তবে আর তাদের ব্যক্তিগত জরামৃত্যুর ছায়া এসে আমাদিগকে আচ্ছন্ন করতে পারে না, একটা মানব-পর্য্যায়ের মৃত্যুর পর নূতন পর্য্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়, আবার তাদের মৃত্যুর পর আর এক পর্য্যায় আসে, এমনি করে পর্য্যায়ের পর পর্য্যায়ের নব নব ধারা চলতে থাকে, কোথাও এর বিরাম নেই। জড় প্রকৃতির মতন চেতন প্রকৃতির মধ্যেও শীত বসন্তের ঋতুলীলা চলছে। নূতন জ্ঞান নূতন আশা নূতন আদর্শের রঙীন পতাকা উড়িয়ে নবযৌবন এসে উপস্থিত হয়, আবার যেই সেটা জরার রুক্ষ বাতাসে মলিন হয়ে আসে অমনি মানুষ মৃত্যুর মানস সরোবরে স্নান ক'রে চ্যবন ঋষির মত তাঁর যৌবনকে নূতন করে নেয়। কবি তাঁর একখানা অপ্রকাশিত চিঠিতে লিখেছেন—"জীবনটা অমর বলেই তাকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বারে বারে নবীন করে নিতে হয়। পৃথিবীতে জরাটা হচ্ছে পিছনের দিক, ওর সামনের দিকটা যৌবন। এই জন্য জগতে চারিদিকে যৌবনটাকেই দেখছি, আর জরাটা যেন তার পিছনে স'রে স'রে যাচ্ছে। তাকে এই দেখছি তার পরক্ষণেই দেখছিনে। যেই শীতে সমস্ত ঝ'রে পড়ল অমনি দেখলুম শীত নেই, বসন্ত এসে পূর্ণ ক'রে

বসেচে। তা'র থেকেই বুঝতে পারি আমাদের জরা নবতর যৌবনের বাহন। পুরাতন আপনাকে পুনঃ পুনঃ করে পেতে চায়, এই জন্য সে নিজেকে পুনঃ পুনঃ হারায়, হারিয়ে পাওয়ার মধ্য দিয়ে সে যদি না চলে তা হলে পুরাতন আর নূতন হয় না—আমাদের প্রাণকে নূতনভাবে উপলব্ধি করতে হবে বলেই আমরা মরি।" এমনি করে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবন আপনাকে নব নব ভাবে প্রতিষ্ঠিত করছে। এই ক্রিয়াত্মক পরিণাম ব্যাপারের মধ্যেই মানুষ বাস্তবিক হিসাবে অমর; হেগেলের ভাষায় বলতে গেলে একেই Dialectic movement of life কিম্বা Non-beingএর মধ্য দিয়ে Beingএর নিত্যনবীনভাব বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তত্ত্ব-বিদ্যানিপুণ ব্যক্তিরা জানেন দার্শনিকেরা কত চিন্তা কত তর্ক করে পরিণামবাদের এই গূঢ় সূত্রটিকে ধরতে পেরেছেন, কিন্তু কবি তর্ক-চক্ষুতে দেখেন না। নীতিশাস্ত্রে লেখে যে

> গাবঃ পশ্যন্তি ঘ্রাণেন বেদৈঃ পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ।
> চরৈঃ পশ্যন্তি রাজানঃ চক্ষুর্ভ্যাম্ ইতরে জনাঃ ॥
> ঘ্রাণ দিয়ে দেখে পশু, বেদদৃষ্টি পণ্ডিতগণের,
> চরচক্ষু রাজাদের, চর্ম্মচক্ষু ইতর জনের।

এই ছোট গীতিনাট্যটির ভিতর দিয়ে সমস্ত প্রকৃতির একটি গূঢ়মর্ম্মকথা ব্যক্ত হয়ে উঠছে। বসন্তের মধ্যেই শীতের পরিণতি। শীতে বসন্তে সত্য পরিচয় হবামাত্র তারা পরস্পর দেখতে পায় তারা একাত্মা। বিরোধ ঘটল বলেই তাদের মিলন ঘটল। ব্রাউনিং-এর সঙ্গে আমাদের রবীন্দ্রনাথের এইখানেই একটু তফাৎ আছে।

রবীন্দ্রনাথ বলচেন মৃত্যুকে নিয়েই অমৃত; তাই উভয়ে একত্রে অনন্তের পরিণাম-লীলা সম্পন্ন করচে। তাই অমৃতের জন্য আমাদের লোকান্তরের সন্ধানে বেরুতে হবে না। তাই ব্রাউনিংএর মত রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর পরে অমৃতকে আশা করছেন না, তিনি মৃত্যুর মধ্যেই অমৃতকে প্রত্যক্ষ দেখবেন।

এইত গেল ফাল্গুনীর গীতিকথা। তার পরে তার নাট্যকথা। শিল্পে, সাহিত্যে, সমাজে, চারিদিকে মানুষের যৌবন যেমন উন্মেষিত হ'য়ে ওঠে, তেমনি আমরা দেখতে পাই যে ফাল্গুনীর নাট্যাংশে কতকগুলি লোক বসন্তসমাগমে উৎসবময় হয়েছে। সে উৎসব অনিমিত্ত উৎসব, খেলার উৎসব, জীবনের উৎসব, আনন্দের উৎসব। তার কোনও হেতু নেই তাই তার কোনও বাঁধনও নেই, সে সব করতে পারে; কোথাও তাকে ঠেকিয়ে রাখবার জো নেই। যৌবনের জীবনীশক্তি যে মানুষের মনোবৃত্তিকে চারিদিকে উৎসবময় করে তোলে, সর্দ্দারকে দেখে পুনঃ পুনঃ আমাদের সেই কথা মনে হয়। মানবের বহুমুখী বিবিধ উদ্যোগের মধ্যে তার যৌবন উচ্ছ্বসিত হয়ে চিরকাল ধরে তাকে বার্দ্ধক্যের দিকে নিয়ে আসে। সকলেই এই বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুকেই ভয় করে, অথচ সকলেই তার খোঁজ করছে। কে গো ঐ জরা মৃত্যু। কে সেই "গুহাহিতং গহ্বরেষ্টং পুরাণং।" নচিকেতা একেবারে তাকে মৃত্যুর বাড়ী গিয়ে খোঁজ করেছিল, আর সমস্ত সংসারের যৌবন আজও সেই খোঁজে চলেছে।

এই কথাটি চারটি অংশে বিবৃত। (১) সূত্রপাত (২) সন্ধান (৩) সন্দেহ (৪) সমাপ্তি। "সন্দেহ"র মধ্যে এই অনিমিত্ত সন্ধানের ভিতরেও জরামৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের চিরন্তন সন্দেহটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। "সমাপ্তি"র মধ্যে বাউলের উপদেশ মতে চলতে চলতে চন্দ্রহাস মৃত্যুগুহার মধ্যে প্রবেশ করে' সেই অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে এই জগতের সেই চিরবার্দ্ধক্যকে ধরে ফেল্লে, আর যেই ধরলে অমনি দেখতে পেলে তিনি বালক, শুধু বালক নয় যাঁর প্রেরণায় তারা এই সন্ধানে বেরিয়েছে, তিনি হচ্ছেন সেই সর্দ্দার। যে যৌবন সমস্ত প্রাণনার মূলে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে পুনঃ পুনঃ সেই যৌবনই ফিরে ফিরে আসছে। তাই মানুষের সকল বৃত্তির মধ্যে সব সময়ই দেখতে পাই যে যৌবন খেলছে, মুহূর্ত্তের জন্য যে সে আচ্ছন্ন হয়ে আসে সেটা পটান্তরের বিশ্রাম মাত্র। পাব বলেই আমরা হারাই, এবং হারানোর মধ্য দিয়েই পাই।

প্রকৃতির ও মানুষের ভিতরকার গূঢ় মর্ম্মকথাটি একটি উপমার মধ্যে ব্যক্ত

করবার জন্য গীতিনাট্যটির পাশে নাট্যটি বসান হয়েছে। এই ছলটুকু থেকেই বুঝতে পারি যে প্রকৃতির ভিতর থেকেই কবির কাছে বিশ্বের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়, সে জন্যে কোনও পুঁথি ঘাঁটবার দরকার হয় না।

কবি তরুলতার ভাষা জানেন, পশুপক্ষীর ভাষা জানেন; তাই বেণুবন থেকে ফুলন্ত গাছ থেকে, পাখীর নীড় থেকে অবিরত যে অনাহত বীণাটি বেজে উঠছে, সেটা তিনি বেশ স্পষ্ট করে বুঝতে পারেন, এবং সেই অনুসারে নিজের মনের তারটিও বাঁধতে পারেন। শাস্ত্রে লেখা আছে এই পৃথিবীর সৃষ্টিস্থিতিলয় নিয়ে ব্রহ্মের লীলা চলছে। লীলা মানে খেলা। আমরা তা না বুঝে যতই যুক্তিতর্কের জাল বুনে এই খেলার রহস্যকে ধরতে চেষ্টা করি, ততই ধরতে পারি না; শ্রান্ত হয়ে ফিরে আসি। কারণ খেলার একমাত্র উপায় হচ্ছে খেলায় যোগ দেওয়া। যতই খেলার তত্ত্ব নিয়ে বুদ্ধির আন্দোলন করি খেলাটা ততই দুরূহ হয়ে ওঠে। প্রাণের খেলা মানেই হচ্চে অনিমিত্ত স্ফূর্ত্তি; যতই এক একটা কল্পিত নিমিত্তের মধ্যে তাকে বাঁধতে চেষ্টা করি ততই সেটা ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়। নাট্যাংশের দাদাটি রাশীকৃত পুঁথি কাগজ পুরে নিয়ে তাঁর প্রয়োজনের বাস্তবতা দিয়ে প্রকৃতি ও কাব্যকে বাঁধতে চেষ্টা করেছিলেন; তিনি বংশীধ্বনিতে বেণুর কোনও সার্থকতা দেখতে পান না, আকাশের অগণ্য নক্ষত্র জ্যোতির মধ্যে তিনি কোন আবশ্যকতা খুঁজে পান না, এই জন্যই খেলার Holy questএ তিনি যোগ দিতে পারেন নি।

সমস্ত ফাল্গুনীটার হাওয়া থেকে, এই সুরটা বেরুচ্ছে, যে জগতের ভিতরকার কথাটি যদি কেউ জান্‌তে চায় ত সে কেবলমাত্র খেলার সঙ্গে যোগ দিয়েই জান্‌তে পারে, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। কোনও তত্ত্বচিন্তার কূটজালে প্রবিষ্ট হওয়ার প্রয়োজন নেই, কোনও দার্শনিক কল্পনার মাপকাঠি ব্যবহার করতে চেষ্টা করো না, শুধু জগতের মধ্যে নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর যে একটি আনন্দ লীলা চলেছে, বাউলের মতন সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাকে স্পর্শ কর; পুঁথির চোখটাকে, তর্কের চোখটাকে একেবারে কানা করে দাও; সমস্ত প্রাণ

দিয়ে বিশ্বকে আলিঙ্গন কর, তা হলেই দেখতে পাবে যে অন্তরে বাহিরে দুই যন্ত্রে একই সঙ্গীত উঠছে; সেই সঙ্গীত যতই তোমার মনকে স্পর্শ করবে ততই তোমার বিশ্বখেলায় যোগদান করা সার্থক হবে। ইতিপূর্ব্বে কোনও কবি জগতের রহস্যটিকে ধরবার এমন সুন্দর উপায় এত পরিস্ফুট ভাবে ব্যক্ত করেছেন ব'লে আমি জানি না। ব্রাউনিং এই দিকটা একটু আধটু ইসারা করেছেন; Abt Vogler থেকে যে শ্লোকটি আমরা তুলেছি তার মধ্যে "We musicians know" এই কথাটির ভিতরও তার পরিচয় পাওয়া যায়।

দর্শনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে বর্ত্তমান ফরাসী মনীষী বার্গসঁ ঠিক এখানে দাঁড়িয়ে তাঁর Intuition theory অনুভূতিবাদকে স্থাপন করবার চেষ্টা করেছেন। তিনিও সমস্ত প্রমাণের মূলগুলি সমালোচনা করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন, যে, তর্কে ও অনুমানের দ্বারা জগতের তথ্যকে ধরা যায় না; সত্যের মধ্যে অনবরত যে স্পন্দন-খেলা চলছে, তাকে সেখান থেকে টেনে এনে দেখবার কোনও উপায় নেই, দেখতে হলে সেখানে তাকে স্পর্শ করতে হবে, যুক্তি প্রয়োজনের দাদাগিরিতে চলবে না। তাই তিনি Metaphysicsএর লক্ষণ দিয়েছেন, Metaphysics is the science which claims to dispense with symbols (তাকেই তত্ত্ববিদ্যা বলা যাবে যাতে তর্কশাস্ত্রের কোনও সংজ্ঞা ব্যবহার করা চলবে না) আর Intuition বা অনুভূতির লক্ষণ দিয়েছেন, By intuition is meant that kind of intellectual sympathy by which one places oneself within an object in order to coincide with what is unique in it and consequently inexpressible (মনের যে সহচর বৃত্তি দ্বারা আমরা কোনও বস্তুর তদ্গত বিশিষ্ট অনির্ব্বচনীয় সত্তার মধ্যে আমাদের মিশিয়ে নিতে পারি, তাকেই Intuition বা অনুভূতি বলা যায়।)

মূলের চেয়ে আমার প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে চলেছে, তাই এ বিষয়ে আর বেশী কিছু বলব না, শুধু পরিশেষে পাঠকদিগকে এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যে,

আমরা ফাল্গুনী থেকে যে অর্থগুলি টেনে বার করতে চেষ্টা করলুম সে সমস্তই এতে আছে, অথচ এটা রূপক নয়, উপদেশাবলিও নয়। সাধারণ নাটকে যেমন চরিত্র ও দৈবের (character and accident) গাঢ় সংমিশ্রণ থাকে এতে তা নেই, কাজেই সে রকম নাটক হিসাবে এর কোনও জায়গা নেই, এবং সেজন্য এটা নাটক হয় নি। অথচ কাব্য হিসাবে এর স্থান অত্যন্ত উঁচুতে, কারণ অভিধা বা সোজা কথায় কিছু বলবার কোনও চেষ্টা এতে নেই, একদিকে যেমন গানে গানে একটা আনন্দের উৎসরস ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, অপরদিকে তেমনি যে কথাগুলি আমরা বললাম সেইগুলি নিয়ে একটা বস্তুধ্বনিও যুগপৎ ভেসে উঠেছে, কিন্তু কোনটা থেকে কোনটা পৃথক করা যায় না; অথচ যেন ফুলের গন্ধের মতন এরা গায়ে গায়ে জড়িয়ে রয়েছে। অভিধার অতি সূক্ষ্ম তারের উপর সমস্ত রাগ রাগিণী ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। শীতের মধ্য দিয়ে বসন্তের আগমন হচ্ছে এর উপাখ্যান-ভাগ বা mythiopic process, এই ব্যাপারটার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত ক'রে আমাদের জীবনকে যে নূতন ঢঙে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে, সেইটি হচ্ছে এখানকার "সমালোচনা" বা objective criticism of life; এবং এই সমালোচনের ফলে জীবনপ্রবাহের মধ্যে জরা-যৌবনের যে গূঢ় কথাটি ধ্বনিত হয়েছে, সেটি হচ্ছে, ব্যঞ্জন ফল, ধ্বনি বা crowning transfiguration। সমস্ত ব্যাপারটিকে সংযম অসংযমের মাঝখানে রেখে এমন করে ধরা হয়েছে, যে, এতে যে কোনও কথা বলা হবে, এমন আড়ম্বরের চিহ্নমাত্রও নেই, সমস্ত নাটকখানিই যেন একটি ফাল্গুনের বসন্তোৎসব; যেন হঠাৎ কবির মধ্যে থেকে পরভৃতিকা গান গেয়ে উঠেছে—

আতাম্ব হরিঅপাণ্ডুর জীবিঅ সব্বস্স মহুমাসস্স।
দিট্ঠোসি চূদঙ্কুরো তুমং পসাদেমি॥

বিশ্বনাথের খেয়াল ও কবির খেয়ালে মিলে একটি অপূর্ব্ব খেলার সৃষ্টি করেছে, আর অভিনেতৃবর্গের পায়ের নূপুরের সঙ্গে সঙ্গে একটি নব জীবনের নবীন আশার বাণী উঠেছে—

জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা।
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।
জীবনে আজো যারা রয়েছে পিছে
জানি হে জানি তাও হয়নি মিছে।
আমার অনাগত আমার অনাহত
তোমার বীণাতারে বাজিছে তারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

বলাকা

বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক দুই একজন বন্ধুর সহিত যখনই আলাপ ও আলোচনার সুযোগ হইয়াছে তখনই শুনিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্য অনেকাংশে দুর্ব্বোধ এবং রবীন্দ্র সাহিত্যে তাহার স্থান কোথায় তাহা নির্দেশ করা কঠিন। একদিন রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ক্লাশে যখন পাওয়া গিয়াছিল তখন তাঁহাকেও এই প্রশ্ন করা হইয়াছিল। কবি তাহার উত্তরে তাঁহার সুললিত কণ্ঠে বলাকার কয়েকটি কবিতা পড়িয়া শুনান। বলাকায় তিনি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা তিনি বলাকার কবিতাগুলির মধ্যে যেরূপ সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন তাহা অপেক্ষা স্পষ্ট সরল গদ্যে তাহা বুঝান সম্ভব নয়, ইহাই বোধহয় কবির ব্যঞ্জনা। অধ্যাপক বন্ধুরা আমাকেও মধ্যে মধ্যে

এই সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যখন যতটুকু সুযোগ পাইয়াছি বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। আজ এই প্রবন্ধে 'বলাকা' সম্বন্ধে মোটা-মুটিভাবে একটা আলোচনা করিব। কবির মর্ম্মকথা উদ্‌ঘাটন করিতে পারিব কি না জানি না। তবে আমি নিজে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে করি তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব।

'বলাকা' গ্রন্থখানি ৪৬টি পৃথক পৃথক কবিতার সঞ্চয়ন। ইহাদের মধ্যে কবি প্রথম আটটি কবিতার নাম দিয়াছেন, তাহার পর নাম দেন নাই। নাম দিলে নাম দেওয়া যাইত না—এমন কথা বলা যায় না; তবে হয়ত তাহাদের সমষ্টিগত তাৎপর্য্যটি ক্ষুণ্ণ হইত, একথা মনে করিলে দোষ হয় না। 'বলাকা' নামটির সহিত সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা সুপরিচিত। বলাকারা যখন আকাশে আবদ্ধমালা হইয়া দুলিতে দুলিতে ব্যোমমার্গে মানস-সরোবরের দিকে উড্ডীন হয় তখন তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক ও স্বতন্ত্র মূর্ত্তি আমাদের কাছে তেমন প্রতিভাত হয় না, যেমন প্রতিভাত হয় তাহাদের গতিভঙ্গী, গতিচ্ছন্দ। বলাকার কবিতাগুলির প্রত্যেকটির হয়ত একটি স্বতন্ত্র তাৎপর্য্য আছে, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও তাহাদের ফলগুলিকে লইয়া আরও একটি স্বতন্ত্র তাৎপর্য্য স্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বলাকার অধিকাংশ কবিতার মধ্য দিয়া এই সমূহাত্মক তাৎপর্য্যের এক একটি বিশেষ প্রকাশ, বিশেষ ভঙ্গী ফুটিয়া উঠিয়াছে। বোধ হয় সেই জন্যই নাম দিতে দিতে কবি সজাগ হইয়া নাম বন্ধ করিয়া প্রক্রম ভঙ্গ করিয়াছিলেন। নামের মধ্যে যাহা বাঁধা থাকে তাহার স্বতন্ত্রতা নামের আবরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেখানে প্রত্যেকটি কবিতার মধ্য দিয়া একটি চঞ্চল গতি-নৃত্যের পাদবিক্ষেপ সূচিত হয় সেখানে সেই পাদবিক্ষেপকেই সমস্ত নৃত্যের মধ্যে এক করিয়া দেখিলে তাহার তাৎপর্য্য বুঝা যায়। নৃত্যচ্ছন্দ হইতে পৃথক করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে দেখিতে গেলে সমুদয়ের সহিত তাহার যে সামঞ্জস্যের সম্বন্ধ রহিয়াছে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি না পড়িতে পারে। দোদুল্যমান মালার ন্যায় বলাকাপঙ্‌ক্তি যখন আকাশ দিয়া উড়িয়া যায় তখন

প্রত্যেকটি বলাকার যে স্থান-সন্নিবেশের বিচিত্র পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা আমাদের দৃষ্টি তেমন আকর্ষণ করে না। এই স্থান-সন্নিবেশের বৈচিত্র্যের ফলে বলাকার মালাটি যে বিচিত্রভাবে বিচিত্ররূপে আমাদের মন হরণ করে সেই বর্ণনাই বলাকার বর্ণনা। আকাশে ঘনকৃষ্ণমসীতুল্য মেঘ উঠিয়াছে, ঝড় উঠিয়াছে, বলাকার মালাগুলি মধ্যে মধ্যে ছিঁড়িয়া যাইতেছে। বলাকাদের এই দুর্দ্দাম বিপদের মধ্যে, মেঘঝঙ্কার-মধ্যে, কোন ভয় নাই, তাহাদের মালা যেমন একবার ছিঁড়িয়া যাইতেছে আবার তাহারা গাঁথিয়া তুলিতেছে, মেঘের সম্মুখে আসিয়া বিপদের সম্মুখীন হইয়া তাহারা যেন নূতন জীবনের সন্ধান পায়।

গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যতে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ॥

তাহারা মানসসরোবরের যাত্রী, বিপদের মধ্যেই তাহাদের সম্পদ; তাই সমস্ত বিপৎপাতকে অতিক্রম করিয়া তাহারা তাহাদের অজানা মানসলোকের দিকে যাত্রা করে। 'বলাকা' বলিলেই আমাদের মনে সর্ব্ববিপজ্জয়ী এই একটা অজানার উদ্দেশ্যে অন্তহীন গতিচ্ছন্দের কথা মনে পড়ে। 'বলাকা' গ্রন্থখানিতেও এমনি একটা গতিচ্ছন্দের লীলাভঙ্গী চিত্রিত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

বলাকার কবিতাগুলি ১৩২১ হইতে ১৩২৩এর মধ্যে লিখিত। ১৩২৪-এর আশ্বিন ও কার্ত্তিকের "সবুজপত্রে" রবীন্দ্রনাথ "আমার ধর্ম্ম" নামে একটা প্রবন্ধ লিখেন। কালগত ঐক্যবশতঃ মনে করা যাইতে পারে বলাকার কবিতার মধ্যে যে ভাবধারার ইসারা আছে এই প্রবন্ধে তাহার নিদর্শন বা সঙ্কেত পাওয়া যাইতে পারে। এই প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন "কোন্" ধর্ম্মটি তার? যে ধর্ম্ম মনের ভিতরে গোপনে থেকে তাহাকে সৃষ্টি করে তুলেছে। জীবজন্তুকে গ'ড়ে তোলে তার অন্তর্নিহিত প্রাণধর্ম্ম। সেই প্রাণধর্ম্মটির খবর রাখা জন্তুর পক্ষে দরকারই নাই। মানুষের আর একটি প্রাণ আছে সেটা শারীর প্রাণের চেয়ে বড়—সেইটে তার মনুষ্যত্ব। এই প্রাণের ভিতরকার সৃজনীশক্তি হচ্ছে তার ধর্ম্ম। এইজন্য আমাদের ভাষায় ধর্ম্মশব্দ খুব একটা অর্থপূর্ণ শব্দ। জলের জলত্বই হচ্ছে

জলের ধর্ম্ম, আগুনের আগুনত্বই হচ্ছে আগুনের ধর্ম্ম, তেমনি মানুষের ধর্ম্মটা হচ্ছে অন্তরতম সত্য।

মানুষের প্রত্যেকের মধ্যে সত্যের একটা বিশ্বরূপ আছে। আবার সেই সঙ্গে তাহার একটি বিশেষ রূপ আছে। সেটাই হচ্ছে তার বিশেষ ধর্ম্ম। সেইখানেই সে ব্যক্তি সংসারের বিচিত্রতা রক্ষা করছে, সৃষ্টির পক্ষে এই বিচিত্রতা বহুমূল্য সামগ্রী। এইজন্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট করবার শক্তি আমাদের হাতে নাই। আমি সাম্য-নীতিকে যতই মানি না কেন, তবু অন্য সকলের চেয়ে আমার চেহারার বৈষম্যকে কোনমতেই লুপ্ত ক'রতে পারি না। তেমনি সাম্প্রদায়িক সাধারণ নাম গ্রহণ করে আমি যতই মনে করি না কেন যে আমি সম্প্রদায়ের সকলের সঙ্গে সমান ধর্ম্মের, তবু আমার অন্তর্য্যামী জানেন মনুষ্যত্বের মূলে আমার ধর্ম্মের একটি বিশিষ্টতা বিরাজ ক'রছে। সেই বিশিষ্টতাতে আমার অন্তর্য্যামীর বিশেষ আনন্দ।

যখন কোন অংশকে বাদ দিয়ে তবে সত্যকে সত্য বলি তখন তাকে অস্বীকার করি। সত্যের লক্ষণই এই যে সমস্তই তাহার মধ্যে মেলে। সেই মেলার মধ্যে আপাততঃ যতই অসামঞ্জস্য প্রতীয়মান্ হোক তার মূলে একটা গভীর সামঞ্জস্য আছে; নৈলে সে আপনাকে আপনি হনন ক'রত··· তাই সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে পৃথিবীটি বস্তুতঃ যেমন—অর্থাৎ নানা অসমান অংশে বিভক্ত তাকে তেমনি করেই জানবার সাহস থাকা চাই। ছাঁট দেওয়া সত্য এবং মনগড়া সামঞ্জস্যের প্রতি আমার লোভ নাই। আমার লোভ আরও বেশী তাই আমি সামঞ্জস্যকেও ভয় করি না।···বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিজের প্রকৃতির মিলটা অনুভব করা সহজ, কেননা সেদিক থেকে কোন চিত্ত আমাদের চিত্তকে বাধা দেয় না। কিন্তু এই মিলটাতেই আমাদের তৃপ্তির সম্পূর্ণতা কখনই ঘট্‌তে পারে না, কেন না আমাদের চিত্ত আছে, সেও আপনার একটি বড় মিল চায়। এই মিলটা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। বিশ্বমানবের ক্ষেত্রেই সম্ভব। সেইখানে আপনাকে ব্যাপ্ত করে আপনার বড় আমির সঙ্গে আমরা মিলতে

চাই। সেইখানে আমরা আমাদের বড় মিতাকে, সখাকে, স্বামীকে, কর্ম্মের নেতাকে, পথের চালককে চাই। সেইখানে কেবল আমি আমার ছোট আমিকে নিয়েই যখন চলি, তখন মনুষ্যত্ব পীড়িত হয়; তখন মৃত্যু ভয় দেখায়; ক্ষতি বিমর্ষ করে, তখন বর্ত্তমান্ ভবিষ্যৎকে হনন করতে থাকে। দুঃখশোক এমন প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে যে তাকে অতিক্রম করে কোথাও সান্ত্বনা দেখতে পাই না, তখন প্রাণপণে কেবলই সঞ্চয় করি ত্যাগ করবার কোন অর্থ দেখি না। ছোট ছোট ঈর্ষা দ্বেষে মন জর্জ্জরিত হয়ে ওঠে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "সোনার তরীর" "বিশ্বনৃত্য" কবিতাটিতে দেখাইয়াছেন যে বিশ্ব-মানবের ইতিহাসকে একজন চিন্ময় পুরুষ সমস্ত বাধাবিঘ্ন ভেদ করিয়া অনন্তের পথে চালাইয়া ছেন। "নৈবেদ্যে" রবীন্দ্রনাথের কাছে আর একটি সত্য প্রতিভাত হইতে দেখা যায়। সেটা হইতেছে এই যে একটি চিন্ময় পুরুষ আমাদিগকে বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া একটা পরম শান্তির অমৃত রাজ্যে নিয়া চলিয়াছেন। এই তথ্যটি আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তির পক্ষে চরম নহে। কাহারও হাতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দিয়া বিশ্রাম লইলে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সংগ্রামের মর্য্যাদা কোথায়? তাই নৈবেদ্যে কবি বলিয়াছেন,

"আঘাত সঙ্ঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি
অঙ্গদ কুণ্ডলকণ্ঠী অলঙ্কার রাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে।...
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্ম্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।"

—চিত্রাতে আবার "এবার ফিরাও মোরে" এই কবিতাটিতে বলিতেছেন,

"......শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাঁহার আহ্বান গীত ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত্তমাঝে, দিয়াছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন,

নির্য্যাতন লয়েছে যে বক্ষ পাতি ; মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত।"

পরবর্ত্তী "কল্পনাতে" প্রকাশিত ১৩০৫এ লিখিত 'অশেষ' কবিতাটিতে মানবচিত্তের সকল ঘাত প্রতিঘাতে অশেষের দিক্ হইতে সম্মুখে চলিবার যে আহ্বান প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে কবি শক্তিকে আহ্বান করিয়া এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে অশেষের আহ্বান তাঁহার মধ্যে সফল হইবে এবং তিনি জয়ী হইবেন।

"হবে হবে হবে জয় হে দেবী করিনে ভয়
হব আমি জয়ী
তোমার আহ্বানবাণী, সফল করিব রাণী
হে মহিমময়ী।"

কিন্তু এই অজানার আহ্বান কোথা হইতে আসিতেছে এবং কোন পথেই বা আমাদের গতি, সেই পথ সংসারের কি অতিসংসারের তাহা কবির জানা নাই। ১৩০১ সালে লিখিত 'অন্তর্য্যামী' কবিতায় কবি লিখিয়াছেন,

"চিনি না যে পথ সে পথের পরে
চলেছি পাগল বেশে।"

এই সময়কার একটা চিঠিতে কবি লিখিয়াছেন, "কে আমাকে গভীর গম্ভীরভাবে সমস্ত জিনিষ দেখতে বলেছে, কে আমাকে অভিনিবিষ্ট স্থির কর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সঙ্গীত শুনতে প্রবৃত্ত করেছে, বাইরের সঙ্গে সূক্ষ্ম প্রবলতম যোগসূত্র-গুলিকে প্রতিদিন সজাগ সচেতন করে তুলছে ?" 'কল্পনাতে' ১৩০৫এ 'বর্ষশেষ' কবিতাটিতে দেখা যায় যে কবির মনে দ্বন্দ্বের, দুঃখ ও বিপ্লবের আলোড়ন দেখা দিয়াছে। আর সেই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া কবি বিক্ষোভের তাড়নায় উদ্দাম পথিকের ন্যায় বাধাবন্ধহীন হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে এবং শক্তিসঞ্চয়ের জন্য যৌবনের জয়-ভেরীকে আহ্বান করিতেছেন—

"উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের
জলদর্চ্চি রেখা।

করযোড়ে চেয়ে আছি ঊর্দ্ধমুখে পড়িতে জানিনা

* * *

চাবনা পশ্চাতে মোরা, মানিবনা বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক্।
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।"

এইখানেই বিশ্বমানবের সঙ্গে বিরোধের বা Antithesisএর চরম আবির্ভাব। পূর্ব্বের সুখে বাহ্য প্রকৃতির সহিত মিলনের যে অখণ্ড শান্তি ছিল সেটি ধ্বংস পাইয়াছে, এবং তাহার স্থানে কুরুক্ষেত্রের ভীষণ পর্ব্ব দেখা দিয়াছে। কিন্তু এই বাধাবিঘ্ন, ক্ষোভ দ্বন্দ্বের মধ্যে দাঁড়াইয়া কবি যেমন একদিকে ইহার উদ্দামতা ও ভীষণতা অনুভব করিতেছেন অপরদিকে সেই ভীষণতার মধ্যে সেই প্রকৃতি-ব্যাপারের সামঞ্জস্যের প্রবল বিচ্ছেদের গহ্বরের মধ্যেও তাহার অন্তরালে যে একটি অসীমের শিবময় প্রকাশ লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে এই বিশ্বাস হারান নাই। জীবনের দুঃখ বিপদ বিরোধ মৃত্যুর বেশে অসীমের আবির্ভাবকে স্বীকার করিয়াছেন। ১৩০৯ সালে লিখিত 'মরণ' কবিতাটিতে তিনি লিখিয়াছেন—

"তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ,
আমি ছুটিয়া আসিব, ওগো নাথ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।"

১৩১১তে লিখিত "পাগল" নামক প্রবন্ধটিতে তিনি লিখিয়াছেন, "এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছে, যাহা কিছু অভাবনীয়, তাহা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন।...নিয়মের দেবতা সংসারের সমস্ত পথকে পরিপূর্ণ চক্রপথ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর এই পাগল তাহাকে আক্ষিপ্ত করিয়া কুণ্ডলী আকার করিয়া তুলিতেছেন। এই পাগল আপন খেয়ালে সরীসৃপের বংশে পাখী এবং বানরের বংশে মানুষ উদ্ভাবিত করিতেছেন। যাহা হইয়াছে

যাহা আছে তাহাকেই চিরস্থায়ীরূপে রক্ষা করিবার জন্য সংসারে একটি বিষম চেষ্টা রহিয়াছে। ইনি সেটাকে ছারখার করিয়া দিয়া যাহা নাই তাহারই জন্য পথ করিয়া দিতেছেন। ইহার হাতে বাঁশী নাই, সামঞ্জস্য ইহার সুর নহে, বিষাণ বাজিয়া উঠে, বিধি-বিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়, এবং কোথা হইতে একটি অপূর্ব্বতা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে।" প্রকৃতির প্রকৃতিস্থতার মধ্যে যে একটা অপ্রকৃতিস্থতার ধাতু আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। সুন্দর মধুরের মধ্যে হঠাৎ একটা পাপ, একটি অপ্রত্যাশিত উৎপাত জলজ্জটাকলাপ হইয়া দেখা দেয়, যাহার অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গে গৃহের প্রদীপ জলিয়া উঠে, সেই শিখাতেই নিশীথ রাত্রিতে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। সংসারের একটানা জীবনের মধ্যে যে একটা তুচ্ছতা ও একঘেয়ে ভাব জাগিয়া উঠে, ভাল ও মন্দ এই দুইয়ের আঘাতে কোন অজ্ঞাত দেবতা তাহাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করেন এবং এই আঘাত বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে প্রাণপ্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া সৃষ্টির নব নব মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে থাকেন। এই সমস্ত ভাল ও মন্দের মধ্যে আমরা যদি অবিচলিত বিশ্বাসে স্থির থাকিতে পারি, ভয়ের আক্ষেপে যদি এই রুদ্রসঙ্গীতের তাল ভঙ্গ করিয়া না ফেলি, তবে ইহারই মধ্য দিয়া আমাদের মধ্যে সৃজনীশক্তি নব নব বিকাশে নব নব জীবনপ্রবাহে আপনাকে ফুটাইয়া তুলে, তাহার মধ্য দিয়া অনন্তের অভিমুখে আমাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ হইতে পূর্ণতর বিকাশকে উপলব্ধি করিতে পারি। বিশ্ব-বিক্ষোভের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পূর্ণ বিশ্বাসে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে আমাদের অন্তর হইতে যে শক্তিপ্রবাহ উন্মেষিত হইয়া আমাদিগকে সেই বিঘ্নবিবাদের পরপারে লইয়া যায়, যে নূতনের দ্বারকে নব নব ভাবে উন্মোচিত করে, সেই অনন্ত গতির মধ্যেই আমাদের ব্যক্তিত্বের সার্থকতা। ১৩১২ সালে লিখিত 'খেয়া'তে 'আগমন" কবিতাতে যে রাজার আগমনের কথা দেখা যায় সে রাজা "অশান্তি"।

"বজ্র ডাকে শূন্য তলে
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে

ছিন্নশয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা।
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল,
দুঃখ রাতের রাজা।"

ঐ 'খেয়া'তেই 'দান' নামক কবিতাটিতে কবি সুখের মালা চাহিয়াছিলেন কিন্তু পাইলেন তরবারি।

"এতো মালা নয়গো, এযে
তোমার তরবারি।
জ্ব'লে উঠে আগুন যেন
বজ্র হেন ভারি
* * নয় এ মালা, নয় এ থালা
গন্ধজলের ঝারি, এ যে ভীষণ তরবারি।"

এই সমস্ত কবিতা হইতে বুঝা যায় যে বিরাটের সঙ্গে কবির একটা দ্বন্দ্ব আসিয়াছে। Thesis হইতে একটা antithesisএ পৌছিয়াছেন, কিন্তু এই antithesisই চরম কথা নয়। জগতের সঙ্গে বিরোধই আমাদের শেষ মীমাংসা নয়, শেষ মীমাংসা বিরোধের উত্তরণে। অশান্তিকে অস্বীকার করিয়া শান্তি পাওয়া যায় না, কিন্তু অশান্তিকে শান্তির মধ্যে সংহার করিলে শান্তি পাওয়া যায়। ১৩১৭তে লিখিত গীতাঞ্জলিতে কবি বলিয়াছেন—

"বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী
সেকি সহজ গান!
সেই সুরেতে জাগবো আমি,
দাও মোরে সেই কাণ।
ভুলবো না আর সহজেতে
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে

মৃত্যু মাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।
সে ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্তবীণার তারে
সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত
নাচাও যে ঝঙ্কারে।
আরাম হ'তে ছিন্ন ক'রে
সেই গভীরে লওগো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথা
শান্তি সুমহান।"

শারদোৎসব হইতে ফাল্গুনী পর্য্যন্ত সমস্ত নাটকগুলির মধ্যে ভিতরের ধুয়াটা একই রকমের। "প্রত্যেক ঘাসটি নিরলস চেষ্টার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করছে, এই প্রকাশ করতে গিয়েই আপনার অন্তর্নিহিত সত্যের ঋণ শোধ করছে। এই যে নিরন্তর বেদনায় তার আত্মবিসর্জ্জন, এই দুঃখই তো তার শ্রী এই তো তার উৎস।......যেখানে আপন সত্যের ঋণ শোধের শৈথিল্য সেখানেই প্রকাশের বাধা, সেইখানেই কদর্য্যতা, সেইখানেই নিরানন্দ। আত্মার প্রকাশ আনন্দময়। এই জন্যই যে দুঃখকে, মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে, ভয়ে কিম্বা আলস্যে কিম্বা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে না জগতের সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় না।......তাই উপনিষদে আছে 'তিনি তপের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্তকে সৃষ্টি করলেন', আমাদের আত্মা যা সৃষ্টি করছে তাতে পদে পদে ব্যথা, কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হয় না। সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য্য, তাতেই আনন্দ।"

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মের মধ্যে প্রধান কথাই বলা হইতেছে এই যে, একটি সৃজনীশক্তির গতির আবর্ত্তে মানুষের ব্যক্তি-জীবন গড়িয়া উঠে। প্রথম অবস্থায় মানুষ একটা অবিচ্ছিন্ন শান্তিতে থাকে সেটা হইতেছে মূঢ়তার শান্তি। তারপর

আসে একদিকে প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, অপরদিকে বিরাট মনুষ্যসমাজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, আসে স্বার্থে স্বার্থে সজ্ঘাত, আসে বিপদের উল্কাপাত, আসে বিভীষিকা। কবি তখন প্রার্থনা করেন,

"বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে যেন করিতে পারি জয়।"

এই বিপদ বিভীষিকা একান্তভাবে অনিয়মের আবির্ভাব নয় কারণ এই বিপদ বিভীষিকা সেই অসীমেরই আত্মপ্রকাশের উপায় মাত্র। ইহারা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আমাদের সৃজনীশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। সেইজন্য যখনই আমরা বিপদের সামনে আসি তখনই আমাদের মনে রাখা উচিত যে ইহাতে ভয় পাইবার কিছুই নাই। যখনই কবি বিঘ্নবিপদের সম্মুখে আসিয়াছেন তখনই তিনি আপন সৃজনীশক্তিকে আপন যৌবনবেগকে আপন চলন-ধর্মকে "আবিরাবির্মএধি" বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন এবং বিঘ্নবিপদের মধ্যে তাহা উত্তরণের জয়ডঙ্কা শুনিয়াছেন এবং তাহার অরাজকতার মধ্যে লোকোত্তর নিয়ম-শৃঙ্খলকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বাধার আঘাতে সৃজন-শক্তির ক্রমবিকাশ, বাধার জয়ে এবং তাহাকে নিজের মধ্যে সংহরণের লীলাতে নিজের আত্মপ্রকাশের পূর্ণতর আবির্ভাব ও নিজের পরম সত্যের সাক্ষাৎকারের আনন্দ। এই গতির মধ্যেই কবি তাঁহার ধর্মের সাক্ষাৎকার পাইয়াছেন এবং এই গতিধর্মের সহিত তাঁহার জীবনের, তাঁহার ব্যক্তিত্ব-প্রসারণের এমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক যে তিনি তাহাকে তাঁহার জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে প্রস্তুত নহেন। অন্তর্ধাতুর সৃজনীশক্তির ক্রমবিকাশে, নিজের ব্যক্তিত্বের পরিণতিতে, যে একটি অবিচ্ছেদ্য ক্রমচ্ছন্দ আছে তাহাকেই তিনি তাঁহার ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন, "আমার ধর্ম আমার জীবনের মূলে। সেই জীবন এখনও চলেছে কিন্তু মাঝ থেকে কোন এক সময়ে তার ধর্মটা এমনি থেমে গিয়েছে যে তার উপরে টিকিট মেরে তাকে যাদুঘরে কৌতূহলী দর্শনের চোখের সম্মুখে ধরে রাখা যায় একথা বিশ্বাস করা শক্ত,......যেখানে আমি থামিনি,

সেখানে আমি থেমেছি, এমন ভাবের একটা ফটোগ্রাফ তুললে মানুষকে অপদস্থ করা হয়। চলতি ঘোড়ার আকাশে পা-তোলা ছবি থেকে প্রমাণ হয় না যে বরাবর তার পা আকাশেই তোলা ছিল এবং আকাশেই তোলা আছে।" রবীন্দ্রনাথের এই উদ্ধৃত পংক্তি কয়টী হইতে এই কথা বোঝা যায় যে তাঁহার জীবনে কোন এক বয়সের কবিতা হইতে কিম্বা তাঁহার কবিতার কয়েকটি অবান্তর নমুনা হইতে তাঁহার জীবনের ধর্ম্মের পরিচয় নিবার চেষ্টা কখনও সফল হইতে পারে না। তাঁর জীবনের ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে যে ধারাটি অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁহার মধ্য দিয়া সমস্ত জীবন জুড়িয়া স্তরে স্তরে ধাপে ধাপে প্রকাশ পাইয়াছে তারই অনুসন্ধান করিতে হয়। যে সৃজনীশক্তিকে তিনি নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন সমস্ত বিশ্বময় তিনি তারই লীলা দেখিয়াছেন। যে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া, যে অভিঘাতের মধ্য দিয়া, আমাদের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিতেছে সমস্ত বিশ্বময় প্রাণের যে লীলা চলিয়াছে তাহার মধ্যেও তিনি সেই লীলাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বলাকা' কাব্যে, তাঁহার অন্তরাত্মাতে তিনি যে গতিধর্ম্ম অনুভব করেন সেই গতিধর্ম্ম নিজের মধ্যেই ও বাহিরের জগতে ও নিজের সঙ্গে বাহিরের দ্বন্দ্বে কি ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই প্রাধানতঃ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'বলাকার' প্রথম কবিতাটির নাম 'সবুজের অভিযান', এই কবিতাতে তিনি প্রাণের সৃজনীশক্তির যে ধর্ম্মটির দ্বারা পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া নূতনকে আনা হয় তাহারই সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। এই সৃজনীশক্তি যখন আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে তখন সম্মুখে নানা বাধা বিঘ্ন, আবরণ আসিয়া তাহার গতিরোধ করে।

"তোরে হেথায় ক'রবে সবাই মানা।
হঠাৎ আলো দেখবে যখন
ভাববে এ কি বিষম কাণ্ডখানা!
সঙ্ঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে,

সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়!
আয় প্রচণ্ড আয়রে আমার কাঁচা॥"

জীবনীশক্তির এই অভিযানের পথে হয়ত অনেক ভুল ত্রুটি দোষ বিচ্যুতি ঘটিতে পারে।

"ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলি সব আনরে বাছাবাছা।"

কিন্তু সে ভুলের দিকে দৃষ্টি দেবার কোন প্রয়োজন নাই কারণ অবাধ অজানার দেশে যাইতে গেলে অনেক পরিশ্রম ব্যর্থ হইতে পারে। সৃজনীশক্তির মধ্যে যে বেগ আছে সে বেগ কেবলমাত্র এই জানে যে অনন্তের বুকে তাহাকে ছুটিতে হইবে। সেটি নির্ব্বাধ অনন্ত জীবনপ্রবাহ "An infinite vital impulse—spontaneous creativity" তার গতির ছন্দ আসে তার বাধাদ্বারা, সেই জন্য বাধার সঙ্গে বিরোধেই আপন গতিক্রম নির্দ্দিষ্ট হয়।

"আন্‌রে টেনে বাঁধা-পথের শেষে!
বিবাগী কর অবাধ পানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।
আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে তো বক্ষে পরাণ নাচে,
ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথি পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধি-বিধান যাচা'।
আয় প্রমুক্ত, আয়রে আমার কাঁচা।"

এই সৃজনীশক্তি পুরাতনকে নূতন করিয়া, মৃতকে সঞ্জীবিত করিয়া, শীতের আঘাতে পাতা ঝরাইয়া দিয়া, বসন্তের বকুলফুল ফুটাইয়া তুলে। 'সর্ব্বনেশে' কবিতাটিতে এই জীবনীশক্তির ভাঙনের দিকটার ছবি আঁকা হইয়াছে,

"ঝড় এসে তোর ঘর ভ'রেছে,
এবার যে তোর ভিত নড়েছে,
শুনিস নি কি ডাক পড়েছে,
নিরুদ্দেশের দেশে গো।
এবার যে এল ঐ সর্ব্বনেশে গো।"

কিন্তু এই ভাঙনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কবি ভয় পান নাই,

"কণ্ঠে কি তোর জয়ধ্বনি ফুটবে না ?
চরণে তোর রুদ্রতালে
নূপুর বেজে উঠবে না ?
এই লীলা তোর কপালে যে
লেখা ছিল,—সকল ত্যেজে
রক্তবাসে আয়রে সেজে।
আয়না বধূর বেশে গো।"

কবি শুধু যে ভাঙন দেখিয়া ভয় পান নাই তাহা নহে এই ধ্বংসের আঘাতকে অতিক্রম করিয়াই যে তিনি জয়মাল্যের অধিকারী হইবেন এবং এই দ্বন্দ্বের মিলনের দ্বারাই যে তিনি পরম মিলনের সাক্ষাৎকার পাইবেন তাহা বুঝিয়া বধূর ন্যায় ইহাকে বরণ করিয়া লইতেছেন। যাহারা নির্ভীকভাবে এই জীবনের উদ্দাম শক্তির সহিত আপনাকে এক করিয়া দিয়া দ্বিধাদ্বন্দ্বের সহিত সংগ্রাম করিতে ভীত হইয়া পশ্চাতে পড়িয়া থাকে তাহাদের সেই আলস্যে তাহাদের ব্যর্থতা—

"রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।"

সেই জন্য 'আহ্বান' কবিতাটিতে "সর্ব্বনেশে" কবিতাটির ভাবই কবি ফুটাইয়া তুলিয়া বলিতেছেন,—

"জাগবে ঈশান, বাজবে বিষাণ,
পুড়বে সকল বন্ধ।

উড়বে হাওয়ায় বিজয় নিশান

ঘুচবে দ্বিধা দ্বন্দ্ব।

মৃত্যু-সাগর মথন ক'রে

অমৃত রস আন্‌বো হ'রে

ওরা জীবন আঁকড়ে ধ'রে

মরণ-সাধন সাধবে

কাঁদবে ওরা কাঁদবে॥"

পশ্চাতে পড়িয়া থাকাতেই মৃত্যু, সাগরে সাঁতার দেওয়াতেই অমৃত।

যখন আরাম আলস্যে জীবনের মধ্যে একটি শৈথিল্য আসে, বাধাবিঘ্ন যখন জীবনীশক্তিকে উত্তেজিত, উৎফুল্ল করিয়া না তুলে, তখন এই নিশ্চেষ্টতার ব্যর্থতা অনুভব করিয়া কবি বলিয়াছেন,—

"তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে,

কেমন করে সইবো?

* * এ কি রে দুর্দ্দৈব।"

তখন কবি বাধা বিঘ্নকে আহ্বান করিয়া বলেন,

"অন্ধ দিকে দিগন্তরে

জাগাও না আতঙ্ক।

দুই হাতে আজ তুলবো ধরে

তোমার জয়শঙ্খ।...

ব্যাঘাত আসুক নব নব

আঘাত খেয়ে অচল রবো

বক্ষে আমার দুঃখে তব

বাজবে জয়ডঙ্ক।

দেব সকল শক্তি ল'ব

অভয় তব শঙ্খ॥"

গহন রাত্রিকালে গভীর অন্ধকারের মধ্য দিয়া মানুষ অজানা সাগরে পাড়ি দেয়, তার জীবনীশক্তির প্রবাহ তাহাকে কোথায় লইয়া যায় তাহার পথ সে জানে না, দুঃখদৈন্যের অগৌরবের মধ্যে অনন্তের পিয়াসী চিত্ত তার দুর্দ্দাম অন্বেষণের মধ্যে তাহার জীবনের যথার্থ গৌরবের সাক্ষাৎ পায়। রজনীগন্ধার গন্ধের ন্যায় অনন্তের একটি সুগন্ধ তাহার হৃদয়কে আবিষ্ট করিয়া রাখে, তাহার বিশ্বাস যে এই গন্ধের সঙ্কেতে সে যাহাকে পাইয়াছে একদিন তাহার সাক্ষাৎ পাইবে। সে সাক্ষাৎকারের কোন বাহ্যিক লক্ষণ নাই, সেটি একটি অন্তরের প্রস্ফুরণ মাত্র। রাত্রির অন্ধকার কাটিয়া গিয়া প্রভাতের আলোর দর্শনের ন্যায় তার অনুভব। তাই "পাড়ি" কবিতাটিতে কবি বলিয়াছেন,

"বাজবে নাকো তুরী ভেরী, জানবে নাকো কেহ,
কেবল যাবে আঁধার কেটে, আলোয় ভরবে গেহ,
দৈন্য যে তার ধন্য হবে পুণ্য হবে দেহ
পুলক পরশ পেয়ে
নীরবে তার চিরদিনের ঘুচিবে সন্দেহ
কূলে আসবে নেয়ে॥"

কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে যে কবি তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে অন্তর্য্যামীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন যে শিবমদ্বৈতম্‌কে প্রকৃতির সঙ্গে যোগে তিনি তাঁহার জীবনের প্রভাতে একটি শান্তির আবেষ্টনের মধ্যে অনুভব করিয়াছিলেন, যে একটি পরিপূর্ণতার সন্ধান তাঁহার সমস্ত কবিচিত্তের অনুভূতিকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার সহিত এই সৃজনীশক্তির দ্বিধাদ্বন্দ্বের যুদ্ধের সম্পর্ক কোথায়। সেই শিবমদ্বৈতম্ নিশ্চল, শান্ত, নিরঞ্জন। অথচ বাহিরের জগতে ও অন্তরের মনোজগতে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, সেখানে অনবরতই গতির ঘূর্ণাবেগ চলিয়াছে। এই গতিবেগ যদি সত্য হয়, তবে সেই শান্ত নিরঞ্জন কি মিথ্যা? সেকি শুধু পটে লিখা ছবির ন্যায় গভীর মর্ম্মতলে রেখাপাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ?

ধ্যানের মধ্যে যাহাকে উপলব্ধি করা যায় দ্বন্দ্বের মধ্যে আসিয়া কি সে নিঃশেষে তাহার সত্তা হারাইয়া ফেলে? এই যে—

"সহস্র ধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিনী"

ইহার মধ্যে "আনন্দরূপমমৃতং যৎ বিভাতি" তাঁহার স্থান কোথায়? যখন সংসারের দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে নিরন্তর অসি ঝঞ্ঝনের প্রবল আঘাত বিক্ষোভের মধ্যে আমরা তাহার অনুভব বিস্মৃত হই তখন কি তাহার অস্তিত্ব শেষ হইয়া যায়? যাহা চঞ্চল তাহা যদি সত্য হয়, তবে যাহা স্থির অচঞ্চল তাহার সত্যতা কোথায়? এই স্থিরের সহিত চঞ্চলের কি সম্পর্ক? তাহার উত্তরে কবি বলেন যে নদীর তরঙ্গবেগের মধ্যে, মেঘের নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল বর্ণচ্ছটার মধ্যে তাহার মূল শক্তিরূপে সেই শিবমদ্বৈতম্ বিরাজ করিতেছে। বিস্মৃতির মর্ম্মে বসিয়া রক্ত-সঞ্চারের দোলা দিতেছেন। "যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি, যেন চক্ষুংষি পশ্যন্তি প্রাণেন যঃ প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে" অর্থাৎ যাঁহাকে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না অথচ যিনি চক্ষু দর্শনময় করিয়াছেন, প্রাণ যাহাকে পায় না অথচ প্রাণের সাড়া যাহা দ্বারা জাগিয়া উঠিয়াছে তিনিই ব্রহ্ম।

"নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাই;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে;
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।"

তাহারই সুর কবির প্রাণে বাজিয়া উঠিয়া তাঁহাকে কাব্যস্জনে কবি করিয়া তুলিয়াছিল। স্থির হইয়াও তিনি সমস্ত চঞ্চলতার মধ্য দিয়া তাহারই অচঞ্চল মূর্ত্তিকে সার্থক করিয়া তুলিতেছেন। আমাদের অন্তরের নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে তিনিই সামঞ্জস্যের মূল সূত্র, বিরোধের মধ্য দিয়া তিনিই তাঁহার এই সাম্য মূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। বিরোধ না হইলে সাম্যের সার্থকতা নাই। বিরোধ ছাড়া যে সামঞ্জস্য, তাহা শূন্যতার সামঞ্জস্য, দ্বিধাদ্বন্দ্বের আঘাতে, বিক্ষোভের তাড়নার মধ্যে, তাহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়া মনে করিলেও তাহাকে হারাইতে পারি নাই। অন্ধকারে অজানার পথে অগোচরে তাহারই সহিত আবার সাক্ষাৎকার ঘটে। বিরহের ছায়ার আড়াল কাটিয়া জীবনের পূর্ণতায় তাহারই পরিস্ফুরণ জাগিয়া উঠে।

"তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
তার পরে হারায়েছি রাতে
তার পরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি
নও ছবি নও তুমি ছবি।"

১৯৩১শে প্রকাশিত "The Religion of Man"গ্রন্থে কবি বলিয়াছেন, "The truth that is infinite dwells in the ideal of unity which we find in the deeper relatedness.

Truth is both finite and infinite at the same time, it moves and yet moves not, it is in the distant and also in the near, it is within all objects and without them. This means that perfection as the ideal, is immovable but in its aspect of the real it constantly grows towards completion, it moves.

Man must reveal in his own personality the supreme person by his disinterested activities.

Personality is a self-conscious principle of transcendental unity within man which comprehends all the details of fact that are individually haze in knowledge and feeling, wish and will and work. In its negative aspect it is united to the individual separateness, while in its positive aspect it ever extends itself in the infinite through the increase of its knowledge, love and activities."

শা-জাহান কবিতাটিতে কবি বলিয়াছেন যে বাদশা সাজাহান তাঁহার প্রিয়ার জন্য যে অন্তর্বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন তাহাকেই চিরন্তন করিয়া রাখিবার জন্য তাজমহল রচনা করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে মানুষ জীবনের খরস্রোতে সর্ব্বদাই ভাসমান। এক হাতে আমরা যাহা সঞ্চয় করি, অপর হাতে তাহা বিলাইয়া দিই, বসন্তের মাধবীমঞ্জরী ছিন্নদল হইয়া লুটাইয়া পড়ে আবার শিশিররাত্রে নবকুন্দরাজি ফুটিয়া উঠে। দিন ভরিয়া যাহা সঞ্চয় করি দিনান্তে পথপ্রান্তে তাহা ফেলিয়া যাই। এই কালের গতি! তাই শিল্প রচনা দ্বারা মরণধর্ম্মা কালকে প্রতারিত করিয়া নিজের বেদনা-স্মৃতিকে নিজের হৃদয়ের ছবিকে চিরন্তন সৌন্দর্য্যের দূতরূপে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার এই চেষ্টা সার্থক হইয়াছিল। সম্রাট শা-জাহান চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাজ্য, তাঁহার সিংহাসন, তাঁহার বীরগর্ব্ব দিল্লীর পথে ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার রচিত শিল্প চিরকাল ধরিয়া মানবের চিত্তে তাঁহার হৃদয়-বেদনাকে স্মরণ করাইয়া দিবে। তাঁহার রচিত সমাধিসৌধ হইতে চিরন্তন কাল ধরিয়া যেন এই বাণী উঠিতেছে,

"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

কিন্তু কবি বলেন যে Art দ্বারা আমরা এই যে অমরত্বের বা অক্ষয়ত্বের স্থৈর্য্য ও নিশ্চলতা ও চিরন্তনতা সম্পাদন করিতে পারি তাহা কেবলমাত্র বাহ্যতঃ সত্য। মানুষ তাহার সমস্ত জীবনের যাহা কিছু আন্তর সঞ্চয় আহরণ করে, যাহা দ্বারা তাহার নিবিড় আন্তর ধাতু গড়িয়া তুলে, তাহার মধ্যে যে চিরন্তন ক্রিয়া চলিয়াছে, যে নিবিড় জীবনানন্দ সদা সচঞ্চল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারে না। স্মৃতিবিস্মৃতি লইয়া জীবনের ধাতু, যাহা বিস্মৃত তাহা স্মৃতের মধ্যে, যাহা স্মৃত তাহা বিস্মৃতের মধ্যে আপনাকে নিরন্তর ওতপ্রোত-ভাবে গাঢ় সংশ্লিষ্ট করিয়া গতির মধ্যে, প্রবাহের মধ্যে, গতি ও প্রবাহকে অতিক্রম করিয়া যে ঐক্যের সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। বাহিরের দ্বন্দ্ব ও বিক্ষোভের মধ্যে পড়িয়া যখন এই আন্তর প্রবাহের একটি কণা আমাদের কাছে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসে তখন তাহার সহিত আমাদের একটি স্মৃতি বলিয়া পরিচয় ঘটে। জীবনের অখণ্ড মাল্য হইতে একটি বীজ খসিয়া পড়ে, সেই বীজটিকে বর্দ্ধিত করিয়া একটি যুগান্তস্থায়ী প্রকাণ্ড মহীরুহ রচনা করিতে পারি। সেই মহীরুহ কিন্তু কেবলমাত্র এই পরিচয়ই দেয় যে সে একটি পুষ্প হইতে ঝরিয়া পড়া বীজ হইতে উদ্ভূত। কিন্তু তাহা হইতে সেই অখণ্ড মাল্যটির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। জীবনপ্রবাহ হইতে ছিন্ন হইয়া যে অংশটি আর্টের মধ্যে বাহ্যিকভাবে চিরন্তনরূপে দেখা দেয় তাহা জীবন হইতে বিশ্লিষ্ট, খণ্ড, সীমাবদ্ধ। তাহার মধ্যে জীবনের যথার্থ স্বরূপকে আমরা পাই না। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্য চিরকাল ধরিয়া অমর হইয়া থাকিলেও তাহাতে রবীন্দ্রনাথের অখণ্ড অন্তর্জীবনের দর্শন লাভ করা যায় না।

"তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্ত্তিরে তোমার
বারম্বার।"

আর্ট জীবনের একটি বিশ্লিষ্ট অংশ মাত্র। একটি গাছের পাতাকে পাইলে

ফুলকে পাইলে, গাছকে আমরা পাই না। গাছের ফুল যখন গাছের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে তখন গাছের সম্পূর্ণ সত্তার সহিত যুক্ত হইয়া তাহার যে রূপ প্রকাশ পায় তাহাতে ফুলও আছে, ফুল ঝরিয়া পড়াও আছে, আবার নবপুষ্পোদ্গমও আছে। ঋতুতে ঋতুতে গাছ আপনাকে পুষ্পময় করিয়া তুলে, আবার অন্য ঋতুতে নিরাভরণ হয়, আবার পুষ্পিত হয়। এই সমস্ত লইয়া বৃক্ষজীবনের যে প্রবাহ চলিয়াছে পুষ্প সেই জীবনের একটা অবস্থা মাত্র। গাছ হইতে তুলিয়া আনিয়া সেই পুষ্পকে চিরদিন বাঁচাইয়া রাখিলেও তাহা বৃক্ষজীবনের চিরন্তন সত্যকে প্রকাশ করিতে পারিবে না। স্মৃতির আবরণে যাহাকে আমরা ঢাকিয়া রাখি, তাহা মৃত্যুরই নামান্তর। মানুষের জীবন বিশ্বজীবনের গতির নিয়মে চলিয়াছে। কোন একটি ঘরে, কোন একটি অবস্থায় সে আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়া, খণ্ড করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারে না।

"সমাধি মন্দির
এক ঠাঁই রহে চিরস্থির ;
ধরার ধূলায় থাকি
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি।
জীবনেরে কে রাখিতে পারে ?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধন-বিহীন।"

যতক্ষণ আমরা স্মৃতির ভারে আমাদিগকে নিপীড়িত করিয়া রাখি ততক্ষণ আমরা ধরার ধূলার মধ্যে মালিন্যে ধূসর হইয়া খণ্ডতার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকি। মানুষের জীবনের চিরন্তন গতির মধ্যে, তার জীবনপ্রবাহের মধ্যে কোন খণ্ড

অনুভূতি, কোন খণ্ড প্রকাশ, কোন সুখদুঃখের অনুভব, কোন স্মৃতি এমন স্থান পায় না যেখানেসে চিরন্তন হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে। নদীর ঘূর্ণীর মধ্যে যেমন একটি ঝিনুকের কণা ঝিক্ ঝিক্ করিয়া চমক দিয়া পুনর্ব্বার সেই ঘূর্ণীর মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া সেই ঘূর্ণীর মধ্যেই আপন সার্থকতাকে সম্পাদন করে, তেমনি জীবনপ্রবাহের ঘূর্ণীর মধ্যে প্রত্যেক স্মৃতি তার বিস্মৃতির মধ্যে আপন রেশ রাখিয়া আপনাকে সার্থক করে। একথা যদি সকল মানুষের পক্ষে সত্য হয় তাহা হইলে ইহা কোন পরম রূপদক্ষশিল্পীর পক্ষেও সেই রকম সত্য। শিল্পী শিল্পরচনা দ্বারা আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, একথা বলিলে শুধু এইটুকু বোঝা যায় যে তিনি তাঁহার জীবনের একটি বা দুইটি বা ততোধিক অনুভূতিকে রূপ দিয়াছেন। তাঁহার জীবনকে রূপ দেওয়া তাঁহার সাধ্যাতীত। তাজমহল গড়িয়াছিলেন বলিয়া সেই বেদনার অনুভূতির মধ্যে শাহজাহান তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করিয়া দিয়াছিলেন একথা অনুমান করার কোনও কারণ নাই। আর্ট অন্তর্য্যামী ক্রিয়াশক্তির একটি বিকাশ মাত্র; মায়াবী পুরুষের এক মায়া সৃষ্টিমাত্র। সেই জন্য আর্ট দ্বারা আমরা সেই মায়াবী পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি না। তাঁহার 'The Religion of Man" গ্রন্থে কবি বলিয়াছেন যে—"I am convinced that this also belongs to the Maya of creation whose one important indispensable factor is this self-conscious personality that I represent."

আর্ট সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল অন্য সকল মনোবৃত্তি সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলা যাইতে পারে। প্রেম আমাদের চিত্তের একটি শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। কিন্তু প্রেম যদি প্রেমাস্পদের সহিত এমনই মূঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়ে যে তাহার জীবনের সমস্ত বেগ স্পন্দন সেইখানেই ক্রমশঃ সংহত হইয়া অবশেষে থামিয়া যায় তাহা হইলে সে প্রেমকে বলা যায় মোহ। তাহা জীবনের গতির অনুকূল নহে প্রতিকূল, তাহা মুক্তি দেয় না, আনে বন্ধন। দেশভক্তি যদি মানুষের স্কন্ধে এমন করিয়া আরোহণ করিয়া বসে যে আর সমস্ত বড় জিনিবের প্রতি সে নিস্পৃহ হয় এবং

সেই ভক্তি যদি তাহার চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক বিকাশের পথ হইতে অন্যত্র টানিয়া লইয়া যায় তবে সেই ভক্তি আনে মূঢ়তা। তাহার পথে জীবনে যে বন্ধ আসে সে বন্ধকে সে অতিক্রম করিতে পারে না। একটা ঢেউয়ের যেমন স্বাভাবিক পরিণতি এই যে, সে আর একটি ঢেউয়ের সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রের গতি-বেগের মধ্যে আপনাকে বিলীন করিয়া দিয়া আপনার সার্থকতা লাভ করে, অথচ সেই গতিবেগের সহিত বিচ্যুত হইলে তাহার আপন স্বাভাবিক সত্তা হারাইয়া ফেলে, তেমনি মানুষের প্রেমও প্রেমাস্পদকে অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে ছাড়াইয়া যায় এবং সমুদয় মানুষটির ক্রমপ্রসারী আত্মপ্রকাশের মধ্যে আপনার যথার্থ পরিচয় পায়, অথচ শুধু প্রেমাস্পদের মধ্যেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, সেইখানেই আপন সার্থকতাকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলে।

"যে প্রেম সম্মুখ পানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,
তার বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধূলার মতো জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে
দিয়েছো তা ধূলিরে ফিরায়ে।"

বলাকার প্রধান বক্তব্য এই যে আমাদের অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তির বেগে আমরা সমস্ত বাধাবিপদ উত্তীর্ণ হই, এই সৃজনীশক্তির আপন স্বাভাবিক গতি কোন্ অজানার দিকে ছুটিয়াছে তাহা আমরা জানি না। অথচ এই বাধা বিপত্তির সহিত সংগ্রামে এই সৃজনীশক্তির গতিচ্ছন্দ নিয়মিত হয় ইহাই আমাদের জীবনের ব্যাপক ধর্ম্ম, ব্যাপক স্বভাব এবং আমাদের পরম আত্মীয় প্রকৃতি। প্রথম প্রশ্ন উঠিয়াছিল এই যে তাহা হইলে আমাদের কূটস্থ অন্তর্ব্যামী পুরুষের সহিত আমাদের এই গতির, প্রাকৃতিক জীবনের সম্বন্ধ কোথায়, 'ছবি' কবিতাটিতে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠিয়াছিল এই যে প্রেম যখন আমাদিগকে জীবনের গতিবেগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনে এবং আর্টের দ্বারা

যখন সেই জীবনপ্রবাহ হইতে একটি বিন্দুকে, জীবনের মালা হইতে একটি বীজকে স্বতন্ত্র করিয়া, চিরন্তন করিয়া আমরা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করি তখন সেই সীমাবদ্ধের মধ্যে আমাদের চরম সার্থকতা হয় কি না? সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে শা-জাহান কবিতায়। বিচ্ছিন্ন প্রেমের মধ্যে, আর্টের বিচ্ছিন্ন সৃষ্টির মধ্যে জীবনের যথার্থ সার্থকতা নাই। জীবনের যথার্থ সার্থকতা সেইখানে যেখানে স্রষ্টা তাঁহার নিজের সৃষ্টিকে অতিক্রম করেন। উপনিষদ বলিয়াছেন; 'তদৈক্ষত বহু স্যাম্' তিনি বহু হইতে আরম্ভ করিয়া আপন ঈক্ষণ ক্রিয়ায়, আপন স্বরূপ-দর্শনের সুদর্শন-চক্রে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ তাঁহারই স্বরূপের প্রতিবিম্ব মাত্র। কিন্তু এই প্রতিবিম্বের মধ্যে তিনি আপনাকে নিঃশেষে ক্ষয় করিয়া ফেলেন নাই। নার্সিসাস-এর মতন আপন প্রতিবিম্বের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহান্ধ হইয়া আপনাকে জড় করিয়া ফেলেন নাই। কিন্তু নিরন্তর সৃষ্টির কার্য্যের মধ্য দিয়া তিনি আপনার স্বরূপকে সার্থক করিয়া তুলিতেছেন। সৃষ্টির মুখে বাধা উত্তীর্ণ হইয়া আবার সৃষ্টি, এমনি করিয়া চির-চঞ্চল স্বভাবের মধ্য দিয়া আপনার অচঞ্চল সত্যস্বরূপকে সার্থক করিয়া তুলিতেছেন। কোন সৃষ্টিতেই তিনি বাঁধা পড়িয়া যান নাই। সৃষ্টিই অপর একটি সৃষ্টির কারণীভূত হইয়া সমগ্রের মধ্যে তাহার আত্মপরিচয় লাভ করিয়াছে। 'বলাকা'র প্রথম সাতটি কবিতায় অন্তর্জগতের দিক দিয়া এই লীলাটি চিত্রিত করা হইয়াছে। যদি "বিশ্বভারতীর" অভিভাবকগণের তরফ হইতে কোন খেসারৎ দাবীর ভয় না থাকিত তবে 'বলাকা'র কোনও নূতন সংস্করণ করিতে গেলে আমি এইখানে 'বলাকা'র প্রথম পর্ব্ব বলিয়া সূচনা করিতাম। 'চঞ্চলা' কবিতা হইতে আরম্ভ করিয়া এই লীলারই বাহ্য জগতের পরিচয় ও বাহ্য হইতে অন্তরে আসিবার সেতুর পরিচয় আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু 'চঞ্চলা' কবিতাটি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ঠিক শা-জাহান কবিতাটির পরে,—

কে তোমারে দিল প্রাণ
রে পাষাণ

এই কবিতাটি বসান উচিত ছিল। এই কবিতাটিতে আর্টে মানুষের বেদনাকে কি উপায়ে সর্ব্ব মানবের অনুভূতির মধ্যে চিরন্তন সাক্ষাৎরূপে প্রকাশ করিতে পারে তাহাই বলা হইয়াছে। মানুষের জীবনপ্রবাহ হইতে একটি খণ্ড অনুভূতিকে বাহির করিয়া আনিয়া ঐন্দ্রিয়ক উপায় দ্বারা (Sensuous form) তাহাকে বাহ্যজগতে মূর্ত্ত করিয়া সর্ব্বকালের সর্ব্বমানবের তাদৃশ অনুভূতির মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত করা, ইহাই আর্টের কাজ। মানুষের অন্তরের যে মনটি তাহার একান্ত আপনার, তাহার একান্ত নিজস্ব, সেখানে অপর কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। সেখানে মানুষ আপন সার্থকতা আপনিই উপলব্ধি করে। জীবনযাত্রার পথে বহির্জগতের সহিত মানুষের যে নানা সম্পর্ক ঘটে নানা উপকরণের পুঞ্জীভূত ভারের সহিত মানুষ যে আপনাকে ভারগ্রস্ত করে তাহা তাহার একান্ত অনাত্মীয়। মানুষের সৃজনীশক্তির সহিত তাহার আত্মস্বভাবের সহিত তাহার কোন যোগ নাই। তাই তাহাদের মধ্যে মানুষের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বস্তুনিচয়ের পরস্পর সঙ্ঘাতে বস্তুরা আসিয়া এক জায়গায় জমিয়া উঠে আবার বিশীর্ণ হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। মানুষ অন্তরে যে সত্যকে অনুভব করে আর্টের দ্বারা তাহা সর্ব্বসাধারণের করিয়া প্রকাশ করে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একদিকে যেমন তার ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা আছে অপরদিকে তাহার মধ্যে একটি বিশ্বপুরুষ আছে। সমস্ত মানুষের মধ্যেই একই সৃজনীশক্তির লীলা আত্মপ্রকাশ লাভ করিতেছে তাই একটি পুরুষের অন্তর্জীবনের লীলার মধ্যে যে বেদনাটি পরম সত্য বলিয়া অনুভূত হয় তাহা বিশ্বমানবের অনুভূতির মধ্যে চিরন্তনভাবে সত্য হইয়া রহিয়াছে। তাই কোন মানুষ যখন তাহার অন্তর্য্যামী পরম সত্যের আহ্বানে আপনার সৃজনীশক্তি দ্বারা কোনও একটি অনুভবকে পরম সত্য বলিয়া অনুভব করে এবং ঐকান্তিক উপায় দ্বারা সর্ব্বসাধারণের নিকট মূর্ত্ত করিয়া তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে তখন সর্ব্বকালের সর্ব্বমানব সেই ব্যক্তির সেই বিশেষ অনুভবটিকে তাহাদেরই মধ্যের একটি অনুভব বলিয়া আবিষ্কার করে ও গ্রহণ করে। এইজন্য আর্টের পথে একদিকে যেমন আমাদের জীবনপ্রবাহ হইতে একটি অনুভূতিকে

বিচ্ছিন্ন করিয়া মূর্ত্ত করিয়া জগতের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে পারি, অপরদিকে তেমনি বিশ্বমানবের অনুভূতির মধ্যে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া সর্ব্বমানবের একটি বিরাট সাম্যের পরিচয় পাই—

"সম্রাট-মহিষী
তোমার প্রেমের স্মৃতি সৌন্দর্য্যে হয়েছে মহীয়সী,
যে স্মৃতি তোমারে ছেড়ে, গেছে বেড়ে
সর্ব্বলোকে
জীবনের অক্ষয় আলোকে।
অঙ্গ ধরি' যে অনঙ্গ স্মৃতি
বিশ্বের প্রীতির মাঝে মিলাইছে সম্রাটের প্রীতি।"

"আজ সর্ব্বমানবের অনন্ত বেদনা
এ পাষাণ সুন্দরীরে
আলিঙ্গনে ঘিরে
রাত্রিদিন করিছে সাধনা।"

কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গেই কবি এই কথাটি বারম্বার আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন যে আমাদের জীবনের সমস্ত অনুভূতির যে ছবি আমরা আর্টের দ্বারা বহির্জ্জগতে প্রকাশ করি তাহা আমাদের সৃষ্টিময় অন্তর্জীবনের যথার্থ রূপ নহে। তাই যখন 'দান' কবিতাটিতে কবি বলিতেছেন,

"হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে
নিজ হাতে
কী তোমারে দিব দান?
প্রভাতের গান?

প্রভাত যে ক্লান্ত হয় তপ্ত রবিকরে
আপনার বৃন্তটির পরে ;
অবসন্ন গান
হয় অবসান।"

আর্টের যে প্রাপ্তি তাহা চরমপ্রাপ্তি নয়। তাহা মানুষের শ্রেষ্ঠ ধন নয়,

"আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে,
দেখা দেয় মিলায় পলকে
বলে না আপন নাম, পথেরে শিহরি দিয়া সুরে
চলে যায় চকিত নূপুরে।
সেথা পথ নাহি জানি,
সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী।
বন্ধু তুমি সেথা হতে আপনি যা পাবে
আপনার ভাবে,
না চাহিতে না জানিতে সেই উপহার
সেই তো তোমার।
আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান
হোক ফুল হোক তাহা গান।"

অন্তঃপুরুষের সৃজনীশক্তির মধ্যে, তাহার নিরন্তর আত্ম-প্রকাশের গতিশীলতার মধ্যে তাহার অজানার দিকের অভিসারের আপন স্বচ্ছন্দ চমকে ঝলকে যাহা ফুটিয়া উঠে তাহাই মানুষের অন্তর্ব্যামীর হাতে দিবার উপযুক্ত শ্রেষ্ঠধন, যাহা নিজের ইচ্ছায় টানিয়া বাহির করিয়া আনে তাহা নহে। কোন্ অজানার স্রোতের ঘূর্ণী হইতে কাব্যের ফুল ফুটিয়া উঠে এবং জীবনের সহিত আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেশে দেশে দিকে দিকে ভাসিয়া বেড়ায়, যেখানে তাহারা জন্ম লইয়াছে, সেখানে তাহাদের মূলের সহিত তাহারা তাহাদিগকে গাঁথিয়া রাখিতে পারে নাই। তাহাদের বাসা নাই, সঞ্চয় নাই, আলোর আনন্দ নিয়া জলের

তরঙ্গে তাহারা নাচিয়া বেড়ায়। তাহারা আজানা অতিথি, তাহারা কবে আসে কবে যায় তাহার কোন নিশ্চয় নাই।

'চঞ্চলা' কবিতাটিকে চিরচঞ্চল স্রোতে চাহিয়া কবি আপন অন্তরের মধ্যে সৃজনীশক্তির যে সাক্ষাৎ পাইয়াছেন তাহাকেই যেন বাহিরে মূর্ত্তরূপে প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

"স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে।
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে

* * *

হে ভৈরবী ওগো বৈরাগিণী,
চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী
শব্দহীন সুর,
অন্তহীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া ?

* * *

শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও
ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লও না কিছু, কর না সঞ্চয়,
নাই শোক, নাই ভয়।
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথের কর ক্ষয়।
যে মুহূর্ত্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্ত্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।

যদি তুমি মুহূর্ত্তের তরে
ক্লান্তি ভরে
দাঁড়াও থমকি,
তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্ব্বতে ;

* * *

অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্ম্মমূলে
কলুষের বেদনার শূলে।

যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হ'তে রূপে
প্রাণ হ'তে প্রাণে।
নিশীথে প্রভাতে
যা কিছু পেয়েছি হাতে
এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হ'তে দানে,
গান হতে গানে।

তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে
তাকাসনে ফিরে।

সম্মুখের বাণী
নিক্ তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।"

এই কবিতাটি পড়িলে দেখা যায় যে-সৃজনীশক্তি এই জগৎ রচনা করিয়াছে তাহা একটি প্রাণস্রোত, একটি প্রাণবেগ মাত্র, a vital impulse! যে শক্তির নিজের কোন রূপ নাই বস্তু নাই অথচ তাহা হইতে নিরন্তর রূপবস্তু ফুটিয়া উঠিতেছে। তাহার শব্দ নাই, কোন অন্তহীন দূরের আহ্বানে সে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার গতিবেগে সে যাহা উৎপন্ন করিতেছে তাহার দিকে তাহার দৃষ্টি নাই, মায়া নাই, মোহ নাই। সে ঘূর্ণীর প্রবাহিণী সমস্ত ঘূর্ণীতে আপনাকে নিরন্তর প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। প্রকাশের ফলে তাহার লোভ নাই, প্রকাশের বিকাশে তাহার আনন্দ। যদি এই ক্রিয়াশক্তি, এই সৃজনী শক্তি মুহূর্ত্তের জন্য বন্ধ হইত তবে বিশ্ব মৃতজড়পুঞ্জের সমাবেশে মহাকলুষতার সৃষ্টি করিত। কিন্তু শক্তির নিত্য-মন্দাকিনী মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবনকে নিরন্তর শুচি করিয়া তুলিতেছে। মৃত্যুকে জীবনের মধ্যে স্থান দিয়াছে বলিয়াই মৃত্যুর মধ্যে আমরা মৃত্যুকে পাই না, চিরনবীনের অমৃতের মধ্যে মৃত্যুর যথার্থরূপ প্রত্যক্ষ করি। এই জাতীয় আর একটি কবিতাতে (১৬) কবি বলিয়াছেন যে মানুষ যখন তাহার লক্ষ লক্ষ অলক্ষ্য ভাবনা ও অসংখ্য কামনাকে আশ্রয় করিয়া বাহিরের জড়পদার্থের মধ্যে কাষ্ঠ লোষ্ট্রের মধ্যে আপনাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চায় তখনই তাহাকে জড়পদার্থের কঠিন নিপীড়নে নিগৃহীত হইতে হয়। মানুষের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা, কলকারখানা প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা চারিদিকে দেখিতে পাই তাহাই মানুষের জড়পরিণতি। অতীতের কত অশ্রুতবাণী আমাদের অন্তরের মধ্য দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে। নীরব কোলাহলে চিত্তগুহা ছাড়িয়া কোথায় কোন অদৃষ্টের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে তাহাদের কোনটিকে

হয়তো ধরিয়া আমরা রূপের বাঁধনে বাঁধিয়া রাখি। আবার তাহাদের মধ্যে কত অসংখ্য অগণিত অস্ফুট ভাবনা চিত্তের মধ্যে ক্ষণিক ঝঙ্কার দিয়া কোথায় কোন্ গহনে আপনাদিগকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। আবার হয়তো কোন সুদূরকালে কোন কবির কোন শিল্পীর সুকৌশলে তাহাদের কেহ কেহ রূপের বাঁধনে ধরা পড়িয়া মূর্ত্তভাবে প্রকাশলাভ করিবে। সকল মানবের মধ্য দিয়াই একটি সৃষ্টিক্রিয়া চলিয়াছে। কোন্ আলোকের উদ্দেশ্যে চিত্তের ভাব-যাত্রীদের তীর্থ-যাত্রা চলিয়াছে। সকলের মধ্যে এই একই ইতিহাস। এক কবির কাছে যাহা মূর্ত্তিলাভ করিল না, তাহা হয়ত সহস্র শতাব্দী পরে অন্য কবির নিকট মূর্ত্তিলাভ করিবে। চিরন্তনকালের মানবের মধ্যে এই যে চিরন্তনলীলা চলিয়াছে কালে কালে লোকে লোকে তাহারই অংশ বিশেষ চিত্রে ছন্দে গানে মূর্ত্তিলাভ করিয়া প্রত্যেকের মধ্যে অবস্থিত বিশ্বমানবের ঐক্যরূপটিকে সাক্ষাৎ করাইয়া দেয়।

মানুষ যখন আপন নগ্ন বাসনার তাড়নায় আপন আত্মস্বরূপকে বিস্মৃত হইয়া তাহার অমর্য্যাদা করে, তখনও প্রকৃতির সৃষ্টির মূর্ত্তি পুষ্পবনে, পুণ্য সমীরণে, তৃণপুঞ্জে, পতঙ্গগুঞ্জনে, বসন্তের বিহঙ্গকূজনে, তরঙ্গচুম্বিততীরে মর্ম্মরিত পল্লব-বীজনে তাহার বাণী প্রচার করিয়া যায়। সন্ধ্যা তাপসীর হাতে জ্বালা সপ্তর্ষির পূজাদীপমালা তাহাদের মত্ততার দিকে সারারাত্রি চাহিয়া থাকে এবং তাহার নিভৃত অন্তরের মধ্যে সাড়া দিতে চেষ্টা করে। জননীর স্নেহাশ্রু, প্রণয়ীর অসীম বিশ্বাস, তাহাদের বিদ্রোহ দগ্ধ ক্ষতবক্ষকে যেন গ্রাস করিয়া লয়, বিনিদ্র স্নেহের স্তব্ধ নিঃশব্দ বেদনাতে, সতীর পবিত্র প্রেমে, সখার হৃদয়-রক্ত-পাতে, সমস্ত বিশ্বের প্রেম তাহাদিগকে পবিত্র প্রায়শ্চিত্তবারিতে বিধৌত করে। আবার দেখি যখন এই প্রেমের সম্পদের ভারে অযোগ্য পাপী আপনার মধ্যে আপনি ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে এবং আত্মবোধিতে জাগ্রত হইতে অক্ষম হয় তখন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার বেশে গর্জ্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়, প্রলয়লেখনের রক্তবর্ষণে, সজ্যাতের উদ্দাম ঘর্ষণে নিষ্পেষিত হইয়া তাহারা একটি নূতন জাগরণের অবসর পায়।

সৃজনীশক্তির মধ্যে তাহার আত্মসংশোধনের বিচিত্র লীলা একদিকে যেমন শান্ত কোমলের মৃদু সংস্পর্শে প্রকাশ পায় অপরদিকে তেমনি বজ্রের জলদর্চ্চিশিখায় আপনাকে প্রকটিত করে। ইহাই সৃজনীশক্তির আত্মবিচারের পদ্ধতি। প্রকৃতির সর্ব্বত্র নিত্য এই বিচার চলিয়াছে। প্রকৃতির দান আমরা সর্ব্বদাই পাইতেছি। অনেক সময়ে এই দানের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝি না বলিয়া ইহার সম্পদে নিজেকে জালের দ্বারা আবদ্ধ করিয়াছি। কেবল পাওয়া দ্বারা চাওয়ার মাত্রা বাড়াইয়াছি। এ পাওয়ার তৃষ্ণায় চিত্ত ভরিয়া উঠে, তৃপ্তির শক্তি দেয় না। তখনই আসে শান্তি, তখনই আসে পূর্ণতা, তখনই আসে সার্থকতা, তখনই আমাদের অন্তরের নির্ম্মল বোধিবৃক্ষের আলোতে আমরা এই দানের স্তূপে আমাদিগকে আবদ্ধ না করিয়া আমাদের আত্মস্বরূপের হাতে আমাদিগকে সমর্পণ করি।

আর এক জায়গায় (১৮) কবি বলিতেছেন, যতক্ষণ আমরা স্থির হইয়া থাকি এবং সতর্ক বুদ্ধি দ্বারা বিশ্বকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া, ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া, তত্ত্ব অন্বেষণের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকি, ততক্ষণ বিনিদ্র রজনীর চিন্তাভারে আমাদের শান্তি অপহৃত হয়। কিন্তু যখনই চলার বেগ বিশ্বের আঘাত আমাদের গায়ে লাগে, তখনই আমাদের আবরণ ছিন্ন হইয়া যায়, এবং আমাদের অমৃতময় নবযৌবন আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া সম্মুখের দিকে টানিয়া লইয়া যায়, এবং তাহার আনন্দগানে অন্তর্গগন পূর্ণ হইয়া উঠে। পৌষের পাতাঝরা তপোবনের মধ্যে যখন বসন্তের মাতাল বাতাস উচ্চহাস্যে টলিয়া পড়ে, তখনও আমরা প্রকৃতির মধ্যে আমাদের এই গভীর সত্যকেই উপলব্ধি করিতে পারি। বয়সের জীর্ণপথের শেষে মরণের সিংহদ্বার পার হইয়া প্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে মানুষ তাহার চিরযৌবনকে জীবনের এপারে ওপারে বারম্বার সাক্ষাৎকার করিতেছে।

আমাদের জীবনের সহিত প্রকৃতির একটি অবিচ্ছিন্ন যোগ আছে। সেই যোগটিকে আমরা তখনই প্রত্যক্ষ করিতে পারি, যখন আমরা তাহাকে ভালবাসি। প্রকৃতির সত্য তখনই আমাদের মধ্যে আপনাকে আত্মপ্রকাশ

করে, যখন আমরা প্রেমের আনন্দে প্রকৃতির মর্ম্মস্থানকে স্পর্শ করিতে পারি। প্রকৃতিকে ভাল না বাসিলে প্রকৃতি তাহার বাণী আমাদিগকে শুনাইতে পারে না।

"হে ভুবন
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছিনু ভালো
ততক্ষণ তব আলো
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তা'র সব ধন।
ততক্ষণ নিখিল গগন
হাতে নিয়ে দীপ তার শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে।"

প্রকৃতিকে নিজের চেতনার মধ্যে ভাসাইয়া তুলিতে পারিলে তাহার জীবনের সহিত নিজের একান্ত অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধকে বুঝিতে পারা যায়।

"প্রভাত সন্ধ্যায়
আলো-অন্ধকার
মোর চেতনায় গেচে ভেসে ;
অবশেষে
এক হয়ে গেচে আজ আমার জীবন
আর আমার ভুবন।"

সাধারণতঃ মনে হয় যে, মৃত্যুর সঙ্গেই আমাদের সহিত আমাদের বহির্জগতের একান্ত বিচ্ছেদ ঘটে।

"তবুও মরিতে হবে এও সত্য জানি।
মোর বাণী
একদিন এ বাতাসে ফুটিবে না
মোর আঁখি এ আলোকে লুটিবে না,
মোর হিয়া ছুটিবে না
অরুণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে ;"

মৃত্যুর সহিত এই যে একটা বিচ্ছেদ আমরা দেখিতে পাই, ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ দেখান কঠিন। আমাদের চাওয়া যেমন সত্য, আমাদের ছাড়িয়া যাওয়াও সেই রকম সত্য। কিন্তু জীবনের চাওয়ার মধ্যে বহির্জগতের সঙ্গে যে ঐক্য পাওয়া গিয়াছিল, ছাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সে ঐক্য, সে মিল, সে সামঞ্জস্য একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। বিশ্বকে ও বিশ্বের অনুভবকে কবি কোনক্রমেই একান্ত প্রবঞ্চনা বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। পরিণামে যদি উভয়ের মধ্যে এমন গভীর অসামঞ্জস্য থাকে, তবে আরম্ভের এ সামঞ্জস্যের কোন অর্থ নাই।

"এমন একান্ত করে' চাওয়া
এও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মতো।

এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোন মিল ;
নহিলে নিখিল
এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।"

এই মিলটুকু কোথায়, এবং জীবনের বাহিরে এই মিলের স্বরূপ কি, এই সম্বন্ধে কবি অন্য কোন স্থানে যে বিশেষ কিছু আভাস দিয়াছেন এমন মনে হয় না; বরং জীবনের এই মিলের কথা যেন হঠাৎ একটা নূতন সুর বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রায় অধিকাংশ কবিতাতেই যে ব্যথার সুরের, যে বিরহের ক্রন্দনের পরিচয় আমরা পাই তাহার সত্য পরিচয় এই জীবনের মধ্যে। আমাদের সমস্ত বিকাশের মধ্য দিয়া আমরা যে অনাগতের দিকে গড়িয়া উঠিতেছি, তাহারই আকর্ষণ আমাদের প্রত্যেক জীবনের মধ্যে আমরা অনুভব করি।

"হে অজানা, অজানা সুর নব
বাজাও আমার ব্যথার বাঁশিতে,

*　　*　　*　　*

কোন কালে হয়নি যারে দেখা—ওগো
তারি বিরহে
এমন করে' ডাক দিয়েছে,
ঘরে কে রহে ?"

বাহিরের জগতের দিকে চাহিয়া কবি বলিতেছেন যে, চাঁপা বকুল প্রভৃতির শাখায় শাখায় তাদের কোলাহল, গন্ধে ও রংএ অরণ্যময় ছাইয়া গিয়াছে, অথচ এই ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ঝরিয়া পড়িতেছে। কবে কোন্ বসন্ত আসিবে তাহারই যেন দূর পায়ের শব্দ শুনিয়া তাহাকে দূর হইতে বরণ করিবার জন্য, তাহাকে স্থান ছাড়িয়া দিবার জন্য, ফুলেরা দলে দলে মরণসাগরে ঝাঁপ দিতেছে। চাঁপা বকুল ফোটে বর্ষায়, কাজেই বসন্তের আসিতে দেরী ; সুতরাং আপাততঃ মনে হইতে পারে যে একটা হিসাবের ভুল হইয়াছে। কিন্তু এই বসন্তের আগমনের বিরহ বৃক্ষশরীরে অনেক দিন হইতেই জাগিয়াছে এবং ঋতুতে ঋতুতে ফুলের ফোটা-ঝরার মধ্য দিয়া বসন্তের আগমনের বাসর-শয়নের রচনা চলিতেছে। দূর হইতে যেন ফুলেরা পায়ের শব্দে কাহার আগমন অনুভব করিয়াছে, চোখে না দেখিয়াই তাহারা যে যার বোঁটার বাঁধন খুলিয়া ফেলিয়া বৃক্ষের জীবনকে আপনাদের অনাবশ্যক ভার হইতে মুক্তি দিয়াছে।

"ওরে ক্ষ্যাপা, ওরে হিসাবভোলা,
দূর হ'তে তার পায়ের শব্দে মেতে
সেই অতিথির ঢাকতে পথের ধূলা
তোরা আপন মরণ দিলি পেতে।
না দেখে না শুনেই তোদের পড়লো বাঁধন খসে'
চোখের দেখার অপেক্ষাতে রইলিনে আর ব'সে।"

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাতেই দেখা যায় যে, জীবনের বাহিরে জীবনের যে অভিমান সেটা জন্মান্তরের আকারেই হউক, কি পারলৌকিক কোন প্রেত-দেহের মধ্য দিয়াই হউক, তাহাতে কোন উৎসাহ নাই। তাঁহার গানের প্রধান লীলাকেন্দ্র হইতেছে জীবনমৃত্যুর পবিত্র সঙ্গমতীর্থ। এই দেহে প্রাণ থাকিতে থাকিতেই অনেক মৃত্যুর মধ্য দিয়া আমাদের জীবনকে নবীন করিয়া লইতে হয়। দেহ বিচ্ছেদের পর একটা কেন্দ্রে জীবনের অবসান হয় বটে, কিন্তু তাহাতে জীবনের কোন শেষ নাই; কোটী কোটী দেহের মধ্য দিয়া জীবনধারা চলিয়াছে, একটি দেহের যখন অবসান হয়, তখন আবার নূতন দেহকে অবলম্বন করিয়া নূতন জীবনকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। এমনি করিয়া ঝরা পাতার মত কত দেহ ঝরিয়া যাইতেছে, কিন্তু বিশ্বের অক্ষয় জীবনের যৌবন আবার নূতন নতন দেহ উৎপাদন করিতেছে এবং তাহার মধ্য দিয়া আপনার জীবনের খেলা খেলাইয়া চলিয়াছে। জীবনের বাহিরে কোথাও স্বর্গ নাই। জীবনের বাহিরে স্বর্গ খোঁজা ফাঁকা ফানুস খোঁজার তুল্য। আমাদের প্রেমে, আমাদের স্নেহে, ব্যাকুলতায়, লজ্জায়, সুখে দুঃখে, জন্মমৃত্যুর তরঙ্গে, নিত্য নবীন রংএর ছটায় স্বর্গ আমাদেরই মধ্যে জন্ম নিয়াছে। আকাশ ভরা আনন্দে তার ঠিকানা আমরা পাই, দিগঙ্গনার অঙ্গনে তারই শঙ্খ বাজে, সপ্তসাগর তারই বিজয়-ডঙ্কা বাজায়। স্বর্গ যে মাটির মায়ের কোলে জন্ম নিয়াছে, বনের পাতায় ঝর্ণাধারায় তাহারই সমারোহ চলিয়াছে এবং তাহারই আনন্দ-কল্লোলে তাহারই ধ্বনি শোনা যায়। আর একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

"এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো,
এই দু'দিনের নদী হব পার গো।
তার পরে যেই ফুরিয়ে যাবে বেলা,
ভাসিয়ে দেব ভেলা।
তার পরে তার খবর কি যে ধারিনে তার ধার গো,
তার পরে সে কেমন আলো, কেমন অন্ধকার গো।"

রবীন্দ্রনাথের প্রধান আনন্দ এই কথাতেই যে, তিনি অজানার যাত্রী। জানার জালে আমরা আমাদিগকে বাঁধি, অজানা এসে সে বন্ধন মুক্ত ক'রে দেয়। অজানা সামনে এসে ভয় দেখায়, কিন্তু সেই ভয়ের মধ্য দিয়াই ভয়কে ভাঙা যায়। অজানা সামনে আছে, সেই জন্য তাহাকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। আমাদের এই কূলের দড়ি ছিঁড়িয়া গিয়া মহাসমুদ্রে ভাসান দিলে তাহা যে আবার ফিরিয়া আসিয়া আমাদের এই সংসারের তীরেতেই আশ্রয় লইবে, যাহাকে অতিক্রম করিয়াছি সেই যে আবার আমাদিগকে ঘিরিয়া ধরিবে এমন কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু এই দেহ লয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে মৃত্যুকে আমরা কাল্পনিক চক্ষুতে দেখি, সেইটাই আমাদের ঘোর অবিদ্যা। এই জীবনের মৃত্যুর দ্বার অতিক্রম করিলে আমাদের সেই নবজীবনের রূপ যে কি হইবে তাহা আমরা জানি না; কিন্তু সমস্ত প্রকৃতিকে দেখিয়া আমরা এই আশ্বাস পাইয়াছি যে, সে জীবন একটা নবতম কল্যাণতর অভিব্যক্তি। এই জীবনের সহিত সেই জীবনের মিল কোথায় তাহা আমরা জানি না। এই জীবনে প্রকৃতির সহিত আমার যা সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ ছিন্ন হইবার পর আবার যে কিরূপ সম্বন্ধ হইবে, তাহাও আমরা জানি না; কিন্তু তথাপি এইটুকু জানি যে, জানার সঙ্গে আমাদের যেটুকু মিল আছে তার চেয়ে বড় মিল আছে অজানার সঙ্গে। জানার সহিত আমাদের যে মিল আছে তাহা সীমাবদ্ধ, অজানার সহিত যে মিল তাহা অসীম। অজানা আমাদের হালের মাঝি, তার সঙ্গে আমাদের চিরকালের এই চুক্তি যে, সে মুক্তি আনিয়া দিবে।

"মানে না সে বুদ্ধিশুদ্ধি বৃদ্ধ জনার যুক্তি,
মুক্তারে সে মুক্ত করে ভেঙে তাহার শুক্তি"

এই বিশ্বাসে কবি বলিতেছেন,

"ঘণ্টা যে ঐ বাজলো কবি, হোক্ রে সভাভঙ্গ।
জোয়ার-জলে উঠেচে তরঙ্গ।

এখনো সে দেখায়নি তা'র মুখ,
তাইতো দোলে বুক!
কোন্ রূপে যে সেই অজানার কোথায় পাবো সঙ্গ।
কোন্ সাগরের কোন্ কূলে গো কোন্ নবীনের রঙ্গ!"

এই সংসারের দুঃখ পাপ ও অশান্তির ঘূর্ণীর মধ্যে আমরা প্রত্যহই ছোট ছোট মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করিতেছি; আবার ইহাও দেখিতেছি যে, অজানার আলিঙ্গনের মধ্য দিয়া সেই পাপ, দুঃখ, অশান্তিকে আমরা অনায়াসে অতিক্রম করিয়া যাই। সেই জন্য দেহাবসানের সন্ধিক্ষণে পৃথিবীর যত পাপ, যত অমঙ্গল, যত অশ্রুজল তাহা যদি একত্র তরঙ্গিত হইয়া কূলোল্লঙ্ঘী উর্ম্মিমালার ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে প্রলয়-বিষাণ বাজাইয়া তোলে, যদি

"ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত-ক্ষোভ,
জাতি-অভিমান
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।"

আর যদি মৃত্যুর প্রলয়-পারাবারের মধ্য দিয়া পার না হইয়া নূতন সৃষ্টির উপকূলে পৌঁছিবার আর কোন উপায় না থাকে তবে নিখিলের এই বজ্রবাণ বুক পাতিয়া লইতেই হইবে, তাহাতে ভয় করিবার কিছু নাই, ভাবনা করিবারও কিছু নাই, শুধু এই বলা যায়,

"শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয়-পারাবার"

কাণ্ডারীর আদেশ আসিয়াছে, বন্দরের বন্ধনকাল শেষ হইয়াছে, পুরাতন সঞ্চয়ে

আর চলিবে না। বঞ্চনা বাড়িয়া উঠিয়া সত্যের পুঁজি ফুরাইয়া দিয়াছে, তাই কাণ্ডারীর ডাক শুনা যায়—

"তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর পানে
দিতে হবে পাড়ি।"

মাতা কাঁদিতেছেন, প্রেয়সী দ্বারে দাঁড়াইয়া নয়ন মুদিয়া আছেন, ঝড়ের গর্জ্জনের মধ্যে বিচ্ছেদের হাহাকার বাজিয়া উঠিয়াছে, মৃত্যু ভেদ করিয়া পথ চিরিয়া চিরিয়া অন্ধকারের বক্ষ দিয়া তরী কোন্ অজানা সমুদ্রতীরের উদ্দেশে চলিয়াছে।

"নূতন উষার স্বর্ণদ্বার
খুলিতে বিলম্ব কত আর ?"

ভীত আর্ত্তরবে প্রশ্ন সকলের হৃদয়ের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ ঝলকে ঝলিয়া যাইতেছে। কোন্ ঘাটে নৌকা ভিড়িবে, কবে পার হইব, এই আশঙ্কায় মন কাঁপিয়া উঠিতেছে, কিন্তু চারিদিক নিস্তব্ধ, প্রশ্ন করিবারও সময় নাই। কিন্তু,—

"মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি ম'রে যায়, আপনার প্রকাশ লজ্জায়,
অহঙ্কার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘর-ছাড়া সবে
অন্তরের কি আশ্বাস-রবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মত ?
বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা ?
স্বর্গ কি হবেনা কেনা ?

বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ ?
রাত্রির তপস্যা কি আনিবে না দিন ?
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?”

এই কবিতাটি বোধ হয় ইয়ুরোপের বিগত মহাসমরের সময়ে লিখিত। কিন্তু রাজ্যে রাজ্যে হিংসার হলাহল সৃষ্টি করিয়া বীরের আত্মবিসর্জ্জনে যে জাতিগত প্রায়শ্চিত্ত বিধান করে তাহার মধ্যে যে প্রলয়ভেরী বাজিয়া উঠে, যে মৃত্যুগহ্বরের মধ্য দিয়া চিরনূতনের আহ্বান ধ্বনিয়া উঠে সেখানেও সে একই কথা, একই বিশ্বাস। এই মৃত্যুর আলিঙ্গনের মধ্য দিয়া, এই মাতার অশ্রুজলের অভিসেচনে, পরমবান্ধবজনের ক্রন্দনের আকুল আর্ত্তনাদে যাহার বরণ হইতেছে তাহা ‘ভীষণং ভীষণানাং’ হইলেও তাহার মধ্যে ‘মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্’কে দেখিলেও তাহার মধ্য দিয়াই আমরা কোনরূপে “আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি” তাহারই সাক্ষাৎ পাইব।

আর একটি কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, কোন অজ্ঞাত সারথির রথ চালনায় আমরা চলাচলের পথে চালিয়াছি। শিশু হইয়া মায়ের কোলে জন্ম হইল, হাসিতে রোদনে যৌবন কাটিল, কিন্তু আবার যখন এই জীবনের বীণাবাদ্য শেষ হইবে, এই জীবনের বীণাখানি যখন এখানেই রাখিব, তখন আবার কোন্ বীণার নূতন রাগিণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিবে ? চলাই আমাদের স্বভাব, তাই কোথাও আমাদের মূল নাই, ঘূর্ণিপাকের হাওয়ার মত আমাদের মন ঘুরিতেছে এবং আমাদের সমস্ত দেহ-যাত্রার মধ্য দিয়া কোন এক নিরাকার তাহাকে নানা আকারে ফুটাইয়া তুলিতেছে ;

“চলতে যাদের হবে চিরকালই
নাইক তাদের ভার।

কোথা তাদের রইবে থলি-থালি
কোথা বা সংসার ?
দেহ যাত্রা মেঘের খেয়া বাওয়া,
মন তাহাদের ঘূর্ণা-পাকের হাওয়া ;
বেঁকে বেঁকে আকার এঁকে এঁকে
চলচে নিরাকার।"

কবি কিন্তু তাঁহার এই চলার খুসীতেই মসগুল। তাঁহার বিশ্বাস যে, যাহাদিগকে আমরা এই জীবন-সন্ধ্যায় ছাড়িয়া চলিয়া যাইব, আমার বিরহে যাহারা কাঁদিয়া আকুল হইবে, তাহারাই যে আমার সব, তাহা নহে। মৃত্যুর মধ্য দিয়া যাহাদের কাছে পৌছিব, তাহারাও আমাদের জন্য প্রেমের আবেগে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

"বঁধুর দিঠি মধুর হয়ে আছে
সেই অজানার দেশে।
প্রাণের ঢেউ সে এমনি করেই নাচে
এমনি ভালবেসে।
সেখানেতে আবার সে কোন্ দূরে
আলোর রাশি বাজবে গো এই সুরে
কোন্ মুখেতে সেই অচেনা ফুল
ফুটবে আবার হেসে।"

এ পর্য্যন্ত মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় কোন জাতীয় পরলোকে বিশ্বাস করেন ; অর্থাৎ এই লোকে জীবনান্ত হইলে আমরা গিয়া এই লোকের মত অন্য কোনও লোকান্তরে এই পৃথিবীরই অনুরূপ দুঃখসুখের খেলা খেলিব। এ পৃথিবীতে না হইয়া কোনও লোকান্তরে যেন আমরা জন্মগ্রহণ করিব, এই বিশ্বাসটি আরও ঘনাইয়া আসে যখন আমরা পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটির ঠিক পূর্ব্বের শ্লোকটি দেখি।

সেই শ্লোকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

"এই জনমের এই রূপের এই খেলা
এবার করি শেষ ;
সন্ধ্যা হল ফুরিয়ে এল বেলা,
বদল করি বেশ।"

কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন যে ইহা

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণানি
অন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"

এই শ্লোকেরই অনুরণন। শা-জাহান কবিতাতেও কবি বলিয়াছেন যে, মহারাজ শা-জাহান এই জীবনের ভোগপাত্র ঠেলিয়া ফেলিয়া তাঁহার জীবনের স্বচ্ছন্দ গতিতে কোন প্রভাতের সিংহদ্বারের উদ্দেশে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মর্ম্মস্থলে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এই কবিতাটার পরের শ্লোক দুইটি পড়িলেও এই সন্দেহ দূর হয়।

"বঁধুর দিঠি মধুর হয়ে আছে" এই শ্লোকটির পরের শ্লোকটিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, এই জীবনে যে বীণাখানিতে সঙ্গীত অভ্যাস করিয়াছিলেন, তিনি জানেন সেই বীণাখানিকে এখানেই ফেলিয়া যাইতে হইবে; কিন্তু সেই বীণায় যে গান তিনি অভ্যাস করিয়াছিলেন, যাইবার সময় তাহাকে হৃদয়ের মধ্যে ভরিয়া লইয়া যাইবেন—

"কিন্তু ওরে হিয়ার মধ্যে ভরে'
নেব যে তা'র গান।"

তাহার পরের শ্লোকেই দেখি,

"সে গান আমি শোনাব যার কাছে
নূতন আলোর তীরে,

চিরদিন সে সাথে সাথে আছে

আমার ভুবন ঘিরে।

শরতে সে শিউলি বনের তলে

ফুলের গন্ধে ঘোম্‌টা টেনে চলে,

ফাল্গুনে তা'র বরণমালা-খানি

পরাল মোর শিরে।"

এই শ্লোকটি পড়িলে স্পষ্ট দেখা যায় যে মৃত্যুর পর যে আলোর তীরে যাইবার কথা হইয়াছে এবং যে আলোর দেশের সাদর সম্ভাষণের জন্য কবি ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন এই প্রকৃতির মধ্যেই চারিদিকে তিনি বিরাজ করিতেছেন। শীতের মধ্য দিয়া প্রকৃতি যেমন তার বেশ পরিবর্ত্তন করে, কিন্তু সেজন্য তাহাকে কোনও লোকান্তরে যাইতে হয় না তেমনি আমরাও মৃত্যুর মধ্য দিয়া আমাদের বেশ পরিবর্ত্তন করি, সেজন্য লোকান্তরের কোনও অপেক্ষা নাই। বৃক্ষের সহিত যখন একটি পাতা সংবদ্ধ থাকে, তখন বৃক্ষের যে জীবনী-শক্তি পাতার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে তাহার যদি কোন চেতনা থাকে, তাহা হইলে পাতাটী যখন ঝরিয়া পড়ে, তখন সে মনে করিতে পারে যে আমি কোন অজানার দিকে ভাসিয়া চলিয়া গেলাম তাহার কোন ঠিক ঠিকানা নাই। কিন্তু তাহার যদি কোনও অতি-চেতনা থাকে, তাহা হইলে সে অনুভব করিবে যে, অজানার উদ্দেশে চলিতে গিয়া এই পত্রদেহ যন্ত্রটি যখন চূর্ণ হইবে, তখনও কোন ভয়ের কারণ নাই। পত্রটি যখন জীবিত ছিল তখন যে জীবনীশক্তি পত্রের জীবনকে প্রাণবান্ করিয়াছিল, পত্রটি ঝরিয়া পড়িবার পরও সেই জীবনীশক্তির মধ্যে তাহার প্রতিষ্ঠা। ভবিষ্যতে সেই জীবনীশক্তি পত্রাকারে ফুটিবে, কি পুষ্পাকারে ফুটিবে, কি কাণ্ডাকারে ফুটিবে তাহার কোন নির্ণয় না থাকিলেও, পত্রটি বাঁচিয়া থাকিবার সময়ে বৃক্ষটির কাছে সে যে দরদ পাইয়াছে, পত্রবিগমের পরেও বৃক্ষের জীবনীশক্তির মধ্যেও সে প্রেমের সেই স্বাগত সম্ভাষণই পাইবে। যে প্রাণময়

পুরুষ বিশ্বের প্রাণস্বরূপে বর্ত্তমান আছেন—যো দেবোঽগ্নৌ যো অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ—তিনিই প্রাণের প্রাণ হইয়া আমাদের মধ্যেই রহিয়াছেন, তাঁহারই প্রাণশক্তি একদিকে যেমন বিশ্বভুবনের বিচিত্রতার মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে, অপর-দিকে তেমনি বিশ্বের সহিত পরমাত্মীয়রূপে সম্বদ্ধ হইয়া যে জীবলোক রহিয়াছে তাহার মধ্য দিয়া নানা কেন্দ্রে স্বতন্ত্র স্বচ্ছন্দ পরিস্ফূর্ত্তিতে বিকাশ পাইতেছে। বৃক্ষের যেমন পত্র একটি অবয়ব, তেমনি আমাদের দেহও এই পরমজীবনবৃক্ষের একটি অবয়ব মাত্র! সেইজন্য সেই দেহের মধ্য দিয়া যে সৃজনীশক্তি আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহার স্বতন্ত্রতা থাকিলেও সে স্বতন্ত্রতার কোনও বস্তুতা নাই। তাহা বিরাট জীবনীশক্তির একটি ঊর্ম্মি মাত্র, সেই ঊর্ম্মিটি তাহার আধারচ্যুত হইয়া পুনরায় কি আধারে আপনাকে প্রকাশ করিবে, কি রূপে, কি বর্ণে আপনাকে চিত্রিত করিবে, তাহা আমরা জানি না। আমরা কেবলমাত্র এই জানি যে, তাহা বিরাট জীবনীশক্তির অঙ্গীভূত প্রাণপদার্থ; কাজেই কোন না কোনও সৃষ্টিরচনার মধ্যে কোন না কোনও নবীন ভঙ্গিতে তার সার্থকতা সুনিশ্চিত। সে সার্থকতা পূর্ব্ব সার্থকতার তুল্য না হইলেও কোনও ক্ষোভ নাই কোনও নিরাশা নাই। আমাদের ইহলোকের জীবনে আমাদের যে সার্থকতা জানি, তাহা জানি বলিয়াই সে সব চেয়ে বড় সার্থকতা, তাহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। ইহলোকেও আমরা দেখি যে, যতটুকু সার্থকতা আমরা জীবনের কোনও একটি অবস্থায় প্রত্যক্ষ করি তাহা হইতে হয়ত অনেক বড় সার্থকতা পরবর্ত্তী অজানা জীবনে রহিয়াছে; সেইজন্য অজানাকে আমাদের ভয় নাই। জানার মধ্যে যে প্রীতি ও সমাদর পাইয়াছি, অজানার মধ্যে যে তাহার হানি হইবে এই ভয়ের কোনও কারণ নাই। জীবনে যেটুকু পাই সেটুকু কেবলমাত্র তার আপন স্বচ্ছন্দ গতিশক্তির কোনও অজানার উদ্দেশে ফুটিয়ে উঠা। জানা হইতে অজানার এই যে নিরন্তর বিকাশ চলিয়াছে, ইহা হইতে আমরা এইটুকু বুঝিতে পারি যে, যে অজানা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বসিয়া আমাদিগকে গড়িয়া তুলিতেছেন তিনি আমাদের পরম প্রেমের পাত্র। তিনি আমাদের জানার জগতে

যে স্নেহের পরশ বুলাইয়াছেন, আমাদের অজানার জগতেও সেই প্রেমালিঙ্গন লইয়া আমাদের অপেক্ষা করিতেছেন।

পূর্ব্বে যে কবিতাটী উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে দেখা যায় যে, বাহিরের জগতে বর্ণে গন্ধে যে সৃজনীশক্তিকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, অন্তর্জগতের মধ্যেও তারই লীলা আমরা অনুভব করি। এই সৃজনীশক্তির মধ্যে যে একটা অনাগত আছে, তাহাই তাহার বর্ত্তমানকে আকৃষ্ট করিয়া বিকশিত করিয়া তুলিতেছে। এই শক্তির কোনও রূপ নাই, সে নিরাকার বস্তুহীন। অথচ তাহার লীলায় নিরন্তর বস্তু-ফেনা ফুটিয়া উঠিতেছে। নিরাকারের চরণভঙ্গীতে আকার আত্মপ্রকাশ লাভ করিতেছে। সেই বস্তুকে ও আকারকে যখনই আমরা সেই বস্তুহীন ও নিরাকার হইতে পৃথক করিয়া দেখি তখনই আসে আমাদের ভ্রম, আসে মোহ, আসে ভয়। আমাদের অন্তরে যে জীবলীলা প্রকাশিত হইতেছে তাহাকে যদি আমরা বস্তুরূপে দেখি, তাহা হইলেই আসে জন্মান্তরের কথা, দেহান্তে তাহার স্থান কোথায়, এই প্রশ্ন। কিন্তু আমাদের অন্তরের জীবলীলাকে যদি বিরাট শক্তিলীলার একটী কৈন্দ্রিক প্রস্ফুরণ বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে সকল রহস্য সহজ হইয়া যায়। জীবনলীলার প্রস্ফূর্ত্তির মধ্যে সবচেয়ে বড় সত্য তার গতি, তার বিকাশ। গতি ও বিকাশ সম্পন্ন হইতে গেলেই চাই বাধা, চাই বাধাভঙ্গ ও প্রাপ্তি, তাই কবি বলিতেছেন—

"জোয়ার-ভাঁটার নিত্য চলাচলে
তার এই আনাগোনা।
আধেক হাসি আধেক চোখের জলে
মোদের চেনাশোনা।
তারে নিয়ে হলোনা ঘর-বাঁধা,
পথে-পথেই নিত্য তারে সাধা,
এমনি করেই আসা-যাওয়ার ডোরে
প্রেমেরি জাল-বোনা।"

জীবনের মধ্যে চলন বৃত্তিটাই সর্ব্বপ্রধান। সেইজন্য কবি বারংবার এই জীবনের চলনধর্ম্মকে যৌবন বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন। সেই যৌবনের ধর্ম্মই যে সে আয়ু চাহে না, সে চাহে মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃত রস। মরণ তার প্রেয়সী, তার ঘোমটাটুকুতেই যা কিছু ভীষণতা। ঘোমটা খুলিলেই দেখা যায় তার মুখের সুন্দর জ্যোতি।

আর একটি কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন যে, অমৃতরস বলিতে সুখ বুঝি না, অমৃত বলিতে বুঝি মৃত্যু হইতে জীবন, জীবন হইতে মৃত্যু, দ্বন্দ্বের সহিত সঙ্ঘর্ষ ও সঙ্ঘর্ষ হইতে পুনরুত্থান এই লীলা আমরা অহরহ প্রাকৃতিক জগতে দেখিতেছি, সমাজে রাষ্ট্রে সর্ব্বত্র দেখিতেছি, ইহাই বিশ্বের লিখন—ইহাই বিশ্বের অমৃতত্ব; কারণ, এইখানেই বিশ্বের প্রতিষ্ঠা।

বিশ্বের এই গতিবেগ যদি থামিয়া যাইত, তবেই আসিত জড়তা—তবেই আসিত মৃত্যু।

"ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার।
চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার,—
সে ত নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা,
এই তোর নব বৎসরের আশীর্ব্বাদ,"

আবার বলিতেছেন—

"পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা।
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।"

আর একটি কবিতাতেও তিনি বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির সঙ্গে যখন একটা

পূর্ণ সামঞ্জস্যের শান্তিতে আমরা বাস করি তখন আমাদের সর্ব্বদাই মনে সঙ্কোচ থাকে। ভয় থাকে, কি অনাচারে সে শান্তি নষ্ট হইবে। কিন্তু যখন মাতৃগর্ভের কোমল আবেষ্টনের মধ্যে পরমাদরে পরম শান্তিতে দ্বন্দ্ব সঙ্ক্ষোভের বাহিরে আপন অখণ্ডসুখে বাস করি, তখন সেই সুখের মধ্য দিয়া সে তাহার মাতার প্রকৃত পরিচয় পায় না। প্রকৃতির সহিত প্রভাতজীবনে আমাদের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে তাতে পাই আলো, তাতে আছে সুখ সম্ভোগ, প্রীতি, তাহাতে দেখি যে চারিদিকের জগৎ যেন তার কল্যাণ হস্ত বুলাইয়া আমাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছে! প্রকৃতির সহিত এই যে আমাদের ঐক্য, এ ঐক্য মূঢ়তার ঐক্য। মাতৃগর্ভে থাকিয়া মাতার জীবনের সহিত শিশুর যে অবিচ্ছিন্ন ঐক্য থাকে, এ সেই ঐক্য। কিন্তু শিশুর মায়ের পরিচয় পাইবার দিন তখনই আসে, যখন সে মাতৃগর্ভ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। এই বিচ্ছেদের আরম্ভ হইতেই যথার্থ পরিচয়ের আরম্ভ।

"গর্ভ ছেড়ে মাটির পরে
যখন পড়ে
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।
তোমার আদর যখন ঢাকে,
জড়িয়ে থাকি তারি নাড়ির পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।
আঘাত হানি
তোমারি আচ্ছাদন হ'তে যেদিন দূরে ফেলাও টানি'
সে বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি',
দেখি বদনখানি।"

ঐ কবিতাতেই আবার বলিয়াছেন,

"মুক্তি, এবার মুক্তি আজি
উঠ্‌ল বাজি'

অনাদরের কঠিন ঘায়ে
অপমানের ঢাকে ঢোলে সকল নগর সকল গাঁয়ে।
ওরে ছুটি, এবার ছুটি এই যে আমার হ'ল ছুটি,
ভাঙল আমার মনের খুঁটি,
খস্‌ল বেড়ি হাতে পায়ে;
এই যে এবার
দেবার নেবার
পথ খোলসা ডাইনে বাঁয়ে।"

কবির এ তাৎপর্য্য নয় যে বাধা বিঘ্ন, বিপত্তি অপমান, দ্বিধা দ্বন্দ্ব যখন চারিদিক হইতে আসিবে, তখন তাহার সহিত বীরের মত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইব, এই তো আমাদের বীরের সদ্গতি। কিন্তু কবি বলিতে চান যে, বাধা দ্বন্দ্ব আছে বলিয়াই আমাদের নিজের সহিত, বিশ্বের সহিত ও আমাদের সেই অন্তর্য্যামী পুরুষের সহিত যথার্থ পরিচয় ঘটিতে পারে। নিছক শান্তির মধ্যে সুখের আবরণের মধ্যে আমাদের যে আত্মপ্রাপ্তি, সেটা যেন ফলের মধ্যে বীজের আত্মপ্রাপ্তির মতন। সে প্রাপ্তি মৃতার প্রাপ্তি! বীজটি যখন বৃক্ষ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, ফলের খোলস হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অনাদরে মাটির মধ্যে সমাধি লাভ করে, তখন চারিদিকের বাধারাশির মধ্যে পড়িয়া তাহার সৃজনীশক্তি আত্মপ্রকাশের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। বাহিরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে তাহার অন্তরস্থ তপস্যা তাপময় হয়। সে অঙ্কুরাকারে মাথা তুলিয়া সমস্ত চাপ ভেদ করিয়া, সমস্ত অবহেলা তুচ্ছতাকে দুই হাতে সরাইয়া দিয়া মাটির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া প্রভাতের রবি-কিরণে স্নাত হইয়া বলে, "এই দেখ আমি আছি।" ইহার পূর্ব্বে যে তাহার থাকা তাহা না থাকারই মতন, তাই উপনিষদ বলিয়াছেন,—

'অসবেদমগ্রে আসীৎ' শুধু 'আছি'তেই শেষ নয়। আবার বাহিরের জগতের সহিত তার প্রাত্যহিক দ্বন্দ্ব আর সেই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া তার আত্মপ্রকাশ, তার বিশ্বজয়ী অমলতা, তার পরিস্ফূর্ত্তি, তার বিকাশ; সে বলে আমি যে শুধু আছি

তাহা নহে, এই দেখ আমার শাখা প্রশাখা, এই দেখ আমার কত বিচিত্র পত্রবন্ধন, এই দেখ আমার কুসুমিত যৌবন। আবার যখন শীতের দিনে পাতা ঝরিয়া যায়, ফুল ঝরিয়া যায়, লোকে বাহির হইতে দেখিয়া বলে গাছটা বুঝি মরিয়া গেল। কিন্তু তার মৃত্যু নাই, তার মৃত্যু হইতেছে তপস্যা। সেই তপস্যা দ্বারা সে আপনাকে নূতন মূর্ত্তিতে, নূতন সুষমায় ও নূতন প্লাবনে পুষ্পসম্ভারে পরিপূর্ণ করিয়া লোক-নয়নের সম্মুখে আপন বিজয়কেতন উড়াইয়া দেয়। সৃজনীশক্তির লীলাই এই যে, সে আপনার মধ্য হইতে বিরোধ উৎপন্ন করে এবং সেই স্ববিরোধের মধ্য দিয়া পুনরায় আপনাকে ফিরিয়া পায়। বিরোধ তার বহিরঙ্গ নহে। তাহাকে আঘাত করিলেও তাহা তাহার প্রতিকূল নহে, তাহার সহিত অসম্পর্কিত মনে হইলেও অনাত্মীয় নহে। জীবন ভরিয়া মৃত্যুর নানা রূপের সহিত আমরা লড়াই করিয়া চলি। দেহান্তে যে মৃত্যুকে আমরা দেখিতে পাই সেও সেই জাতীয়ই একটা মৃত্যু। তাহার মাত্র এই বিশেষত্ব যে তাহাকে অতিক্রম করিয়া আমাদের অন্তরস্থ সৃজনী-শক্তি যে বিশেষ আকারে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। তবে তাহার এইটুকু মাত্র জানিতে পাই যে, এই জীবন ধরিয়া আমরা নানা দুঃখেসুখে, নানাপ্রকার চেতনার উদ্বোধে-প্রবোধে যে খেলা খেলিয়া গেলাম, সে খেলা একটা বিশ্বখেলারই অঙ্গ এবং বিশ্বের মধ্যে নিরন্তর যে প্রাণলীলা পরিস্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে, তাহাই তাহার আশ্রয় ও তাহাতেই তাহার প্রকাশ।

বিশ্বের মধ্যে সৃজনীশক্তির যে লীলা দেখি আর মানুষের মধ্যে তাহার যে লীলা দেখি, এই দুইয়ের মধ্যে যে গভীর ঐক্য আছে, তাহা দেখান হইয়াছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্যেরও একটা দিক আছে। প্রকৃতির মধ্যে সৃজনীশক্তির যে প্রকাশ তাহা একটি বিশেষ আকারের মধ্যে আবদ্ধ। তাহার স্বাধীনতা একটা অলঙ্ঘ্য নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেখানে স্বতন্ত্র পরিস্ফূর্ত্তির কোনও অবসর নাই। প্রকৃতির মধ্যে যে স্বাধীনতা তাহা Mechanistic নয় Instinctive, তাহার ধারা পদ্ধতি যেন একটা অবোধ জড় নিয়ন্ত্রণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; তাই সেখানে

যথার্থ সৃষ্টি নাই। একই জিনিষের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনই তাহার সৃষ্টি। সেখানে দেখি Conservation of mass এবং Conservation of energyর খেলা। পশুপক্ষীর মধ্যে যে জৈব প্রবৃত্তি দেখি, তাহা একটি জৈব নিয়ম দ্বারা একটি নির্দ্দিষ্ট অলঙ্ঘ্য প্রকাশ পদ্ধতির মধ্যে সংযন্ত্রিত। কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই আমরা দেখি এমন একটি সৃষ্টি, যাহা যথার্থ-ই সৃষ্টি। মানুষ তাহার জীবন-পাত্রে যেটুকু পাইয়াছে, সেইটুকুকেই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পুনরাবর্ত্তন করে না, সে তাহা হইতে অজানা অজ্ঞাত নূতনকে নিরন্তর বাহির করিয়া আনে। বাহির হইতে সে যাহা পায়, অন্তরের মধ্যে আনিয়া তাহাকে নূতন রূপ দেয়। Conservation of mass, Conservation of energy এবং Instinctএর বিধিনির্দ্দিষ্ট ধারা মানুষের পক্ষে খাটে না, মানুষ তার সৃজনীশক্তি দ্বারা অনাগতকে ও অপ্রত্যাগতকে নিরন্তর উৎপন্ন করিতেছে। এই যে একান্ত নূতনের নিরন্তর আবির্ভাব মানুষের মধ্যে চলিতেছে, বাহির হইতে যে দান আসে মানুষের মধ্যে আসিয়া তাহা যে নিরন্তর তাহার রূপ বদলাইতেছে, ইহাকেই বলা হয় সৃষ্টি। বিধাতা যেন মানুষের মধ্যেই জন্ম লইয়া আপন সমস্ত সৃষ্টি কৌশল মানুষের আচরণের মধ্যে থাকিয়া নিরন্তর ব্যক্ত করিয়া তুলিতেছেন,—

"পাখীরে দিয়েচ গান, গায় সেই গান
তা'র বেশি করে না সে দান।
আমারে দিয়েচ স্বর, আমি তা'র বেশি করি দান,
আমি গাই গান।
বাতাসেরে করেচ স্বাধীন,
সহজে সে ভৃত্য তব বন্ধন-বিহীন।
আমারে দিয়েচ যত বোঝা,
তাই নিয়ে চলি পথে কভু বাঁকা কভু সোজা;

পূর্ণিমারে দিলে হাসি;
সুখস্বপ্ন-রসরাশি
ঢালে তাই, ধরণীর করপুট সুধায় উচ্ছ্বাসি'।
দুঃখখানি দিলে মোর তপ্ত ভালে থুয়ে,
অশ্রুজলে তারে ধুয়ে ধুয়ে
আনন্দ করিয়া তারে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে
দিন-শেষে মিলনের রাতে।"

মানুষের মধ্যে সৃষ্টির যে এই স্বাধীন স্বতন্ত্রতা আছে, সেইটিই তার স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা কোন প্রাকৃতিক নিয়ম-নিগড়ের দ্বারা সংযন্ত্রিত নহে। সে চলে তার আপন ছন্দে। তাই তার পদে পদে তাল কাটে, ভুল ও প্রমাদের বাধা তার গতিচ্ছন্দকে আঘাত করে। কিন্তু তার গতি আছে, তাই সে বাধাকে ভয় করে না। বেতালে ঠেকিয়া সে আপন তালকে আপনি সৃষ্টি করে। মানুষের মধ্যে দেবতা আপনার স্বরূপকে জন্ম দিয়াছেন। মানুষের পরিস্ফূর্ত্তির মধ্য দিয়া দেবতা আপন পরিস্ফূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ করেন। সেইজন্য মানুষের মধ্যে এই বোধ সর্ব্বদা জাগ্রত রহিয়াছে যে, অনবরত বিকাশের মধ্য দিয়া তাহাকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। মাটীর ধরণীর আলো আঁধারের স্ফুট অস্ফুট জগতের মধ্যে তিনি শূন্য হাতে মানুষকে এই ছাড়িয়া দিয়াছেন যে, সে তাহার আপন সৃষ্টির লীলায় এই নূতন সৃষ্টির সামঞ্জস্য পাপ ও সঙ্কটের মধ্যে হৃতস্বর্গের একটি পুনরুদ্ধার সম্পন্ন করিয়া তুলিবে। যে অজানার আহ্বান মানুষকে তার ক্রম-পরিস্ফূর্ত্তির দিকে ক্রমশঃ টানিয়া লইয়া যাইতেছে, আরও, আরও আগে চল, আগে চল এই বাণী যে নিরন্তর মানুষের হৃদ্‌গহ্বর হইতে উত্থিত হইতেছে, ইহাই আমাদের মধ্যে, সেই পরম অজানার আত্ম-পরিস্ফুরণের আকাঙ্ক্ষা; আমাদের মধ্যেই তার আত্মপ্রকাশ। এই আহ্বানে সাড়া দিয়া আমাদের আত্মপরিস্ফূর্ত্তিতে আমরা যাহা সৃষ্টি করিতে পারি, তাহাতেই তাহার পরম পরিতৃপ্তি।

"তুমি তো গড়েচ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার
শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে
দিয়েচ আমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার
আর সকলেরে তুমি দাও।
শুধু মোর কাছে তুমি চাও!
আমি যাহা দিতে পারি আপনার প্রেমে,
সিংহাসন হ'তে নেমে
হাসিমুখে বক্ষে তুলে নাও।
মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তা'র বেশি ফিরে তুমি পাও!"

উপনিষদে দেখি, তদৈক্ষত বহুস্যাম্, সদেবেদমগ্রে আসীৎ অসদেবেদমগ্রে আসীৎ, স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা সর্ব্বমিদমসৃজৎ। তিনি যখন তাঁহার পরম ঐক্যের মধ্যে অবিচলিত সৃষ্টিশক্তির শূন্য-পূর্ণতায় পরিপূর্ণ ছিলেন, তখন তার রূপ ছিল তাঁর অজ্ঞাত, তাই তিনি আপন স্বরূপকে উপলব্ধি করিবার জন্য, আপনাকে দেখিবার জন্য যে তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই তপস্যার ফলেই এই জগতের সৃষ্টি। তাঁহার আপন শূন্য-পূর্ণতার মধ্যে যখন তাঁহাকে দেখি, তাঁহার সেই একক স্বভাবের মধ্যে যাহা পাই, তাহাকে সৎও বলা যায়, অসৎও বলা যায়। যে সত্তা নিরন্তর ক্রিয়া-ব্যাপারের দ্বারা আপনাকে প্রকাশ না করে, তা শূন্যতার অস্তিত্ব। আপন একত্বের পরিপূর্ণতার মধ্যেই তাহা সম্পূর্ণ রিক্ত, সেইজন্যই তিনি আপন ঈক্ষাব্যাপারের দ্বারা আপনাকে যথার্থরূপে সৎ করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলেন। কিন্তু সমস্ত জগতের মধ্যে তিনি আপনাকে যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা একটা মূঢ় প্রকাশ মাত্র।

তাহাতে বোধ নাই, চেতনা নাই, জাগরণ নাই সে একটা নিরন্তর স্বপ্নবিহার মাত্র। একমাত্র মানুষের মধ্যে আসিয়াই তাহার স্বরূপটি সচেতন হইয়াছে। তাহার স্বচ্ছরূপের ন্যায় মানুষও বলে যে আমার ঈক্ষাক্রিয়া দ্বারা আমি নূতন জগৎ সৃষ্টি করিব।

"কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী।
এ আনন্দচ্ছবি
যুগে যুগে ঢাকা ছিল অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে।"

কিন্তু লক্ষ লক্ষ বর্ষের তপস্যায় যে প্রকৃতি পত্রপুষ্পফলে সুষমাময় হইয়া উঠিয়াছে, সে নিদ্রিত।

"যে দিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা।
* * *
আমি এলেম, ভাঙ্‌ল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুট্‌লো আলোর আনন্দ-কুসুম।
* * *
আমি এলেম, কাঁপ্‌লো তোমার বুক,
আমি এলেম, এল তোমার দুখ,
আমি এলেম, এল তোমার আগুনভরা আনন্দ,
জীবন মরণ তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
* * *
আমার চোখে লজ্জা আছে, আমার বুকে ভয়,
আমার মুখে ঘোম্‌টা পড়ে' রয়—

আমায় দেখ্‌বে বলে' তোমার অসীম কৌতূহল
নইলে তো এই সূর্য্যতারা সকলি নিষ্ফল ॥"

অনেকদিন পূর্ব্বের আর একটি গানে কবি লিখিয়াছেন,

"আমার মিলন লাগি তুমি আসচ কবে থেকে,
তোমার চন্দ্র সূর্য্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে !"

সমস্ত প্রকৃতির মধ্য দিয়া যে সৃষ্টিস্রোত চলিয়াছে তাহার পরম পর্য্যবসান হইল মানুষে। মানুষের মধ্যে যে প্রকাশ ফুটিয়া উঠিয়াছে, সমস্ত সৃষ্টিলীলা যেন সেই জন্যই উন্মুখ হইয়াছিল ! সমস্ত প্রকারের মূক সৃষ্টি, সমস্ত প্রকৃতির নিয়মনির্দ্দিষ্ট গতি-ব্যাপার মানুষের মধ্যে আসিয়া অসীম স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়াছে, জড়-শক্তি, জৈব-শক্তি, বোধিজাগরণের, আত্মানুভবের চৈতন্যময় শক্তিতে পরম সম্পূর্ণতা ও সফলতা লাভ করিয়াছে। মানুষের মধ্যে এই বিকাশ সম্ভব হইয়াছে বলিয়াই সমস্ত সৃষ্টি-ব্যাপার অর্থপূর্ণ হইয়াছে। বিশ্বের সমস্ত শক্তি যেন নানা ঘূর্ণীর মধ্য দিয়া আসিয়া মানুষের মধ্যে হঠাৎ সচেতন হইয়া আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। সেই পরম অজানা যেন জাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, এই যে আমি, এই যে আমার বিশ্ব; বিশ্বের মধ্যে যে লীলা, সে তো এই আমারই লীলা। এই যে আমার লীলা, সে তো বিশ্বেরই লীলা। মানুষের মধ্যে আসিয়াই অজানা জানা হইল, কারণ, তাহার জীবন মরণে সে সেই অজানারই রাজত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। তাই সে বলে—

"বাসার আশা গিয়েচে মোর ঘুরে,
ঝাঁপ দিয়েচি আকাশরাশিতে;
পাগল, তোমার সৃষ্টিছাড়া সুরে
তান দিয়ো মোর ব্যথার বাঁশিতে।"

দাড়িম্বে, পলাশগুচ্ছে, কাঞ্চনে, পারুলে বসন্তের যে কোলাহল ছিল একান্ত প্রাকৃতিক ব্যাপার, তাঁহা মানুষের জীবনের মধ্যে আসিয়া তাহার সহিত যেন

একাত্ম-সম্পর্কে সম্পর্কিত হইয়া উঠিল। মানুষের মধ্য দিয়া যে প্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা একদিকে যেমন বাহিরের, অপর দিকে তেমনি মানুষের একান্ত আপনার। মাধবী ফুলের মধ্যে যে জড় আনন্দ প্রকাশলাভ করিয়াছে, মানুষের সৌন্দর্য্যোপলব্ধির আনন্দের মধ্যে আমরা তাহারই পরিচয় যেন নূতন করিয়া পাই। মানুষের মধ্য দিয়া যে প্রকৃতিকে নূতন করিয়া সঞ্জীবিত ও সচেতন করিয়া লওয়া যাইতে পারে তাহাই প্রকৃতির আত্মবোধ। এই আত্মবোধিতে একদিকে যেমন প্রকৃতি তাহার আপন পরিচয় পায়, অপরদিকে তেমনি মানুষের আপন স্বতন্ত্রতা ও আপন তৃপ্তির যথার্থ সাক্ষাৎকার হয়।

"নিত্য তোমার পায়ের কাছে
তোমার বিশ্ব তোমার আছে
    কোনখানে অভাব কিছু নাই।
পূর্ণ তুমি, তাই
তোমার ধনে মানে তোমার আনন্দ না ঠেকে।
    তাই ত একে একে
যা কিছু ধন তোমার আছে আমার ক'রে লবে
    এম্‌নি করেই হবে
        ঐ ঐশ্বর্য্য তব
তোমার আপন কাছে, প্রভু, নিত্য নব নব।
    এমনি করেই দিনে দিনে
    আমার চোখে লও যে কিনে
        তোমার সূর্য্যোদয়।
    এম্‌নি করেই দিনে দিনে
আপন প্রেমের পরশমণি আপনি লও চিনে
    আমার পরাণ করি হিরণ্ময়।

রবীন্দ্রনাথ 'আমার ধর্ম্ম' এই প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, মানুষের ভিতরে যে সত্যরূপ সেইটিই তার ধর্ম্ম। মানুষের ভিতরে তার আত্মস্বরূপে যে সৃজন-শক্তি আপনাকে প্রকাশ করিয়া তুলিতেছে, তাহা ক্রমশঃ আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতেছে। সেইজন্য তাহার ধর্ম্মও এই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার আপন স্বভাবকে প্রকাশ করিয়া তুলিতেছে। মানুষ একটি বস্তুভূত জড়পদার্থ নয়। সেইজন্য কোন স্থিতিশীল গুণের দ্বারা তাহার পরিচয় প্রকাশ করা যায় না। সে প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাঁহার জীবনের প্রভাতকাল হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার মধ্যে যে সৃষ্টি প্রক্রিয়া চলিয়াছিল তাহা বিশেষ বিশেষরূপে তাঁহার বিভিন্নকালের কাব্যরচনার মধ্য দিয়া প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তাঁহার জীবন শেষ হয় নাই। তাই তাঁহার ধর্ম্মও শেষ হয় নাই। তাঁহার মতে ধর্ম্ম কোন একটা মত বা কোন একটা বিশ্বাস নয়, ধর্ম্ম হইল গতিশীল অন্তঃস্বরূপের আপন সৃষ্টি প্রক্রিয়ার স্বভাব। তাহাকে সেই অন্তরের ক্রিয়াস্বরূপ হইতে পৃথক করিয়া ধরা যায় না। রবীন্দ্রনাথের এই ধর্ম্মের ও তাঁহার অন্তররূপের যে নানা ছবি 'বলাকা'র কবিতাগুলির মধ্য দিয়া প্রতিবিম্বিত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা পরম্পরাক্রমে সাজাইয়া তাহার মূর্ত্তি পরিকল্পনা করিবার একটা চেষ্টা এতক্ষণ করিয়াছি, তাহার মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে, এক অখণ্ডসত্যস্বরূপ তাহার বস্তুহীন নিরাকার অমূর্ত্ত সৃজনীশক্তি দ্বারা আপনাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সেই চেষ্টার ফলে একদিকে হইয়াছে জড়জগৎ, সাধারণ জীবজগৎ ও অপরদিকে হইয়াছে, মানুষ! সমস্ত জীবনীশক্তির লীলা মানুষের মধ্যে আসিয়া প্রবুদ্ধ হইয়াছে। বিশ্বসংসার মানুষের চেতনলোকের মধ্যে আসিয়া অর্থপূর্ণ হইয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছে। মানুষ যাহা অন্তরের সৃজনীশক্তির মধ্যে অনবরতই অনুভব করে যে, সে যাহা পাইয়াছে, পাইতেছে, তাহার বাহিরে কোন এক অজানা হইতে যেন কি আহ্বান আসিতেছে এবং সেই আহ্বানের প্রেরণায় সে আপনাকে নিরন্তর গতিভঙ্গীর মধ্য দিয়া অগ্রসর করাইয়া চলিতেছে। বাধা না হইলে গতি হয় না, সেইজন্য গতির মুখেই আসে বাধা এবং এই বাধাকে

জয় করাতে গতির সার্থকতা। জরামৃত্যু, পাপদুঃখ, জড়তা সমস্তই এই বাধার বিভিন্ন স্বরূপ মাত্র। বাধার সহিত দ্বন্দ্বের প্রতি ভঙ্গীতেই আমাদের আত্মার চলৎস্বরূপ নির্ম্মিত হইতেছে। বাধাজয়ের আনন্দই চলার আনন্দ, এবং এই চলার আনন্দেই মানুষের চরম সার্থকতা। অজানার মূর্ত্তি মানুষের জানা নাই, কিন্তু আমাদের প্রত্যেক বিকাশের মধ্য দিয়াই যে নূতন নূতন গতি পরিণাম আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে, ইহার মধ্যে অজানার রূপ প্রতিবিম্বিত হইতেছে, কাজেই অজানা আমাদের একান্ত অজানা নহে।

রবীন্দ্রনাথ কোন দার্শনিকতত্ত্বের বিচার করিতে বসেন নাই, কিন্তু তথাপি এই অনুভবের মধ্যে তাঁহার কাব্য রক্তমাংসে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। এই অনুভবটির সহিত Bradley, Bosanquet, Pringle-Pattison, Bergson প্রভৃতির মতবাদের যে একটি গভীর সামঞ্জস্য ও ঐক্য আছে তাহা যাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থকারদের গ্রন্থ পড়িয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসেই উপলব্ধি করিবেন। Idealistic বা বিজ্ঞানবাদের মতের মূল লক্ষণ এই যে Reality is spiritual অর্থাৎ তত্ত্বমাত্রই আত্মিক। এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে idealist বা বিজ্ঞানবাদী বলা চলে। কিন্তু যে সকল idealistরা জগৎকে কেবলমাত্র মায়াপ্রপঞ্চ বলেন, রবীন্দ্রনাথ সে দলের লোক নহেন। মানুষের সহিত জগতের যে একটা Organic relation বা অঙ্গাঙ্গিভাব-সম্বন্ধ রহিয়াছে, সে কথা রবীন্দ্রনাথ কোথাও স্পষ্টতঃ বলেন নাই; তাঁহার অধিকাংশ কবিতার মূলে সেই দ্যোতনা তাঁহার অনুভবের জ্যোতিঃরেখার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। আধুনিক ইয়ুরোপীয় দার্শনিকদের মধ্যে এই Organic relation বা অঙ্গাঙ্গিভাব সম্বন্ধটি যেভাবে অনুভূত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের অনুভবটি তাহা হইতে একটু স্বতন্ত্র। আধুনিক ইয়ুরোপীয় দার্শনিকদের Organic relationএর কথায় যাহা দেখিতে পাই, তাহার তাৎপর্য্য এই যে মানুষ প্রাকৃতিক জগৎ হইতে ক্রমবিকাশ ধারায় উৎপন্ন হইয়াছে। গাছের যেমন চরম পরিণতি তাহার ফুলে ও ফলে, মানুষও তেমনি সমস্ত প্রকৃতিবৃক্ষের একটি পুষ্পস্বরূপে তাহারই দেহসম্বন্ধ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য প্রকৃতির

সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষকে দেখিতে পারি না এবং মানুষের সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রকৃতিকে দেখিতে পারি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে organic relationটির পরিচয় পাই তাহা এইরূপ যুক্তিপরম্পরার মধ্য দিয়া আসে নাই। একটি রসানুভবের দ্বারা প্রকৃতির সহিত একটা গভীর প্রীতিবন্ধনে রসোজ্জ্বল ভোগোজ্জ্বল একটি অনুভূতি লইয়া কবি যাত্রা সুরু করেন। পরে যখন প্রকৃতির ও মানুষের সহিত তাহার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল, যখন গর্ভবাসের স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া ধরার ধূলার সহিত জীবনমরণের যুদ্ধ বাধিল, তখনই তিনি আবিষ্কার করিলেন যে, দ্বন্দ্ব শুধু মানুষে মানুষে বা মানুষে প্রকৃতিতে নয়, এ দ্বন্দ্ব প্রকৃতির মধ্যেও বিরাজ করিতেছে। এই দ্বন্দ্বই জীবনের রহস্য ও জীবনের লীলা। মানুষের সহিত প্রকৃতির এই গভীর সাম্য দেখিয়া প্রকৃতির সহিত তাঁহার যে অজ্ঞাত প্রেমবন্ধন ছিল তাহা নবচেতনার জাগরণে নূতন বল লাভ করিল এবং সেই সঙ্গেই এই অনুভব আসিল যে, প্রকৃতি ও মানুষ লইয়া একই সৃজনীশক্তির লীলা চলিয়াছে। উভয়ের মধ্যে সখ্যের নিগূঢ় রহস্যটি যখন প্রকাশ হইল তখনই এই অনুভব আসিল যে প্রকৃতির লীলা মানুষের লীলার অনুরূপ। প্রকৃতির লীলাটি ঘুমন্ত, মানুষের লীলাটি সচেতন। সেই সঙ্গেই এ অনুভবও আসিল যে, প্রকৃতি ও মানুষের এই যে সখিত্ব এই যে প্রেমবন্ধন ইহার তাৎপর্য্য এইখানেই যে, প্রকৃতিকে লইয়াই মানুষের অনুভূতির আরম্ভ, গতি ও পর্য্যবসান এবং মানুষের মধ্যে আসিয়াই প্রকৃতির সার্থকতা, মানুষের চেতনার মধ্যে আসিয়া প্রকৃতি তাহার নিজের রাজ্যকে জাগ্রত করিয়া পাইয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মধ্যে এই বৈষম্যটিও লক্ষিত হইল যে, প্রকৃতির মধ্যে যে সৃজনীশক্তি কাজ করিতেছে তাহা একটা সীমাপদ্ধতির মধ্যে একটা প্রাপ্তস্বরূপকে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত করিতেছে। তাহার নূতনতার মধ্যে যথার্থ নূতনতা নাই। পুরাতনকে বরাবর ফিরিয়া ফিরিয়া পাওয়াতেই তাহার নূতনতা। কিন্তু মানুষের মধ্যে যে সৃজনীশক্তিটি কাজ করিতেছে তাহা অপ্রাপ্তকে, অনাগতকে, অপ্রত্যাশিতকে নিরন্তর উৎপন্ন করিতেছে এবং সেইজন্যই সেই সৃষ্টি যথার্থ সৃষ্টি। প্রকৃতির মধ্য হইতেও মানুষ যাহা পায় তাহাকে আপন

সৃজনীশক্তির বলে নূতন করিয়া লয়। এই যে আপনার মধ্য হইতে আপন ভাণ্ডারে যাহা নাই তাহাকে মানুষ উৎপন্ন করে, এই জন্যই মানুষ ভগবানের প্রতিরূপ। প্রকৃতি ভগবানের নিকট হইতে যাহা পাইয়াছে তাহাই দান করে, কিন্তু ভগবান মানুষের মধ্যে জন্ম নিয়াছেন বলিয়া যাহা পায় নাই তাহা সৃষ্টি করে। সৃজনীশক্তির ইহাই চরম সার্থকতা। সেইজন্যই মানুষে আসিয়া সৃষ্টির শেষ। এই আলোচনা হইতে দেখা যায় যে ইয়ুরোপীয় দার্শনিকেরা যুক্তিবিচারের ক্রমধারায় যে তথ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, প্রেম ও অনুভূতির অন্তর্নিহিত অন্বীক্ষাদ্বারা রবীন্দ্রনাথও প্রায় সেই একজাতীয় তথ্যেই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই মতে এইখানেই আমাদের সংশয় আসে যে, যদি জীবনীশক্তির চরম লক্ষ্যই হয় গতি, জানা হইতে অজানায় ক্রমাবরোহণ, তবে তাহার মধ্যে ভালমন্দ উচ্চনীচ প্রভৃতি শ্রেয়োবোধের অবকাশ কোথায়? তিনি বলাকার অনেক স্থলে এই কথা বলিয়াছেন যে, আমাদের চলার আনন্দেই আমাদের চরম আনন্দ। আজ যেটা গন্তব্য, কাল সেটা গত; আজ যে স্থান আমাদের লক্ষ্য, কাল সেখানে দাঁড়াইয়া আমরা বলি এখানে নাই আরও আগে।

"অসংখ্য পাখীর সাথে
দিনেরাতে
এই বাসা-ছাড়া পাখী ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্ পার হ'তে কোন্ পারে!
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।"

এই যে "অন্য কোথা অন্য কোথা অন্য কোনখানে" এই যে অজানার রূপ, তাহার মধ্যে শ্রেয়োমূর্ত্তির কোন রূপ দেখিতে পাই না। সৃজনীশক্তির তাপ দিয়াই মানুষ গঠিত। যাহা অনাগত তাহাই তাহার অপ্রাপ্ত তাহাই তাহার অন্য কোনখান। সেই অন্য কোনখানে এবং অন্য কোনখান হইতে আরও অন্য

কোনখানে মানুষ নিরন্তরই চলিতেছে। কেবলমাত্র অনাগতের অন্ত কোনখানকে মানুষের আদর্শ বলিয়া মানা যায় না। সুন্দর, কুৎসিত, ভালমন্দ সমস্তই মানুষের সৃজনীশক্তির মধ্যে অন্য কোনখান রূপে তাহাকে আহ্বান করিতেছে। যে লোভী তাহারও লোভের শেষ নাই, যে গৃধ্নু তাহার তৃষ্ণার কোন শেষ নাই। ইহাদের সকলের মধ্য দিয়াই একটা অজানার আকাঙ্ক্ষা ও আহ্বান প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আবার যে ত্যাগী, যোগী, ভক্ত, জ্ঞানী তাহারও মধ্যে আরও আরও আগে চল, "আগে কহ আর," ইহার সন্ধান চলিয়াছে। পথ চলার আনন্দই যদি চরম আনন্দ হয়, তবে এই উভয়দিকের পথিকের মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষের কোনও বিচার করা চলে না। রবীন্দ্রনাথের এই বড় জীবনব্যাপী অনুভবের মধ্যে, এই চলনশীল ধর্ম্মের মধ্যে তিনি তাঁহার কাব্যে কিভাবে শ্রেয়োবোধের মর্য্যাদা পরিস্ফুট করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের প্রাচীনেরা বলিতেন, দুঃখবিমুক্তি আমাদের চরম সার্থকতা, আর সেই দুঃখবিমুক্তি আসে তৃষ্ণাক্ষয়ে ও কর্ম্মক্ষয়ে। রবীন্দ্রনাথ বলেন দুঃখবিমুক্তিই চরম সার্থকতা, কিন্তু সে বিমুক্তি কোন এক সুনির্দ্দিষ্টকালে নিষ্পাদ্য নহে। দুঃখ ও দুঃখ জয় উভয়ই আমার স্বভাব। এই উভয়ের মধ্যের সেতু আমাদের চরম ধর্ম্ম, কিন্তু দুঃখ ও দুঃখবিমুক্তি বা চরম ধর্ম্ম ইহার কোনটিই মানুষের পক্ষে চরম কথা নহে। মানুষের মধ্যে চরম কথা এই যে, তাহার শ্রেয়োবোধ তাহার প্রেয়োবোধের উপরে উঠিয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ শ্রেয়োবোধের দাবী মানেন না, এমন অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য কেহ বলিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের এই আশঙ্কা হয় যে, তিনি কেবল কালগতিতে যাহা ক্রমবিসারী, সেই সরলরেখার প্রান্তভাগে যেন তাঁহার শ্রেয়োবুদ্ধিকে সন্নিবেশিত করিয়া দেখিয়াছেন এবং সেই জন্যই শ্রেয়োবুদ্ধির স্বতন্ত্র মর্য্যাদা দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। দার্শনিকের দিক হইতে তাঁহার মতের বিরুদ্ধে অনেক গুরুতর অভিযোগ আনিতে পারিতাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক বিচার করেন নাই, তত্ত্ববিচারের প্রণালীও অবলম্বন করেন নাই, সেইজন্য যুক্তি তর্কের অবতারণা করা নিষ্ফল। কিন্তু তাঁহার কাব্যানুভূতির মধ্যে শ্রেয়োবুদ্ধির

যথার্থ মর্য্যাদা দেওয়া হয় নাই, এ অভিযোগটি আমরা কেবলমাত্র অনুভূতির দিক দিয়াও আনিতে পারি।

তাঁহার জীবনে শ্রেয় ও প্রেয়ের এমন একটা আশ্চর্য্য মিলন আছে, প্রকৃতির রসানুভবের মধ্যে আপনাকে অনুভব করার মধ্যে শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্বের দিকটি এমন একটি কৌশলে দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া যায় যে, কবি বোধ হয় এই বিষয়ে সচেতন হইবার অবসর পান নাই। কবি যখন বলেন,

আজ প্রভাতের আকাশটি এই
শিশির-ছলছল
নদীর ধারের ঝাউগুলি ঐ
রৌদ্রে ঝলমল,
এমনি নিবিড় ক'রে
এরা দাঁড়ায় হৃদয় ভ'রে
তাই তো আমি জানি
বিপুল বিশ্বভুবনখানি
অকূল মানস-সাগর জলে
কমল টলমল।

প্রকৃতির প্রীতিবন্ধনের মধ্যে দিয়া যখন বিশ্বের রস জীবনপাত্রে উছলিয়া উঠে তখন শ্রেয় ও প্রেয়ের ভেদ থাকে না, শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্বের কথা আমাদের লক্ষ্যের বাহিরে চলিয়া যায়। কিন্তু অজানার দিকে বিশ্বের চলনস্বভাবটা যেমন একটা গভীর সত্য, মানুষের মনের মধ্যে শ্রেয়োবোধের প্রকাশও তেমনি মনুষ্যজীবনের একই পরম মহিমাময় সত্য। মানুষ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছে তাহার মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিষই হইতেছে তাহার এই শ্রেয়োবোধ; যে কোন ব্যাপক অনুভূতির মধ্যে মনুষ্যজীবনের এই পরম নূতন সৃষ্টির অনুভব আমরা দেখিতে প্রত্যাশা করি। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন যে, তাঁহার চলন শেষ হয় নাই, কাজেই তাঁহার ধর্ম্মও তাহার পূর্ণতায় আসে নাই। সেইজন্য আমরা আশা করি

যে, প্রকৃতি ও মনুষ্যজীবনের অনেকগুলি সার সত্য যেমন তাঁহার অনুভূতির মধ্যেই ধরা পড়িয়া রসোজ্জ্বল হইয়া জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে, মনুষ্যজীবনের এই পরমসত্যটিও তেমনি তাঁহার আগামীস্তরের অনুভূতিতে হয়তো রসোজ্জ্বল হইয়া দেদীপ্যমান্ হইবে। মানুষের প্রাপ্তি শুধু জীবনীশক্তির ক্রিয়াব্যাপারে নয়, শুধু কল্পলোকের লোকোত্তর বিহারে নয়, শুধু অজানার সন্ধানে দুঃখঝঞ্ঝার উপর বিজয় কেতন উড্ডীন করাতে নয়, তাহার শ্রেয়োবোধকে তাহার জীবনবোধের মধ্যে সার্থক করিয়া তোলাতেই তাহার যথার্থ লোকোত্তরত্ব। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ যদিও আমাদিগকে তাঁহার অজস্রদানে গৌরবময় করিয়া তুলিয়াছেন, তথাপি তাহাতে যেন কিছু বাকী রহিয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহার ধর্ম্মকে উদ্দেশ্য করিয়া বলি,—

"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা অন্য কোনখানে"।

কড়ি ও কোমল ও মানসীর যুগে কবির কাব্যজীবনের যে প্রাথমিক বিকাশ দেখা যায় তাহাতে কবি কেবলমাত্র ভোগের সম্পর্কে আসিয়া ভোগের মধ্যে তলাইয়া যাইতে যাইতে যেন অনুভব করিলেন যে, শুধু ভোগের মধ্যে তলাইয়া যাওয়ায় নিজেকে পূর্ণ করা যায় না, ভোগের তলা হইতে কোনও এক অতল, কোনও এক ভোগাতীত যেন সঙ্কেত করে 'এহ বাহ্য আগে কহ আর'। আমার পূর্ব্বলিখিত একটী প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন কোনও Theory বা মতকে অবলম্বন করিয়া যাত্রা করে নাই। সৌন্দর্য্যপিপাসু, ভোগপিপাসু চিত্ত তার আপন স্বাভাবিক গতিতে প্রকৃতি ও মানুষকে যে চক্ষুতে দেখিয়াছে তাহা লইয়াই তাঁহার কাব্যজীবনের আরম্ভ, সেই ভোগই তাঁহার কাব্যে ভোগাতীতকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের মধ্যযুগের অনেক কবিতা ও গানের মধ্য দিয়া শ্রেয়োবোধের যে এই অঙ্গুলিসঙ্কেত তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতির সহিত ও মানুষের সহিত যে শান্তিময় স্পন্দন তাঁহার কাব্য-জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা যখন নানা দ্বন্দের মধ্য দিয়া একটি নবীন জাগরণে তাঁহার চিত্তকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিল, তাহারই একটি পূর্ণ পরিণতি

আমরা বলাকার মধ্যে পাই। বলাকা রচিত হইবার প্রায় বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই যে এই ভাবধারাটি তাঁহার চিত্তের মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহাও এই প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। যখন একথা বলা যায় যে, শ্রেয়োবোধের পরম সত্য ও পরম বাণীটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে নাই, তখন আমরা ইহাই বুঝি যে, যে জাগরণের মধ্যে, যে চলৎস্বরূপের মধ্যে, যে অজানার সন্ধানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য একটি অদ্ভুত বিশ্বজাগরণের মহিমায় জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারি সহিত তুল্য সামঞ্জস্যে সেই শ্রেয়োবোধের বাণীটি স্ফুট হইয়া উঠে নাই, সে অজানার স্বরূপকে আমাদের নিকট পূর্ণতর ভাবে পরিচিত করিয়া দেয় নাই। তবে এই সঙ্গে এ কথাও বলা আবশ্যক যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে বিশ্বজাগরণের কথা এই প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে, সেটি যে কেবল তত্ত্বান্বেষণ বা জীবনস্বরূপের একটী চলন্ত ছবি তাহা নহে, তাহার অজানা যে কেবল ধ্যানগম্য বা জ্ঞানগম্য তাহা নহে তাহা প্রেমগম্যও বটে। এই অজানাকেই তিনি অন্তর্য্যামীরূপে সাক্ষাৎ করিয়াছেন ও পরম প্রভু বলিয়া বারম্বার ইহার চরণে আত্মনিবেদন করিয়াছেন। ইহার সহিত বিরহে ও মিলনে তাঁহার সমস্ত কাব্য-শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে। শ্রেয়োবোধের যে আকর্ষণ মানুষের নিস্পন্দ জীবনকে সর্ব্বদা উত্তেজিত করিতে থাকে—প্রেমের আলিঙ্গনের নিবিড় বন্ধনে শ্রদ্ধাঞ্জলির পুষ্পসম্ভারের মধ্যে তাহাও যেন তন্দ্রালীন হইয়া পড়ে। সেই জন্য যেখানে প্রেমের আতিশয্য সেখানে শ্রেয়োবোধের আত্মমহিমাপ্রকাশের আবশ্যকতা ন্যূন হইয়া আসে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জ্ঞান-জাগরণের মধ্যে সর্ব্বদাই একটি প্রেমের জাগরণ অনুভব করেন। সেইজন্যই অনেক সময়ে শ্রেয়োবোধের উন্মেষ তাঁহার কাব্যের মধ্যে যথেষ্ট স্ফুট হইয়া উঠে নাই। দ্বৈতবোধ যেখানে প্রবল শ্রেয়োবোধের উন্মেষ সেইখানেই তাহার আপন শক্তিকে প্রকাশ করে। প্রেমের আলিঙ্গনে যেখানে দ্বৈতবোধ থামিয়া আসিতে থাকে, সেখানে শ্রেয় ও প্রেমের বিরোধ স্পষ্ট হইয়া উঠিতে চাহে না। সেখানে মানুষ বলে,—

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।"

কিম্বা

"হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।"

কিম্বা

"গায়ে আমার পুলক লাগে
চোখে ঘনায় ঘোর।
হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে রাঙা রাখীর ডোর।"

সেখানে শ্রেয়োবোধের দ্বন্দের পদসঞ্চার মৃদু হইয়া আসে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে কান্তা প্রেম

কড়ি ও কোমলে যে প্রেমের আবেগ লইয়া কবি আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা একান্তই পার্থিব ভোগ-ক্ষুধার :

"ব্যাকুল বাসনা দুটী চাহে পরস্পরে
দেহের সীমায় আসি দুজনার দেখা ?"

সেখানে প্রকৃতির মধ্যেও তিনি কালিদাসের মত এই ভোগক্ষুধারই সঙ্কেত দেখিতেন।

"আকাশের দুই দিক্ হ'তে দুইখানি মেঘ এল ভেসে
সহসা থামিল থমকিয়া আকাশের মাঝখানে এসে...
দুটী চুম্বনের ছোঁয়াছুঁয়ি, মাঝে যেন সরমের হাস,
দুখানি অলস আঁখিপাতা, মাঝে সুখ-স্বপন আভাস"

আবার—

"অসীম নীলিমা মাঝে হও নিমগন
তারাময়ী বিবসনা প্রকৃতির মত।
অতনু ঢাকুক মুখ বসনের কোণে
তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত।"

এই ভোগ-ক্ষুধার সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক ভোগের যে পরিতৃপ্তি কবি অনুভব করিয়াছিলেন, তাহার পরিণতিতে কবির মনে শ্রান্তি ও বৈরাগ্য আসিয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন,—

"নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিও না টানি।"

দৈহিক ভোগে তৃপ্তি না পাইয়া কবি অনুভব করিলেন—

"ধনীর সন্তান আমি নহি গো ভিখারী,
হৃদয়ে লুকানো আছে প্রেমের ভাণ্ডার,
আমি ইচ্ছা করি যদি মিলাইতে পারি,
গভীর সুখের উৎস হৃদয় আমার।"

সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি মানুষের ভোগময় সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তে প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রবেশলাভ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন।

"ক্ষুদ্র আমি জেগে আছি ক্ষুধা লয়ে তার,
শীর্ণ বাহু আলিঙ্গনে আমারেই ঘেরি,
করিছে আমারে হায় অস্থি চর্ম্ম সার ?
কোথা নাথ কোথা তব সুন্দর বদন
কোথায় তোমার নাথ বিশ্বঘেরা হাসি,
আমায় কাড়িয়া লও করগো গোপন
আমারে তোমার মাঝে করগো উদাসী।"

বাসনার বন্ধনের মধ্য হইতে বহির্জ্জগতের অনন্তের মধ্যে আপনাকে মুক্ত করিতে কবির মধ্যে যে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল তাহারও আমরা পরিচয় পাই।

"বাসনার বোঝা নিয়ে ডোবে ডোবে তরী,
ফেলিতে সরে না মন উপায় কি করি।"

বাহিরের প্রকৃতির মধ্যে যে একটী অসীম প্রেমের আদান প্রদান চলিয়াছে তাহার একটা ক্ষীণ আভাস "কড়ি ও কোমলে" দেখা যায়।

"ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতি প্রাণ,
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।

অসীমে উঠিছে প্রেম, শুধিবারে অসীমের ঋণ—
যত দেয় তত পায়, কিছুতে না হয় অবসান।
যত ফুল দেয় ধরা তত ফুল পায় প্রতিদিন
যত প্রাণ ফুটাইছে ততই বাড়িয়া উঠে প্রাণ।
যাহা আছে তাই দিয়ে ধনী হয়ে উঠে দীন হীন,
অসীম জগতে একি পিরীতির আদান, প্রদান ?"

কিন্তু এই অনন্ত জীবন কোথায়, সে সম্বন্ধে কবির মনে তখনও কোন স্পষ্ট ধারণা জাগ্রত হয় নাই—

"প্রাণ দিলে প্রাণ আনে,—কোথা সেই অনন্ত জীবন !
ক্ষুদ্র আপনারে দিলে, কোথা পাই অসীম আপন,
সে কি ওই প্রাণহীন অন্ধ অন্ধকারে !"

"মানসী"র প্রথম কবিতাটির নাম উপহার। এই কবিতাটির তাৎপর্য্য এই যে বাহিরের জগতের নানা তরঙ্গ আসিয়া আমাদের অন্তরের দ্বারে সর্ব্বদাই আঘাত করিতেছে, এবং সেই আঘাতের ফলে আমাদের মনের মধ্যে নানা বাসনা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি জাগ্রত হইয়া উঠে। বাহিরের জগতের সহিত সম্পর্কে আসিয়া মনের মধ্যে এই যে সীমাহীন জাগরণ উদ্বোধিত হয় ভাষার সীমার মধ্য দিয়া প্রীতির স্পর্শ দিয়া মূর্ত্তিমতী ধর্ম্মের কামনাকে বিচিত্রতার মধ্য দিয়া প্রকাশ করাতে কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের বিকাশ। কেবলমাত্র বাহিরের গন্ধ-গান-দৃশ্যের মধ্যে যখন আমরা আমাদিগকে ছড়াইয়া দেই তখন এ অন্তরের নিগূঢ় জাগরণের সহিত আমাদের যে বিচ্ছেদ আসে সেই বিচ্ছেদের দুঃখে আমরা অভিভূত হই।

"সেই মোহ মন্ত্র গানে কবির গভীর প্রাণে
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা।"

সেই বিরহের আক্রন্দনে মর্ম্মের কামনা তাহার আপন অন্তঃপুর লোক

পরিত্যাগ করিয়া ভাবার আবরণ লইয়া বহির্জগতের গন্ধগান দৃশ্যকে আপন অন্তরের ছন্দে প্রকাশ করে। এমনি করিয়া বাহির ও ভিতরের যে বিরাম হয় তাহাতেই কবির চরমপ্রাপ্তি ও চরম আনন্দ। ("কড়ি ও কোমল"এর মধ্যে দেখা গিয়াছিল যে ভোগের মধ্যে একটী ভোগাতীত বিরাগ আপন ক্রন্দনের সুরে কবির চিত্তকে আপ্লুত করিয়াছে। উহার কবিতাগুলির মধ্যে কবি ভোগ-সুখের আক্রন্দনের সমস্যা পুরণ করিয়াছেন। বাহিরের ভোগে লিপ্ত থাকিলে অন্তরের ক্ষুধা মিটে না, বাহিরের ভোগ যে সাড়া দেয় তাহাতে আমাদের অন্তর জাগিয়া উঠে। অন্তরের এই আত্মজাগরণের বার্ত্তাকে যখন আমরা বাহিরের ইন্দ্রিয়লোকের অনুভবের মধ্য দিয়া ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করি, তখনই অন্তরের অসীম আকাঙ্ক্ষা আবেগ বা আর্ত্তি সীমার মধ্য দিয়া আপনাকে প্রতিফলিত করিয়া আত্মপরিচয় লাভ করে এবং এই উপায়ে অন্তর বাহিরের যে মিলন ঘটে তাহাতেই ভোগ প্রজ্বলিত অন্তর্লোক অসীমের মধ্যে দিশাহারা না হইয়া সীমার মধ্য দিয়া আপনার পথ খুঁজিয়া লয়। অন্তর্লোকের অপূর্ণ নিঃসীমতা আর্টের মধ্যে আসিয়া ক্রমশঃ সীমার মধ্যে আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়া সার্থকতার পদবীতে আরোহণ করিতে থাকে। এই রকম পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার যে নবীন অভ্যুদয় হইল, তাহারই ফলে রবীন্দ্রনাথ ভোগ হইতে বৈরাগ্যের অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মসাধকের চিরক্ষুন্ন পথ অনুসরণ না করিয়া খণ্ডের মধ্য দিয়া সীমার মধ্য দিয়া অসীম আত্মপ্রকাশের, আত্মসঞ্চরণের, আত্মাভিমানের বেগকে সীমার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়া আপনাকে পূর্ণতার পথে প্রচালিত করিলেন। কিন্তু 'মানসী' লিখিবার সময়ে কবির মনোভাব ও মানস অভিযানের বেগ কোন স্ফুটতা অবলম্বন করে নাই। তাঁহার নিঃসীমতা অনির্দ্দেশ্যের ও অব্যক্তের নিঃসীমতা! তাহার মধ্যে আর্ত্তি আছে, চাঞ্চল্য আছে, বেদনা আছে কিন্তু মূর্ত্তি নাই; সেজন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে মানসীর কবিতাগুলির মধ্যে যে চিত্রগুলি কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন সেগুলির মধ্যে বহির্ভোগ ও ইন্দ্রিয়জভোগ, অন্তর্ভোগের ও মানসভোগের দ্বারা আবিষ্ট হইয়াছে মাত্র। কড়ি ও কোমলের কবিতার মধ্যে

যে কেবল ইন্দ্রিয়জভোগ উপলক্ষিত হয়, বিরাগবৃত্তি দ্বারা তাহা তিরোহিত হইয়া মানসীতে অন্তর্ভোগের অনুরণনের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়াছে।) 'মানসী' যুগের ইহাই অন্তর বাহিরের মিলন।

"অন্তরে বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলনেই
কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস
সে আনন্দক্ষণগুলি তব করে দিনু তুলি'
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের বিকাশ।"

'মানসী'তে আসিয়া কবি ইন্দ্রিয়ের ভোগকে অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতেছেন······

"দিবে সে খুলি' এ ঘোর ধূলি-
আবরণ।
তাহার হাতে আঁখির পাতে
জগৎজাগা জাগরণ।
সে হাসিখানি আনিবে টানি
সবার হাসি
গড়িবে গেহ, জাগাবে স্নেহ,
জীবন রাশি।
প্রকৃতি বধূ চাহিবে মধু
পরিবে নব আভরণ
সে দিবে খুলি' এ ঘোর ধূলি-
আবরণ।"

"বিশ্ব জগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি;
সুতীক্ষ্ণ বাসনা ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে।

লও তার মধুর সৌরভ,
দেখ তার সৌন্দর্য্য বিকাশ,
মধু তার কর তুমি পান
ভালবাস, প্রেমে হও বলী
চেয়োনা তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের,
শান্ত সন্ধ্যা স্তব্ধ কোলাহল।"

আর একটি কবিতায় বলিতেছেন,—

"বাসনার তীব্র জ্বালা দূর হয়ে যাবে,
যাবে অভিমান!
হৃদয় দেবতা হবে, করিব চরণে
পুষ্প অর্ঘ্য দান।
দিবানিশি অবিরল লয়ে শ্বাস অশ্রুজল
লয়ে' হা হুতাশ
চির ক্ষুধা তৃষা লয়ে আঁখির সম্মুখে,
করিব না বাস।
তোমার প্রেমের ছায়া আমারে ছাড়ায়ে
পড়িবে জগতে
মধুর আঁখির আলো পড়িবে সতত
সংসারের পথে।
দূরে যাবে ভয় লাজ সাধিব আপন কাজ
শতগুণ বলে,
বাড়িবে আমার প্রেম পেয়ে তব প্রেম,
দিব তা' সকলে।"

বাহ্যিক রূপ যে বহির্জগতের ইন্দ্রিয়সম্ভোগের মধ্যে নাই, তাহার প্রকাশ যে একান্ত অন্তরের মধ্যে, এই তথ্যটি অনুভব করিয়াই কবি বলিয়াছেন।

"কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেহে;
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে।"

অথবা—

"অপবিত্র ও কর পরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে!
মনে কি করেছ বঁধু, ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে?"

প্রেম ছাড়া সমস্ত জীবন যে অর্থহীন তাহা অনুভব করিয়া কবি বলিয়াছেন,

"সেইটুকু মুখখানি, সেই ছুটি হাত,
সেই হাসি অধরের ধারে,
সে নহিলে এ জগৎ শুষ্ক মরুভূমিবৎ
নিতান্ত সামান্য একি এ বিশ্বব্যাপারে।"

"গুপ্তপ্রেম" কবিতাটিতে কবি বলিয়াছেন যে—

"রূপসী নহি, তবু আমারও মনে
প্রেমের রূপ সে তো সুমধুর।
ধন সে যতনের শয়নস্বপনের
করে সে জীবনের তমোদূর।
আমার অপমান সহিতে পারি
প্রেমের সহেনা তো অপমান
অমরাবতী ত্যেজে হৃদয়ে এসেছে যে,
তোমারো চেয়ে সে যে মহীয়ান।

"আঁখির অপরাধ" কবিতাটিতে কবি বলিতেছেন যে তিনি বাসনার দৃষ্টি দিয়া তাঁহার প্রেমের পাত্রীটিকে দেখিয়া তাহাকে কলুষিত করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া তাঁহার প্রেমের পাত্রী জীবনের মূলে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া ইন্দ্রিয়ের ভোগতৃষ্ণা দ্বারা সেই মূর্ত্তি অপবিত্র হইয়াছে। ইন্দ্রিয়কে পরিত্যাগ করিয়া শুধু অন্তরের মধ্যে সেই মূর্ত্তি দেদীপ্যমান থাকিলে তাহা সেই সীমাকে উত্তরণ করিয়া অন্তরের মধ্যে অসীমরূপে বিরাজ করিবে।

"লহ মোরে তুলে আলোকমগন মূরতি ভুবন হ'তে
আঁখি গেলে মোর সীমা চলে যাবে একাকী অসীমভরা
আমারই আঁধারে মিলাবে গগন মিলাবে সকল ধরা।"

তাহার পরেই বলিতেছেন—

"তবে তাই হোক্, হয়ো না বিমুখ, দেবি, তাহে কিবা ক্ষতি,
হৃদয়-আকাশে থাক্ না জাগিয়া দেহহীন তব জ্যোতি!
বাসনা মলিন আঁখি কলঙ্ক ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার হৃদয় নীল-উৎপল চিরদিন র'বে পায়,
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা, হেরিব আমার হরি,
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব অনন্ত বিভাবরী।"

"অনন্তপ্রেম" কবিতাটিতে কবি অনুভব করিয়াছেন যে দুইটি নরনারীর প্রেমের মধ্যে সমস্ত নিখিলের প্রাণের প্রীতি ও বেদনা প্রকট হইয়া উঠে।

"নিখিলের সুখ নিখিলের দুখ
নিখিল প্রাণের প্রীতি;
একটি প্রেমের মাঝারে মিশিছে
সকল প্রেমের স্মৃতি,
সকল কালের সকল কবির গীতি।"

'মেঘদূত' কবিতাটিতে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করিতেছেন যে কালিদাস দুইটি নরনারীর বিরহের মধ্যে বিশ্বের নরনারীর বিরহকে যেন পুঞ্জীভূত

করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং মেঘদূতের প্রতি শ্লোকের চরণধ্বনির মধ্যে যেন সমস্ত জগতের বিরহ-মথিত চিত্তের ক্রন্দনধ্বনি কবির অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

"ঐ ছন্দ মন্দ মন্দ করি' উচ্চারণ
নিমগ্ন করিছে নিজ বিজন-বেদন।
সে সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম
সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনি সম।
তব কাব্য হ'তে।"

("আমার সুখ" কবিতাটিতে কবি অনুভব করিতেছেন যে প্রিয়জনের স্মৃতি ও ধ্যানের মধ্যে এমন একটি অসীমতা আছে যাহা শরীরে প্রাপ্তির সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করিয়া যায়, যাহা মনোরাজ্যে দুরবগাহ গহনের মধ্যে অনন্ত পথের নিঃসীমতার মধ্যে একটি পরম প্রাপ্তির আস্বাদে মানুষের চিত্তকে ক্রমশঃ দূর হইতে দূরান্তরে টানিয়া লইয়া যায়।)

"তুমি কি করেছ মনে, দেখেছ পেয়েছ তুমি
সীমারেখা মম ?
ফেলিয়া দিয়াছ মোরে আদি অন্ত শেষ করে'
পড়া পুঁথি সম ?
নাহি সীমা আগে পাছে, যত চাও তত আছে,
যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে,
আমারেও দিয়ে তুমি এ বিপুল বিশ্বভূমি
এ আকাশ এ বাতাস দিতে পার ভরে'।
আমাতেও স্থান পেত অবাধে, সমস্ত তব
জীবনের আশা ?
একবার ভেবে দেখ এ পরাণে ধরিয়াছে
কত ভালবাসা।"

("মানসী" পড়িলে দেখা যায় যে পঙ্কলোকের মধ্যে যে মৃণালাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা ক্রমশঃ মনের চঞ্চললোকের মধ্য দিয়া নানা রূপে আপনাকে শুভ্র হইতে শুভ্রতর করিয়া প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

সংস্কৃত কাব্য পড়িলে দেখা যায় যে, কালিদাস প্রভৃতি অনেক কবির মধ্যেই নারীর প্রেম অধিকাংশ স্থলেই নিছক ঐন্দ্রিয়জ কামরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রেমিকের অন্তরের বাসনার কোন পরিচয় সেখানে তেমন পাওয়া যায় না, যেমন পাওয়া যায় কামুকের দেহ-লালসা, তাই ভালবাসার আকাঙ্ক্ষাটি সেখানে কামের আকাঙ্ক্ষা রূপে পরিচয় পায়। তাই অধিকাংশ প্রেমের কবিতাই রূপ-বর্ণনা ও শরীর-বিকাশের বর্ণনাতে পরিপূর্ণ। বিরহের উত্তাপ কামের দেহজ উত্তাপরূপে আত্মপ্রকাশ করে ও প্রেমিকের নিকট তাহার প্রেমাস্পদার চিত্র লালসার বর্ণে রঙ্গীন হইয়া দেখা দেয়। কথায় কথায়ই মদনবাণের আঘাতের কথা শুনিতে পাই।) শকুন্তলার প্রথম-দর্শনে রাজা দুষ্মন্ত "অনাঘ্রাতং পুষ্পম্" "মধুনবমনাস্বাদিতরসম্" বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন এবং কি উপায়ে সেই রূপকে ভোগ করিবেন এই চিন্তা লইয়াই তাঁহার মন ব্যস্ত। ভ্রমরভীতা শকুন্তলাকে দেখিয়া "পিবসি রতিসর্ব্বস্বমধরম্" এই কথাটী মনে হইয়াছে। রাজা দুষ্মন্তের শকুন্তলার প্রতি লালসা এমন প্রবল যে প্রথম দর্শনের সামান্য পরিচয়েই তিনি "স্থানাদনুচ্চলন্নপি গত্বেব পুনঃ প্রতিনিবৃত্তঃ"। তৃতীয় অঙ্কে মদন ক্লিষ্টা শকুন্তলাকে দেখিয়াও রাজার মুখে সেই রূপ বর্ণনা

"ক্ষাম-ক্ষাম-কপোলমাননমুরঃ কাঠিন্যমুক্তস্তনং
মধ্যঃ ক্লান্ততরঃ প্রকামবিনতাবংসৌ-ছবিঃ পাণ্ডুরা।"

কবি নরসিংহ বিরহ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"তে জঙ্ঘেজঘনঞ্চ তত্তনুদরং তৌচ স্তনৌ তৎস্মিতং
সূক্তিঃ সা চ তদীক্ষণোৎপলযুগং ধম্মিল্লভারঃ সচ
লাবণ্যামৃতবিন্দুবর্ষি বদনং তচ্চৈবমেনীদৃশ
স্তস্যাস্তদবয়মেকমেবসকৃদ ধ্যায়ন্ত এবাস্মহে।"

কবি মনোবিনোদ দেখিতেছেন,—

"মধ্যে হীনং স্তনজঘনয়োরেকমাশঙ্ক্য ধাত্রা
প্রারব্ধোঽস্যাঃ পরিকলয়িতুং পাণিনাদায় মধ্যঃ।
লাবণ্যার্দ্রৈঃ কথমিতরথা তত্রতস্যাঙ্গুলীনা
মামগ্নানাং ত্রিবলিবলয়চ্ছদ্মনা ভান্তি মুদ্রাঃ॥"

কবি রাজশেখর বলেন—

"লীলাতাণ্ডবিতভ্রুবিভ্রমবলদবক্ত্রং কুরঙ্গীদৃশা
সাকূতং সকৌতুকঞ্চ সুচিরং ন্যস্তাঃ কিলাস্মান্ প্রতি,
সোদর্য্যাঃ সুহৃদঃ স্মরস্য সুধয়া দিগ্ধা কটাক্ষচ্ছটাঃ॥"

শ্রীহর্ষদেব লিখিতেছেন—

"কৃচ্ছ্রেণোরুযুগং ব্যতীত্য সুচিরং ভ্রান্ত্বা নিতম্বস্থলে
মধ্যেঽস্যাস্ত্রিবলীতরঙ্গবিষমে নিস্পন্দতামাগতা।
তদ্দৃষ্টিস্তৃষিতেব সম্প্রতি শনৈরারুহ্য তুঙ্গৌস্তনৌ
সাকাঙ্ক্ষং মুহুরীক্ষতে জললবপ্রস্যন্দিনী লোচনে॥"

কবি ধর্ম্মকীর্ত্তি লিখিতেছেন—

"সা বালা বয়মপ্রগল্ভমনসঃ সা স্ত্রী বয়ং কাতরাঃ
সাক্রান্তা জঘনস্থলেন গুরুণা গন্তুং ন সক্তা বয়ম্।
সা পীনোন্নতিমৎপয়োধরযুগং ধত্তে সখেদা বয়ং
দোষৈরন্যজনাশ্রিতৈরপটবো জাতাঃস্ম ইত্যদ্ভুতম্॥"

প্রায় অধিকাংশ সংস্কৃত কবির প্রেমবর্ণনার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে দেহজ-ভোগ ও ইন্দ্রিয়জতৃপ্তিই প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রধানতঃ কেবলমাত্র ভবভূতির মধ্যে আসিয়া আমরা দেখিতে পাই যে ইন্দ্রিয়জতৃপ্তি যেন ইন্দ্রিয়কে ছাড়াইয়া এক অতীন্দ্রিয় আনন্দলোকের মধ্যে মনকে সমাধিসমাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। সে অবস্থা যেন সুখদুঃখের অতীত—প্রমোহনিদ্রার অতীত। চৈতন্য

যেন সেখানে উন্মেষিত হয় এবং নিমীলিত হয়। ভোগ হইতে ভোগাতীতের মধ্যে যেন চিত্ত ডুবিয়া যায়।

"বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রমোহো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মমহি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥"

ভবভূতির মধ্যে আমরা আরও দেখিতে পাই যে ইন্দ্রিয়স্পর্শরসকে অতিক্রম করিয়া একটি স্থায়ী প্রেমরস চিত্তকে অভিষিক্ত করিতেছে।

"অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু যৎ
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নাহার্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতং
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকম্ হি তৎ প্রাপ্যতে॥"

ভবভূতির মধ্যে বিরহের যে নিদারুণ বর্ণনা আছে তাহার মধ্যে কামোপভোগের চিহ্নমাত্র নাই—

"দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং দ্বিধাতু ন ভিদ্যতে
বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।
জ্বলয়তি তনূমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ
প্রহরতি বিধির্মর্ম্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্॥"

কবি কেশট হরিণী অভাবে হরিণের বিরহ বর্ণনা করিয়া প্রেমের একটি সুন্দর চিত্র দিয়াছেন—

"নাদৎসে হরিতাঙ্কুরান্ ক্বচিদপি স্থৈর্য্যং ন যদ্ গাহসে
মৎপর্য্যাকুললোচনোঽসি করুণং কুজন্দিশঃ পশ্যসি।
দৈবেনান্তরিতপ্রিয়োঽসি হরিণ ত্বং চাপি কিং যচ্চিরং
প্রত্যদ্রি প্রতিকন্দরং প্রতিনদি প্রত্যুবরং ভ্রাম্যসি॥"

"কড়ি ও কোমল" হইতে মানসীতে রবীন্দ্রনাথের মনের যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় তাহাতে দেখা যায় যে ইন্দ্রিয়জ আকাঙ্ক্ষা বা কাম হইতে তাঁহার চিত্ত মনোভূমিতে আরোহণ করিয়াছে। তিনি অনুভব করিয়াছেন যে প্রেম দেহজ-রূপের অপেক্ষা করে না। প্রেমের দেহহীন জ্যোতি বাসনার মালিন্য হইতে মুক্ত হইয়া হৃদয়ের নীলোৎপলের মধ্যে প্রেমিকের দেবতাস্বরূপ হইয়া বিরাজ করে। তিনি অনুভব করিয়াছেন যে দুইটি প্রাণের প্রীতির মধ্যে সমস্ত বিশ্বপ্রেমের একটি চিরজাগরণ সম্পন্ন হইতে পারে। অলকাপুর নিবাসিনীর জন্য বিরহী যক্ষের হৃদয়ের আর্ত্তির মধ্যে তিনি সমস্ত বিশ্বের প্রেমিকদের আক্রন্দন শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে দেহের সীমারেখার মধ্যে প্রেম যখন আপনাকে অবসন্ন করিয়া ফেলে তখন সে প্রেমের মর্য্যাদা নষ্ট হয়। দেহকে ভুলিয়া গিয়া একজন যখন অপরের হৃদয়ের মধ্যে আপনাকে সীমাহীনরূপে প্রকাশ করে তখন সেই উভয়ের অঙ্গহীন মিলনের মধ্যে সীমার পর্য্যাপ্তি ও ক্লান্তি নাই। সেই মিলনের পথ কোথাও বাধাগ্রস্ত হইয়া যায় না। তাহা দেশকালের সীমাকে অতিক্রম করিয়া আত্মানুভূতির অনন্ত অবাধিত পথে ধাবমান হয়। সংস্কৃত কাব্য পর্য্যালোচনার সময়ে প্রেমের আন্তর ভোগের কথা কেবল মাত্র ভবভূতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রেমের আন্তর ভোগের মধ্যে যে একটা এমন বিরাট পরিণতি আছে যাহাতে বিশ্বের মিলন-রসের সন্ধান পাওয়া যায় তাহার কোন পরিচয়ই তাহার মধ্যে পাওয়া যায় না। আত্মার নিভৃত গুহার মধ্যে অঙ্গহীন মনসিজের যে একটি অদ্বৈত সুখদুঃখের বিকারহীন সর্ব্বাবস্থায় একরূপ প্রেমের সন্ধান পাই সেখানে উভয়ের মধ্যের আবরণ অপসারিত হইয়া অনন্ত স্নেহরস উপচিত হইয়া উঠে। ভবভূতিতে এই রসের পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু তাহার মধ্যে বিশ্বের মিলন রসের যে একটি সম্ভোগ আপনাকে প্রকাশ করিয়া তুলে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে প্রধানতঃ প্রেমের চারিটী স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। একটি নিছক ভোগরসের লালসায় পরিপূর্ণ এবং দেহের সৌন্দর্য্যকে লইয়া ব্যস্ত এবং এইটিই অত্যন্ত ব্যাপকভাবে দেখা যায়। কালিদাসের অনেক

কবিতাতে দেখা যায় যে তিনি প্রকৃতিকে মানুষের পর্য্যায়ভুক্তরূপে দেখিতেন এবং মানুষের প্রেমের আক্রন্দন ও আর্ত্তি, মিলন ও বিরহ, প্রকৃতির বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, মেঘ, বিদ্যুৎ এই সমস্তকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, এইভাবে অনুভব করিতেন। মানুষের মধ্যে যেমন প্রেমলীলা চলিয়াছে, পশুপক্ষীর মধ্যেও সেইরূপ প্রেমচর্চ্চা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং সমস্ত প্রকৃতির সমস্ত ধাতু যেন মানুষের সহিত একযোগে একটি প্রেমসম্ভোগরসকে চরিতার্থ করিয়া আনিতেছে। কালিদাসের মেঘদূত ও ও ঋতুসংহারে ইহার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। ভবভূতির মধ্যে নর-নারীর প্রেমের একটি স্তর দেখিতে পাই যেখানে দেহসম্ভোগ ও দেহাকর্ষণকে অতিক্রম করিয়া একটি নিত্যানুকূল আত্মরতির মধ্যে প্রেম আপন প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। এই ভবভূতির মধ্যেই আরও একটি স্তর এমনভাবে উদ্বুদ্ধ হইতে দেখা যায় যাহাতে বিরহের আর্ত্তি শরীর-ক্ষুধাকে অতিক্রম করিয়া কেবলমাত্র অন্তরক্ষুধা ও অন্তরবেদনার মধ্যে আপনাকে মর্ম্মস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছে,) ইহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। কবি কেশটের যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দেখা যায় যে প্রেম বস্তুটি কেবলমাত্র নরনারী-সুলভ ধর্ম্ম নহে; তাহা সর্ব্ব প্রাণি-সাধারণ বৃত্তি।

নরনারীর মধ্যে বিরহের যে আর্ত্তি ও পীড়া দেখা যায়, হরিণ-হরিণীর মধ্যেও সেই একজাতীয় বিরহব্যথা মর্ম্মন্তুদ হইয়া উঠিতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যে দেহজ আকর্ষণের অতি বাহুল্য থাকিলেও অন্ততঃ কোন কোন কবির মধ্যে সেই আকর্ষণ তাহার দেহসীমাকে অতিক্রম করিয়া সার্ব্বভৌম অন্তর্লোকের মধ্যে আপনার পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু যুগল নরনারীর প্রীতির মধ্যে যে সমস্ত বিশ্বের প্রীতিরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পারে এ কথা স্পষ্টভাবে সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যে যে সাধন পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে সহজ প্রীতি রহিয়াছে তাহা যখন বহিরঙ্গ কামের দেহাভিলাষকে অতিক্রম করে তখন মানুষের মধ্যে মানুষের অন্তরঙ্গ স্বরূপ রূপে

যে সহজ প্রেমরস রহিয়াছে তাহাকে এমন করিয়া প্রকাশ করে যে মানুষের সমস্ত স্বরূপ তাহার মধ্যে লয় হইয়া যায়। উপনিষদে জগৎকে আনন্দরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—"আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি"। 'মৈত্রেয়ী' ও 'যাজ্ঞবল্ক্যে'র উপাখ্যানে বারম্বার লিখিত হইয়াছে যে যাহা কিছু আমরা দেখিতে চাই তাহাই আমাদের আত্ম-কামনার নামান্তর মাত্র—"নবা অরে মৈত্রেয়ি পত্যুঃকামায় পতিঃপ্রিয়োভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়োভবতি।" এই সমস্ত বাক্যের প্রচলিত ব্যাখ্যায় যে আত্মাকেই আনন্দময় বলিয়া বলা হইয়াছে। "রসোহ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দীভবতি"। উপনিষদের কোন কোন স্থানে আবার আনন্দকে শিশ্নার বৃত্তি বলিয়া বলা হইয়াছে। আবার ইহাতে বলা হইয়াছে যে "যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং আন্তরঞ্চ বেদ" ইত্যাদি—অর্থাৎ প্রিয়া স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিলে যে আনন্দ হয় ব্রহ্মানন্দও তজ্জাতীয়। অথর্ব্ববেদে দেখা যায় "ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্।" এই সমস্ত বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন জাতীয় বাক্য পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে বৈদিকযুগেও আত্মাকে আনন্দস্বরূপ বলিয়া মনে করা হইত এবং সেই আনন্দের পরিচয় আত্মপ্রেম। আনন্দই আমাদের একমাত্র চাওয়ার জিনিষ এবং সকল চাওয়ার মধ্যে আমরা আত্মাকে চাই, এইজন্য আত্মাকে আনন্দময় ও জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া বলা হইয়াছে। প্রিয়ালিঙ্গনের মধ্যে হৃদয়ের যে রসৈকতানতা ঘটে সেই রসৈকতানতার সারূপ্য প্রাচীণেরা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কন্যা বা যুবতী যে রসৈকতানতার সহিত পতিকে সন্ধান করে সেই রসৈকতানতার মধ্যেও যে একটি ব্রহ্মাচরণ বা ব্রহ্মচর্য্য রহিয়াছে তাহাও প্রাচীনেরা বলিয়া গিয়াছেন। দেহজ-কামের মধ্যেও আত্মা আপন স্বরূপকে সন্ধান করে। এবং সেই স্বরূপকে দেহের মধ্যে খুঁজিতে গিয়া মোহগর্ত্তে নিপতিত হয়। কিন্তু এই অন্বেষণের ফলে ক্রমশঃ এই বোধ জন্মে যে কামের আকাঙ্ক্ষা দেহানুসন্ধানের সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ হইবার নহে। তাহার চরম সার্থকতা ও পরিপূর্ত্তি প্রেমরসের স্বরূপানুভূতির মধ্যে, এবং তাহাতেই আমাদের চরম প্রতিষ্ঠা ও চরম সাক্ষাৎকার।

নরনারীর প্রীতিকে উপলক্ষ্য করিয়া সহজিয়াদের সাধন পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে, তাই সহজিয়ারা বলেন—

কাম কাম বলি সবাই বলয়ে
না জানে কামের মর্ম্ম।
কামনা বুঝিয়া সামান্তে মজিয়া
আচরে সহজ ধর্ম্ম ॥

* * *

অপক্ক দেহতে এ কাম সাধিতে
ই-কুল উ-কুল যায়।
বামন হইয়া বাহু পাশরিয়া
চান্দ ধরিবারে চায় ॥

দেহরতি সহজিয়াদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহাদের আদর্শ এই যে দেহজ প্রীতিকে অবলম্বন করিয়া দৈহিক আকাঙ্ক্ষাকে উত্তীর্ণ হইয়া নিছক প্রীতিরসের পূর্ণ উপলব্ধির মধ্যে আত্ম স্বরূপকে সাক্ষাৎ করা।

ওরতি এরতি একত্র করিয়া
সেখানে সেরতি থুবে।
রতি রতি দুহে একত্র করিলে
সেখানে দেখিতে পাবে ॥

রসের ভিতরে বস্তুতত্ত্ব নাহি জানে।
রস বই বস্তু নাই এ তিন ভুবনে ॥

উজ্জ্বল রসের মধ্যে এক বস্তু হয়।
সেই বস্তু না জাগিলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি নয়॥

স্বরূপ স্বরূপ অনেকে কয়।
জীবলোক কভু স্বরূপ নয়॥
স্বরূপ রসেতে মাধুর্য্য হয়।
তাহা বিনু মনে কিছুই নয়॥

এই সমস্ত সহজিয়া পদাবলী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে স্ত্রীপুরুষকে অবলম্বন করিয়া যে দেহজ প্রীতি উৎপন্ন হয় সেই দেহজ প্রীতিকে দেহবিনির্ম্মুক্ত করিয়া শুধু প্রেমরসের মধ্যেই ইন্দ্রিয়ের স্বরূপকে অনুভব করা—ইহাই সহজিয়াদের আদর্শ।

বাহির দুয়ারে কপাট লাগায়ে
ভিতর দরজা খোলো।
নিসাড়ি হইয়ে চলগো সজনি
আন্ধার করিয়ে আলো॥

মনের রতন বাহির না কর
যতন করিয়া রেখ।
বিরল পাইলে কপাট খুলিয়ে
নয়ান ভরিয়ে দেখ॥

কায়িকী উপরে বাচিকী জয়
তাহার উপরে মন।

মনের উপরে আর দুই হয়
সেই সে রতন ধন ॥

* * *

সহজ দেহেতে বুঝিয়া লবে
দেহ ছাড়ি পুন রসেতে যাবে ॥
এখানে সেখানে একুই হইলে।
সহজ পীরিতি না ছাড়ে মৈলে ॥

সহজিয়াদের মধ্যে নানা সম্প্রদায় আছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে সহজ আকর্ষণকে অবলম্বন করিয়া দেহাসক্তিকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিলে তবেই আপন রসমূর্ত্তির সাক্ষাৎ হয়। কেহ কেহ বা মনে করেন যে দেহজকামকেই আপন সাধনবলে প্রেমরূপে পরিবর্ত্তিত করা যায়। অর্থাৎ দেহজ কামেরই এমন একটি পরিপক্ক অবস্থা হইতে পারে যাহাতে সেই কামের অন্তরস্থ রসধাতু আপনার রসস্বরূপের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে এবং এই উপায়ে কাম ও রস-রূপে আপনাকে পরিণত করিতে পারে।

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত যে সমস্ত পদাবলী পাওয়া যায় তাহাতে একদিকে যেমন দৈহিক আকর্ষণের প্রগাঢ়তা দেখা যায় অপর দিকে তেমনি মনের আকর্ষণের গভীরতা ও প্রবলতা দেখা যায়। একদিকে যেমন দেখি—

এক তনু হৈয়া মোরা রজনী গোঁয়াই
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই।

অপর দিকে তেমনি দেখি—

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো

বদন ছাড়িতে নাহি পারে
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।

* * * *

সই মরম কহি হে তোকে
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
কভু-না আনিব মুখে।
পিরীতি মূরতি কভু না হেরিব
এ দুটি নয়ান কোণে।
পিরীতি বলিয়া নাম শুনাইতে
মুদিয়া রহিব কোণে॥

চণ্ডীদাসের সমস্ত পদাবলীর মধ্যে প্রেমের ব্যাকুলতা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এ প্রেম শুধু বাহিরের প্রেম নহে দেহের আসক্তি নহে—এ প্রেম সেই প্রেম াহাদ্বারা একজন অপরের সহিত সম্পূর্ণ মিলিত হইতে পারে।

পিরীতি অন্তরে পিরীতি মন্তরে
পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি রতন লভিল যে জন
বড় ভাগ্যবান সে॥
পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিশিতে পারে॥

চণ্ডীদাস তাঁহার আপন সাধন পদ্ধতির মধ্যেও কামগন্ধহীন প্রেমরসের সাক্ষাৎ-কারকেই চরম বলিয়া মনে করেন।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেমের এই স্তরের নিদর্শন অতি বিরল। রাম-সীতার বিরহে দেখিতে পাই যে সীতাকে যখন আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া রাম দেখিতে পাইলেন না, তখন রামের চিত্তে প্রথমে দারুণ দুঃখ উৎপন্ন হইল তিনি বলিলেন, "স্বর্গোঽপি হি ত্বয়া হীনঃ শূন্য এব মতো মম···নত্বহং তাং বিনা-সীতাং জীবেয়ং হি কথঞ্চন"। সীতাছাড়া স্বর্গও শূন্য এবং সীতা ছাড়া আমি আর বাঁচিব না। সীতার বিয়োগদুঃখে রামচন্দ্রের চিত্তে অন্য সমস্ত দুঃখ উথলিয়া

"রাজ্যপ্রণাশঃ স্বজনৈর্বিয়োগঃ পিতুর্বিনাশো জননীবিয়োগঃ
সর্ব্বাণি মে লক্ষ্মণ শোকবেগম্ আপূরয়ন্তি প্রবিচিন্তিতানি ॥"

তারপর আরম্ভ হইল সীতার অন্বেষণ। অন্বেষণে বিফলমনোরথ হইয়া রামের চিত্ত ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—

'বিনির্মথিতশৈলাগ্রং শুষ্যমাণজলাশয়ম্
ধ্বস্তদ্রুমলতাগুল্মং বিপ্রণাশিতসাগরম্।
ত্রৈলোক্যং তু করিষ্যামি সংযুক্তং কালকর্ম্মণা
নতে কুশলিনীং সীতাং প্রদাস্যন্তি মমেশ্বরাঃ ॥"

লক্ষ্মণ রামকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, তখন রামের ক্রোধ শান্ত হইল। পম্পাসরোবরের তীরে আসিয়া রামচন্দ্রের শোক স্নিগ্ধতাপন্ন হইয়া আবার তাহাকে চঞ্চল করিয়া ফেলিল।

"যানি স্ম রমণীয়ানি তয়া সহ ভবন্তি মে।
তান্যেবারমণীয়ানি জায়ন্তে মে তয়াবিনা ॥
পদ্মকোশ-পলাশানি দ্রষ্টুংদৃষ্টির্হি মন্যতে।
সীতায়াঃ নেত্রকোশাভ্যাং সদৃশানীতি লক্ষ্মণ ॥
পদ্মকেশরসংস্পৃষ্টো বৃক্ষান্তর বিনিঃসৃতঃ।
নিশ্বাস ইব সীতায়া বাতি বায়ুর্মনোহরঃ ॥"

কিন্তু রামের শোক যখন বীর উদ্যমের পরাকাষ্ঠার মধ্যে পরিণত হইল, সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া যখন তিনি আপন বিক্রমে রাবণবংশ ধ্বংস করিলেন, তখন যেন সেই রাবণের হুঙ্কারের পরিসমাপ্তির মধ্যে সীতা-প্রেম শেষ হইয়া গেল, জনাপবাদ ভয়ে সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইয়া তিনি বলিলেন—

যৎ কর্ত্তব্যং মনুষ্যেণ ধর্ষণাং প্রতিমার্জ্জতা।
তৎ কৃতং রাবণং হত্বা ময়েদং মানকাঙ্ক্ষিণা॥
রক্ষতা তু ময়া বৃত্তমপবাদং চ সর্ব্বতঃ।
প্রখ্যাতস্যাত্মবংশস্য ন্যঙ্গং চ পরিমার্জ্জিতা॥
প্রাপ্তচারিত্র্যসন্দেহা মম প্রতিমুখে স্থিতা।
দীপো নেত্রাতুরস্যেব প্রতিকূলাসি মে দৃঢ়া॥
তৎ গচ্ছ ত্বনুজ্ঞানেঽদ্য যথেষ্টং জনকাত্মজে।
এতা দশ দিশো ভদ্রে কার্য্যমস্তি ন মে ত্বয়া॥

তারপরে অগ্নিপরীক্ষার পর সীতাকে তিনি গ্রহণ করিলেন। তার পর পুনরায় উত্তরকাণ্ডে সীতার বনবাস। সেই উপলক্ষে রাম বলিতেছেন,

কীর্ত্ত্যর্থং তু সমারম্ভঃ সর্ব্বেষাং সুমহাত্মনাম্।
অপ্যহং জীবিতং জহ্যাম্ যুষ্মান্ বা পুরুষর্ষভান্॥
অপবাদভয়াদ্ভীতঃ কিংপুনর্জনকাত্মজাম্।

কালিদাসও রামচন্দ্রের সীতাপ্রেমের এই দুর্ব্বল চিত্রটি রঘুবংশে বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে যশোধনদিগের যশ নিজের দেহ হইতেও প্রিয়, অতএব ইন্দ্রিয়ভোগের উপাদানস্বরূপা যে সীতা তাহা হইতে যে তিনি যশকে বড় বলিয়া মনে করিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে!

নিশ্চিত্যচানন্যনিবৃত্তিবাচ্যং
ত্যাগেন পত্ন্যাঃ পরিমার্ষ্টুমৈচ্ছৎ।
অপি স্বদেহাৎ কিমুতেন্দ্রিয়ার্থাদ্
যশোধনানাং হি যশো গরীয়ঃ॥

ভর্ত্তৃহরির মধ্যে দেখা যায় যে একদিকে যেমন ভোগের উদ্দীপ্ত লালসা—

উৎবৃত্তঃ স্তনভার এষ তরলে নেত্রে চলে ভ্রূলতে
রাগান্ধেষু তদোষ্ঠপল্লবমিদং কুর্ব্বন্তু নাম ব্যথাম্।
সৌভাগ্যাক্ষরপংক্তিরেব লিখিতা পুষ্পায়ুধেন স্বয়ং
মধ্যস্থাপি করোতি তাপমধিকং রোমাবলীকেন সা॥

অপরদিকে তেমনি ভোগকে লক্ষ্য করিয়া মনের মধ্যে যে তীব্র বিরোধ জাগিয়াছিল তাহা বৈরাগ্যের বীভৎসতার মধ্যে আপনার পরিচয় দিয়াছে।

স্তনৌ মাংসগ্রন্থী কনককলসাবিত্যুপমিতৌ
মুখং শ্লেষ্মাগারংতদপি চ শশাঙ্কেন তুলিতম্।

কিন্তু বৈরাগ্যের দ্বারা ভোগের ক্লিন্নতা ধৌত হইয়া বিশুদ্ধ প্রেমের উ মাহাত্ম্য সুন্দর ও শোভন হইয়া উঠিয়াছে এইরূপ কবিতা সংস্কৃত-সাহিত্যে বিরল শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায় যে একদিকে যেমন দেহভোগের পূর্ণতা অপরদিকে দেহনিরপেক্ষ অন্তররতি, অন্তরপ্রীতি তার প্রাণস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। গোপীদি কৃষ্ণপ্রেম বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবৎ বলিতেছেন—

অন্তর্গৃহগতা কাশ্চিদ্গোপ্যাঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মিলিতলোচনাঃ॥
দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥

গৃহের মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া গোপীরা নিমীলিত-লোচন হইয়া কৃষ্ণের ভাবনায় এম তন্ময় হইলেন, তাঁহার তীব্র বিরহদুঃখে এমন তপ্ত হইলেন যে, তাহাতে তাঁহাদে সমস্ত দুঃখভোগ শেষ হইয়া গেল, এবং ধ্যানের দ্বারা অন্তরে তাঁহারা যে আলিঙ্গ পাইলেন তাহাতে সমস্ত সুখপ্রাপ্তি তাহার চরম সার্থকতায় নীত হইল। প্রেমে এমন আন্তর আস্বাদ, এমন গভীর সংস্পর্শ, এমন গাঢ় সংযোগ সংস্কৃত সাহিত্যে অতুলনীয়। অমরুশতক প্রভৃতি গ্রন্থে প্রেমাস্পদের অদর্শনের দুঃখে, বিরহে উত্তাপে মরণ-সম্ভাবনার কথা অনেকস্থলে অতিসুন্দর করিয়া চিত্রিত হইয়াছে।

যাতাঃ কিন্ন মিলন্তি সুন্দরি। পুনশ্চিন্তা ত্বয়া মৎকৃতে
নো কার্য্যা নিতরাং কৃশাসি কথয়ত্যেবং সবাষ্পে ময়ি!
লজ্জামন্থরতারকেণ নিপতদ্ধারাশ্রুণা চক্ষুষা।
দৃষ্টা মাং হসিতেন ভাবিমরণোৎসাহস্তয়া সূচিতঃ॥

আমি যখন সাশ্রুনয়নে তাঁহাকে বলিলাম যে তুমি বড় কৃশ হইয়াছ আমার জন্য চিন্তা করিও না, বিচ্ছেদের পর কি আর মিলন হয় না, তখন তাহার চক্ষু দিয়া ধারাপ্রবাহে অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল, লজ্জায় চক্ষু-তারকা মন্থর হইয়া উঠিল এবং আমার দিকে তিনি এমন করিয়া হাসিয়া তাকাইলেন যে আমার বিচ্ছেদে তাঁহার বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। ইন্দ্রিয়জ সম্ভোগ, ইন্দ্রিয়জরতি বা শারীর আকর্ষণ ছাড়া আন্তররতি বা আন্তর আকর্ষণের কথা সংস্কৃত সাহিত্যের কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই আন্তরপ্রীতি মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা গভীরতম-স্বরূপে আত্মোপলব্ধিরূপে কোথাও কোন প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে বর্ণিত আছে বলিয়া মনে হয় না। একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাতেও ভক্তিকে প্রেমরূপে তাহার মাধুর্য্য-রসের মধ্যে উপলব্ধি করিতে দেখা যায় না। ভক্তি বলিতে কেবলমাত্র ভগবানের ধ্যান বা তদর্থে আত্মনিবেদন, কর্ম্মনিবেদন, অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় তাহার অনুস্মরণ এইটুকুমাত্র দেখা যায়। প্রেমে গদ-গদ হইয়া নৃত্য-গীতের কথা শ্রীমদ্ভাগবতের দুই-একটি স্থানে দেখা যায়। মানুষের মধ্যে প্রেম তাহার শারীর-ক্লেদবর্জ্জিত হইয়া কেবলমাত্র আত্মরতির মধ্যে স্থান পায় নাই, এই জন্যই ভগবৎপ্রেমের মাধুর্য্যের মানুষ-আস্বাদ প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যে তেমন ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। চণ্ডী-দাসের মধ্যে আসিয়া আমরা দেখিতে পাই যে মানুষের অনুভব একটি সর্ব্বোচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। চণ্ডীদাস বলিতেছেন "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" দুইটি নরনারীর মধ্যে যে প্রীতি কামগন্ধহীন হইয়া, আপনার মাধুর্য্যে মানুষের চিত্তকে প্লাবিত করে তাহার মধ্যেই মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। এই প্রেমের গুণে পুরুষ ও নারী উভয়ে পরস্পরের আত্মভূত বলিয়া মনে করে এবং

পরস্পরের মধ্যে আত্মহারা হইয়া আপন নরনারী-ভাব বিস্মৃত হইয়া একটি প্রেমরসের মধ্যে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করে। সহজিয়া কবি তরুণীরমণের একটি অপ্রকাশিত গ্রন্থে লিখিত আছে—

শৃঙ্গারসাক্ষাৎ রসরাজ রাধাকৃষ্ণ।
বর্ত্তমান সতত থাকিবে হয়ে তুষ্ট॥
মধুর মাধুর্য্য রাধা হৃদয় বাহিরে।
মহা অপ্রাকৃত রস বরিষণ করে॥

*   *   *

না এক স্বভাবভাব যাবত থাকয়।
মধুর মাধব প্রেম তাবত না হয়॥
অপ্রাকৃত প্রকৃতস্বভাবসিদ্ধ হইলে।
কৃষ্ণরস হয় সদা শোনহ সকলে॥

জীবরতি দূর হইলে তবেই আত্মরতির উদ্ভব হয় এবং এই আত্মরতির মধ্যেই মানুষের চরম সার্থকতা। পরবর্ত্তীকালের উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি বৈষ্ণব-গ্রন্থে দেখা যায় যে নরনারীর প্রেমের নানাবিধ অবস্থাদ্বারা কৃষ্ণ-প্রেম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভারতীয় সাধনার প্রধান দৃষ্টিই এইখানে যে, একত্ব বুদ্ধিদ্বারা মানুষের অন্তরাত্মাকে পরিপ্লুত করিয়া তোলা। জ্ঞানের পথে দার্শনিকেরা এই তত্ত্ব প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৈরাগ্য ও একাগ্র সাধনার পথে ইচ্ছাশক্তিকে নিয়মনের দ্বারা যোগীরা এই পথ অনুসন্ধান করিয়াছেন ও প্রেমের পথে ভাগবতেরা এই তত্ত্বই বিভিন্ন উপায়ে লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নরনারীর বিশুদ্ধ প্রেমের মধ্যে আত্মরূপী ভগবান অবতীর্ণ হইয়া আমাদের আত্ম-প্রকাশের চরম সার্থকতা সম্পন্ন করেন এবং ভগবৎ-প্রেমের মধ্যেও নরনারী-সুলভ প্রেম মধুরোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে পরম পদবীতে নীত হয়। ইহাই ভারতীয় প্রেমসাধন শেষ কথা।

কিন্তু নরনারী-প্রেমের মধ্যে বিশ্ব জগতের প্রীতিরস মিলিত হয় ইহা ভারতীয় চিন্তা-প্রণালীর সম্পূর্ণ অনুগত নহে। সমস্ত জগৎ হইতে, শরীর হইতে পৃথক হইয়া আত্মাতে বিশ্রাম লাভ করিব ও আত্মার স্ফূর্তির মধ্যে আপন চরম সার্থকতা লাভ করিব ইহাই ভারতীয় চিন্তার প্রধান ও চরম উদ্দেশ্য। সেইজন্য কাব্যানন্দ সম্বন্ধেও যে সমস্ত আলোচনা হইয়াছে তাহাতেও দেখা যায় যে কাব্যের চরম সার্থকতা একটি আন্তর রসস্ফূর্তির মধ্যে। কাব্যের চরম উদ্দেশ্য—

"সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যঃ ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ।"

ব্রহ্মস্বাদসহোদর যে রস তাহার পরম পরিস্ফূর্ত্তিতেই কাব্যের চরম সফলতা। এমন কি ইন্দ্রিয়জ রূপ, স্পর্শ বা সুরলহরীর শ্রবণের মধ্য দিয়াও ব্রহ্মস্বাদকে প্রত্যক্ষ করা যায়, এ কথা শৈবশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। বিজ্ঞান ভৈরবেও লিখিত আছে—

"ক্রোধাদ্যন্তে ভয়ে শোকে গহ্বরে বারণে রণে
কুতূহলে ক্ষুদাদ্যন্ত ব্রহ্মসত্তাসমীপগা"

দারুণ ক্রোধ ভয় শোক প্রভৃতি স্থলে মনের যে মূঢ়তা আসে তাহার মধ্যে ব্রহ্ম-সত্তা আপনাকে প্রকাশ করে। অর্থাৎ যে কোন উপায়ে মানুষ যখন নিজের মধ্যে নিশ্চল হয় তখনই তাহার পরম প্রাপ্তি। ক্রোধান্ধ চিত্তভূমিতে সেই ব্যাপ্তি স্থায়ী হয় না বলিয়া ক্রোধাদিকে কোন সাধনপদ্ধতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় নাই। তথাপি শ্রীমদ্ভাগবৎ পড়িলে দেখা যায় যে, শিশুপাল দারুণ ঈর্ষায় জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন এবং সেই ঈর্ষা ও ক্রোধের আতিশয্যেই তাঁহার মুক্তি হইয়াছিল।

"উক্তং পুরস্তাদ্ এতৎ তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতং
দ্বিষন্নপি হৃষিকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়ঃ।"
"কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহং ঐক্যং সৌহার্দ্দমেবচ
নিত্যং হরৌ বিদধতা যান্তি তন্ময়তাং হিতে।"

স্পন্দপ্রদীপিকাতে লিখিত আছে—

"অবস্থাযুগলং চাত্র কার্য্য-কর্ত্তৃত্ব শব্দিতম্।
কার্য্যতাক্ষয়িণী তত্র কর্ত্তৃত্বং পুনররক্ষয়ম্॥"

কার্য্য ও কর্ত্তৃত্ব এই দুইটি অবস্থার মধ্যে কার্য্যতা ক্ষয়শীল ও কর্ত্তৃত্বই অক্ষয়।

"কার্য্যোন্মুখঃ প্রযত্নো যঃ কেবলং সোঽত্রলুপ্যতে
তস্মিংলুপ্তে বিলুপ্তোঽস্মীত্যবুধঃ প্রতিপদ্যতে।"

বাহ্যবস্তুতে ক্রিয়ারূপে আমাদের যে সমস্ত প্রযত্ন ব্যয়িত হয় তাহা লুপ্ত হইতে পারে। কিন্তু তাহা লুপ্ত হইলে যে আমি লুপ্ত হইলাম একথা কেবলমাত্র মূর্খে-ই মনে করে।

"নতু যোঽন্তর্মুখো ভাবঃ সার্ব্বজ্ঞাদিগুণাস্পদঃ।
তস্য লোপঃ কদাচিৎ স্যাদন্যস্যানুপলম্ভনাৎ॥"

দেশাদির দ্বারা অবিচ্ছিন্ন যে কার্য্য তাহারই লোপ হয় কিন্তু আমাদের অন্তর্মুখী যে ভাব তাহাতেই আমাদের চরম সার্থকতা, তাহা বাহিরের দিকে প্রসারিত হয় না এবং অপর কেহ তাহাকে বাহির হইতে জানিতে পারে না। অথচ সে তাহার অন্তর্নিহিত সৎ-স্বরূপে সর্ব্বদাই বিরাজমান রহিয়াছে। এই অন্তর্মুখীনতাই সর্ব্ববিধ ভারতীয় সাধনার মূলীভূত উদ্দেশ্য। সেইজন্য এদেশের প্রেমসাধনাও এই অন্তর্মুখীনতাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। অন্তরের প্রেম বাহিরের জগতে প্রদীপ্ত হইয়া বহির্লোককে স্নিগ্ধ করিয়া, সুন্দর করিয়া চক্ষুর সম্মুখে চিত্রিত করিয়া দিবে, এবং অন্তরের প্রেম বাহিরের বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে আপনাকে সার্থক করিয়া তুলিবে, ও অন্তরের প্রেমের মধ্যে বাহিরের সমস্ত আনন্দ যুগপৎ সমানীত হইবে, এই দৃষ্টি ভারতীয় দৃষ্টি নহে। সমস্ত বহির্জ্জগতের প্রেমকে একত্র সঙ্কুচিত করিয়া তাহার দ্বারা আত্মার পরমস্ফূর্ত্তিকে উপলব্ধি করিব—ইহাই ভারতীয় প্রেমসাধনার অন্তরের কথা, সেইজন্য ভারতীয় প্রেমচর্চ্চার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তাহার প্রথম প্রকাশ দেহজ কামে ও ইন্দ্রিয়জ প্রীতিতে। তাহার দ্বিতীয় প্রকাশ

দেহহীন আন্তররতিতে, তাহার তৃতীয় প্রকাশ আন্তররতি হইতে, যেখানে প্রেমিক ও প্রেমিকা উভয়ই গৌণ, প্রেমই মুখ্য।

"নসো রমণ ন হাম রমণী
দুঁহুমন মনোভব পেশল জানি॥"

সমস্ত কামই আত্মকামনার ও স্বাত্মরতির আবৃত প্রকাশ মাত্র। সর্ব্বস্থান হইতে সর্ব্বকামনাকে সংগৃহীত করিয়া তাহাকে তাহার প্রেমস্বরূপের মধ্যে অনুভব করাই প্রেমসাধনার চরম কথা। এইজন্যই ভারতীয় প্রেমসাধনা আপনাকে সমাজের মধ্যে—রাষ্ট্রের মধ্যে—জগতের মধ্যে ব্যাপ্ত ও স্ফুট করিয়া তুলিতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাথের "মানসী"তে নরনারীর প্রীতির মধ্যে যে অনন্তকালের এবং বিশ্বভুবনের প্রীতি আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে ইহা আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে দুর্ল্লভ। এই প্রীতি একটি প্রেমস্বরূপ আত্মার, একটি অনির্ব্বচনীয় উপলব্ধির সার্থকতা নহে। ইহা যেন ভিতর হইতে বাহিরে, যুগল হইতে বিশ্বে, অল্পকাল হইতে অনন্তকালে আপনাকে প্লাবিত করিয়া দিতেছে—

"তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধ'রে মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার ;
কত রূপ ধ'রে পরেছ গলায়
নিয়েছ সে উপহার,
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।

*　　　*　　　*

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে,
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে।

আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে,
বিরহ-বিধুর নয়ন-সলিলে
মিলন-মধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্য-নূতন সাজে।"

আবার

"অনাদি বিরহ বেদনা ভেদিয়া
ফুটেছে প্রেমের সুখ
যেমনি আজিকে দেখেছি তোমার মুখ!
সে অসীম ব্যথা অসীম সুখের
হৃদয়ে হৃদয়ে রহে,
তাইত আমার মিলনের মাঝে
নয়নে সলিল বহে।
এ প্রেম আমার সুখ নহে, দুখ নহে!"

আবার—

"সকল গান সকল প্রাণ
তোমারে আমি করেছি দান,
তোমারে ছেড়ে বিশ্বে মোর তিলেক নাহি ঠাঁই।"

রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত কবিতা পড়িলে মনে হয় যে যুগ-যুগান্ত ধরিয়া যত লোক ভালবাসিয়াছে, যত লোক প্রেমের শ্লোক গাঁথিয়াছে—বিরহমিলনের মধ্য দিয়া যত লোকের প্রেম সার্থক হইয়াছে—এখনও পৃথিবীতে চারিদিকে যত প্রীতির সুখদুঃখ চলিয়াছে, সেই সমস্ত যেন তাহার প্রেমাস্পদের মধ্যে মিলিত হইয়াছে। তাহার প্রেমাস্পদের স্থান কেবল মাত্র অদ্যকারের তাহার প্রাণের মধ্যে নহে, কিন্তু নিত্যকালের সকল প্রাণের মধ্যে যে সকল প্রেমলীলা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই সমস্ত যেন একত্র সঞ্চিত হইয়া কোন প্রাণের প্রীতির মধ্যে সেই সকলের প্রতীক স্বরূপ

হইয়া স্থানলাভ করিয়াছে। তাহার প্রেমাস্পদ শুধু তাহার অন্তরের মধ্যে নহে—অন্তর-বাহির ব্যাপ্ত করিয়া ভিতর হইতে বাহিরে এবং বাহির হইতে ভিতরে, মনের সমস্ত গানে, কল্পনায়, অনুভবে, ধ্যানে ও বাহিরের জগতের আকাশে, বাতাসে, আলোতে সর্ব্বত্র যেন ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বিশ্বভুবন আসিয়া তাহার অন্তরের প্রীতির মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে এবং সেই অন্তরের প্রীতি বিশ্বভুবনকে যেন পরিপ্লাবিত করিয়া রাখিয়াছে। এ শুধু অন্তরের উপলব্ধি নহে—এ উপলব্ধি অন্তর হইতে বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে, সমস্ত মানবের মধ্যে আপনাকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। অন্তরের অন্তরতম হইয়াও, আপন সীমার মধ্যে নিশ্চল হইয়াও ইহা সমস্ত লোককে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে এবং সমস্ত সীমাহীনের মধ্যে আপনাকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে—

"নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে আসিয়া বরণ করি;
তুমি আছ মোর জীবন-মরণ হরণ করি!
তোমার পাইনে কূল,
আপনা মাঝারে আপনার প্রেম তাহার পাইনে তুল!
উদয় শিখরে সূর্য্যের মত সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষনিহত একটি নয়ন সম।
অগাধ অপার উদাস-দৃষ্টি নাহিক তাহার সীমা।
তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন এই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার আনন্দপূর্ণিমা!
তুমি প্রশান্ত চির নিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরাম বিহীন
চঞ্চল অনিবার,
যতদূর হেরি দিক্‌দিগন্তে তুমি-আমি একাকার!"

এই যে উদার প্রেম যাহা মানুষের অন্তর হইতে বাহিরে আহৃত হইয়া সমস্ত প্রকৃতির আনন্দের সহিত একীভূত হইয়া প্রকৃতিকে ও মানুষকে এক করিয়া দেখে ইহা আমাদের দেশের সাহিত্যে একেবারে নূতন। সংস্কৃত সাহিত্যে যেখানে প্রকৃতি প্রেমের অনুযোগিতা করিয়াছে, সেই অনুযোগিতা কামরসকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের আস্বাদে যে প্রীতি, সে প্রীতি উচ্ছল হইয়া নরনারীর প্রীতির সহিত একত্র হইয়া প্রকাশ পায় নাই।

আসারেষু ন হর্ম্যতঃ প্রিয়তমৈর্যাতুং যদা শক্যতে
শীতোৎকম্পনিমিত্তমায়তদৃশী গাঢ়ং সমালিঙ্গ্যতে।
জাতাঃ শীতলশীকরাশ্চ মরুতো বাত্যন্তখেদচ্ছিদঃ
ধন্যানাং বত দুর্দ্দিনং সুদিনতাং যাতি প্রিয়াসংগমে॥

বিয়দুপচিতমেঘভূময়ঃ কন্দলিন্যো
নবকুটজকদম্বামোদিনো গন্ধবাহাঃ।
শিখিকুথকলকেকা এব রম্যা বনান্তাঃ
সুখিনমসুখিনং বা সর্ব্বমুৎকণ্ঠয়ন্তি॥

এই সমস্ত কবিতা পড়িলে দেখা যায় যে প্রকৃতির নানা বিভূতি মানুষকে বিচিত্র কামোপভোগের দিকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলে এবং উদ্দীপিত করে। কেবল প্রকৃতির আনন্দ-সম্ভোগেরও সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। যেমন অভিনন্দের—

বিদ্যুদ্দীধিতিভেদভীষণতমঃস্তোমান্তরাঃ সন্তত
শ্যামাম্ভোধররোধসংকটবিয়দ্বিপ্রোষিতজ্যোতিষঃ।
খদ্যোতানুমিতোপকণ্ঠতরবঃ পুষ্ণন্তি গম্ভীরতা
মাসারোদকমত্তকীটপটলীক্কানোত্তরা রাত্রয়ঃ॥

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের "মানসীতে" যেমন প্রকৃতির আনন্দ ও নরনারীর প্রীতির আনন্দ উদারতায়, প্রসারতায় ও স্বচ্ছতার ব্যাপ্তিতে এক হইয়া গিয়াছে, সেইরূপ দৃষ্টান্ত সংস্কৃত-সাহিত্যে কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না।

মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার উপাখ্যানে দেখা যায় যে, অর্জ্জুন সমুদ্রতীরবর্ত্তী মণিপুরের রাজা চিত্রবাহনের কন্যা চারুদর্শনা চিত্রাঙ্গদাকে নগরের মধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া তাহার পিতার নিকট গমন করিয়া তাহাকে প্রার্থনা করিয়া বিবাহ করিলেন। কাশীরামও এই বিবরণ রাখিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা" নাট্যে দেখা যায় যে কুরূপা চিত্রাঙ্গদা প্রথমতঃ ধনুঃশরহস্তে পুরুষের বেশে বিচরণ করিতেন। পরে একদিন অর্জ্জুনকে দেখিয়া তাঁহার চিত্তে নারী-সুলভ ভাব উদিত হওয়ায় কঙ্কনকিঙ্কিণী কাঞ্চী পরিধান করিয়া অর্জ্জুনকে পতিরূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন উত্তর করিলেন—

'ব্রহ্মচারী ব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য নহি বরাঙ্গনে।'

পরে চিত্রাঙ্গদা মদন ও বসন্তের তপস্যা করিলেন এবং তাঁহাদের বরে তাঁহার কুরূপ দূর হইয়া গেল, এক বৎসরের জন্য তিনি অপূর্ব্ব সুন্দরী হইলেন। অর্জ্জুন সেই রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিয়া চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হইলেন। তাহার উত্তরে চিত্রাঙ্গদা বলিতেছেন—

"কোথা গেল
প্রেমের মর্য্যাদা, কোথায় রহিল পড়ে,
নারীর সম্মান! হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
ক্ষণস্থায়ী! এতক্ষণে পারিনু জানিতে
মিথ্যা খ্যাতি বীরত্ব তোমার।"

অর্জ্জুন উত্তর করিলেন—

"খ্যাতি মিথ্যা,
বীর্য মিথ্যা আজি বুঝিয়াছি।

চারিদিক হ'তে
দেবের অঙ্গুলী যেন দেখায়ে দিতেছে
মোরে, ঐ তব আলোক-আলোক মাঝে
কীর্ত্তি-ক্লিষ্ট জীবনের পূর্ণ নির্ব্বাপণ।"

চিত্রাঙ্গদা ও অর্জ্জুনের বিবাহ হইল। রূপতৃষ্ণার বহ্নিতে অর্জ্জুনের পক্ষ দগ্ধ হইল। কিন্তু তাহাতে চিত্রাঙ্গদার মনে তৃপ্তি নাই। তাহার অন্তরের নারীর ক্রন্দন তাহাতে কমে নাই—

"পুষ্পদল সম, এ মায়া লাবণ্য মোর;
অন্তরের দরিদ্ররমণী, রিক্তদেহে
বসে রবে চিরদিন রাত। মীনকেতু
কোন্ মহা রাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া
অঙ্গ সহচরী করি ছায়ার মতন—"

ক্রমশঃ দেখিতে পাই কেবল রূপ-সম্ভোগের মধ্যে অর্জ্জুনের ক্লান্তি আসিতেছে। তিনি শৌর্য্য-বীর্য্যের ব্যবহারের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদা তখন বলিতেছেন—

"যামিনীর নর্ম্মসহচরী
যদি হয় দিবসের কর্ম্মসহচরী,
সতত প্রস্তুত থাকে বামহস্ত সম
দক্ষিণ হস্তের অনুচর, সে কি ভাল
লাগিবে বীরের প্রাণে?"

তাহার উত্তরে অর্জ্জুন বলিতেছেন যে, প্রতিমার অন্তরালে যেমন অশরীরী দেবী উপস্থিত থাকিয়া প্রতিমার রূপচ্ছটার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করেন, তেমনি চিত্রাঙ্গদা যেন তাঁহার অঙ্গহীন প্রেমের দ্বারা তাঁহার সৌন্দর্য্যকে অতিক্রম করিয়া আর কোন্ এক বিরাট সত্তার ইঙ্গিতে অঙ্গুলী-সঙ্কেত করিতেছেন। চিত্রাঙ্গদা যেন

রূপের বিচিত্র-সম্ভোগের দ্বারা অর্জ্জুনকে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন কিন্তু সে সম্ভোগ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না। সে রূপ যেন শুধু মৃত্তিকার মূর্ত্তি, শুধু নিপুণ-চিত্রিত শিল্প-তুলিকা। চিত্রাঙ্গদার রূপ যেন টলমল করিতেছে কিন্তু তাহাকে ধারণ করিতে পারিতেছে না। অর্জ্জুন বলিতেছেন—

সাধকের কাছে, প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে
মনোহর মায়া-কায়া ধরি'; তা'রপরে
সত্য দেখা দেয়, ভূষণ-বিহীন রূপে
আলো করি' অন্তর-বাহির। সেই সত্য
কোথা আছে তোমার-মাঝারে, দাও তারে।
আমার যে সত্য তাই লও! শ্রান্তিহীন
সে মিলন চির দিবসের।

* * *

"দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি' রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নই। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর'
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

চিত্রাঙ্গদার মধ্যে প্রেমের একটি নূতন সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। নরনারীর প্রীতির যথার্থস্বরূপ রূপকে আশ্রয় করিয়া নাই। অন্তর্লোক বহির্লোক উভয়কে লইয়া যে একটি আনন্দ উৎসব চলিয়াছে তাহার মধ্যেও তাহা পর্য্যাপ্ত হয় নাই। যুগ-যুগান্তের প্রেমোচ্ছ্বাস যে একটি যুগল প্রেমের মধ্যে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, প্রকৃতির

আনন্দের সহিত সম্মিলিত হইয়া যে তুমি-আমি একাকার হইয়া রহিয়াছি সেখানেও তাহা শেষ হইয়া যায় নাই। রূপ বাহিরের যবনিকা মাত্র, অন্তরের নারীমূর্ত্তি যেখানে ধরা পড়ে না। কিন্তু নারী যেখানে পুরুষের সহিত সকল কর্ম্মে, সকল প্রচেষ্টায়—সকল উৎসবে আপনাকে দীক্ষিত করিয়া তাহার সহিত একাত্মবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে সে শুধু গৃহিণী নয়, সখী নয়। গৃহকর্ম্মে নারী সে পুরুষের সহযাত্রিণী, সহকর্ম্মিণী—সহধর্ম্মিণী। তাহার সহিত সম্পর্ক কেবলমাত্র রূপ-সম্ভোগের মধ্যে নহে, অঙ্গহীন পরিণত স্নেহসারের মধ্যে নহে, তাহার সহিত সম্পর্ক সমগ্র জীবনের। প্রেমের একাত্ম-বন্ধনে নারী যেখানে পুরুষের সমব্রতধারিণী, পুরুষের আশা, গর্ব্ব, উৎসাহ, শৌর্য্য, বীর্য্য, ধর্ম্ম, যাহা কিছু পরমসাধু পরম প্রেয় ও পরমশ্রেয়ঃ আছে তাহারই যেখানে স্বাধিকার, সেখানেই নারীর যথার্থ মহিমা। সংস্কৃত সাহিত্যে যজ্ঞানুষ্ঠানে পত্নীর কৃত্য আছে সেই হিসাবে তাহাকে সহধর্ম্মিণী বা পত্নী বলা হয়। সে ছিল সেই যজ্ঞকালের দিনের কথা। কিন্তু যজ্ঞের কাল অতীত হইয়াছে, মানুষের কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে নারীকে আর কোন অংশ দেওয়া হয় নাই। যজ্ঞকার্য্যের সহধর্ম্মিণীত্ব যজ্ঞের সঙ্গেই শেষ হইয়াছে। সেইজন্যই পরবর্ত্তী-কালের সংস্কৃত সাহিত্যে অধিকাংশ স্থলেই নারী নর্ম্মসহচরী, ভোগসঙ্গিনীরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তাহাতে তাহার যথার্থ মহিমা ক্ষুন্ন হইয়াছে।

কিন্তু এই সুর যেন চিত্রাঙ্গদাতে আসিয়াই কিছু কালের জন্য থামিয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। "সোনার তরীতে" রবীন্দ্রনাথ যেন পুরুষ ও নারীর কর্ত্তব্যের ও মিলনের ক্ষেত্রকে পৃথক করিয়া দিয়াছেন।

সোনার তরীতে কবি বলিতেছেন—

> "পুরুষের দুইবাহু কিণাঙ্ক কঠিন
> সংসার সংগ্রামে সদা বন্ধন-বিহীন ;
> যুদ্ধ দ্বন্দ্ব যত কিছু নিদারুণ কাযে
> বহ্নিবাণ বজ্রসম সর্ব্বত্র স্বাধীন।

তুমি বদ্ধ স্নেহপ্রেম-করুণার মাঝে—
শুধু শুভকর্ম্ম, শুধু সেবা নিশিদিন।
তোমার বাহুতে তাই কে দিয়াছে টানি,
দুইটা সোনার গণ্ডী, কাঁকন দুখানি।"

বৈষ্ণব-কবিতা উপভোগ করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন যে, ভক্ত আর ভগবানের মধ্যে যে আনন্দ রতি চিরন্তন চলিয়াছে তাহারই একটি উচ্ছ্বাস আসিয়া যুগল-প্রীতির মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে।

"ধরি মোর বাম বাহু রয়েছে দাঁড়ায়ে,
ধরার সঙ্গিনী মোর, হৃদয় বাড়ায়ে
মোর দিকে, বহি নিজ মৌন ভালবাসা,
ঐ গানে যদি বা সে পায় নিজভাষা;"

আর এক স্থানে কবি বলিয়াছেন—

"স্নেহসুধা লয়ে গৃহের লক্ষ্মী ফিরিছে গৃহের মাঝে,
প্রতিদিবসেরে করিছে মধুর প্রতিদিবসের কাযে।"

আর একটি কবিতাতে প্রেমের মধ্যে যে একটি মহা-মৃত্যুঞ্জয় শক্তি রহিয়াছে যাহার বলে সমস্ত মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া এক মহাশঙ্খ এই ধ্বনিতে বাজিয়া উঠে যে, প্রেমের আকাঙ্ক্ষার নিকট আর সমস্ত শক্তিই ক্ষীণ—

"আমি ভালবাসি যারে
সে কি কভু আমা হ'তে দূরে যেতে পারে
আমার আকাঙ্ক্ষা সম এমন আকুল
এমন সকল-বাড়া এমন অকূল,
এমন প্রবল, বিশ্বে কিছু আছে আর।"

তবু প্রেম বলে
"সত্য ভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির অধিকার লিপি!" তাই স্ফীতবুকে
সর্ব্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
বলে "মৃত্যু তুমি নাই"—হেন গর্ব্ব কথা!"

অজবিলাপের মধ্যে কি রতিবিলাপের মধ্যে আমরা অনেক করুণ কথা শুনিতে পাই কিন্তু মহামহিম অমরত্বের সূচনা দেখিতে পাই না। সেখানে দেখিতে পাই—

"মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাম্
বিকৃতি-র্জীবিতমুচ্যতে বুধৈঃ
ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে শ্বসন্
যদি জন্তুর্নহু লাভবানসৌ।"

সেখানে বশিষ্ঠ-শিষ্য বলিয়াছেন যে, যখন নিজের দেহের সহিতও আত্মার সংযোগ ও বিয়োগ শুনা যায়, তখন বাহ্যলোকের সহিত বিয়োগ জ্ঞানীলোককে সন্ত্রস্ত করিতে পারে না। উপনিষদের মৈত্রেয়ী সম্বন্ধে আমরা পড়িয়াছি যে, আর সমস্ত বস্তুই নশ্বর, কেবল আত্মপ্রেমই অবিনশ্বর কারণ আত্মপ্রেমের বিশ্রাম আত্মানন্দের মধ্যে এবং আনন্দই আত্মার স্বরূপ। যুগল প্রেমের মধ্যে যে আত্মানন্দের এই অমৃত স্বরূপ বিরাজ করিতেছে তাহা সংস্কৃত কবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। আমাদের আত্মাশীঃ যেমন আত্মার অমরত্ব ঘোষণা করে, প্রেমও যে তেমনি আমাদের অমরত্ব ঘোষণা করে এ কথা সংস্কৃত সাহিত্যে প্রায় দেখা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরী কবিতাটী প্রথম কল্পনা লইয়া আরম্ভ। কিন্তু ক্রমশঃ দেখিতে পাই যে, কল্পনাটা তাহার কল্পলোককে পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ

পৃথিবীর দিকে নামিয়া আসিতেছে। ক্রমশঃ যেন তাহার অশরীরী বাণী রূপাভিমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। কবির সমস্ত বাল্য-জীবনের প্রেমলীলা তাঁহার চক্ষুর উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। শৈশবের প্রেমসঙ্গিনী তাঁহার অন্তরের অন্তরলক্ষ্মী হইয়া, গৌরবময়ী মহিষীর পদ অধিকার করিয়াছেন। যিনি খেলার সঙ্গিনী ছিলেন, তিনি মর্শ্মের গৃহিণী ও জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া উঠিয়াছেন। প্রীতি ও স্নেহের গভীর সঙ্গীততান অনন্ত বেদনা বহন করিয়া যেন স্বর্ণবীণাতন্ত্রীকে সতত ঝঙ্কৃত করিতেছে! সেই সঙ্গীতে সেই গানের পুলকে কবির চিত্ত যেন কল্পলোকের দিকে প্রসারিত হইতেছে। সে বেদনার কোন ভাষা নাই, সে বাসনার কোন তৃপ্তি নাই, তাহা যেন সমুদ্রে ভাসিয়া চলিয়াছে। প্রিয়ার বক্ষে বক্ষ দিয়া তাহার অন্তর-রহস্য তাহার হৃদয়লোকের মধ্য দিয়া গভীর হৃদয়-তন্ত্রীকে আঘাত দিয়া সঙ্গীত-গুঞ্জনের সৃষ্টি করিতেছে। নক্ষত্র যেমন কম্পিত শিখায় শিহরিয়া উঠে, কবির হৃদয় তেমনি শিহরিয়া উঠিতেছে। কল্পলোকের কল্পনাটী নারীর মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে—

সেই তুমি
মূর্ত্তিতে দিবে কি ধরা! এই মর্ত্ত্যভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে ?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব্বঠাঁই হ'তে সর্ব্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ, ধরণীর একধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মূরতি ?

অন্ধকারের স্রোতের মধ্যে দৃষ্টিপথ যেন ক্ষীণ, বর্ণহীন অস্তিত্বের রেখাকে ডুবাইয়া দিয়া সেই স্পর্শের আবেগের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেছে। কবি মনে করিতেছেন যে এই কল্পমূর্ত্তি নারীর সহিত তাঁহার যখন চোখোচোখি হইবে তখন তিনি তাহাকে চিনিতে পারিবেন। সমস্ত নিদ্রিত অতীত নূতন চেতনা লাভ করিবে।

"আমার নয়ন হ'তে লইয়া আলোক
আমার অন্তর হ'তে লইয়া বাসনা
আমার গোপন প্রেম করিছে রচনা
এই মুখখানি·········"

তখন তিনি আরও অনুভব করিবেন—

"জীবনের প্রতিদিন
তোমার আলোক পাবে বিচ্ছেদ-বিহীন,
জীবনের প্রতিরাত্রি হ'বে সুমধুর
মাধুর্য্যে তোমার।"

তাহার পরে কবি আবার অনুভব করিতেছেন যে যাহার সহিত পরজন্মপথে নারীরূপে দেখা হইবে, তিনিই যেন পূর্ব্বজন্মে নারী-রূপে ছিলেন। তাহার সেই বিরহে যে মিলন ঘটিয়াছে, দেহের বাধা দূর হইয়াছে তাহাতে—

"আজ বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে
তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে!
ধূপ গন্ধ হ'য়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তার
পূর্ণ করে ফেলিয়াছে আজি চারিধার!
গৃহের বনিতা ছিলে—টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়,—
তবু কোন্ মায়াডোরে চির সোহাগিনী
হৃদয়ে দিয়েছ ধরা, বিচিত্র রাগিণী।
জাগায়ে তুলেছ প্রাণে চির স্মৃতিময়!
তাইত এখনো মনে আশা জেগে রয়
আবার তোমারে পাব পরশ বন্ধনে!
এমনি সমস্ত বিশ্ব প্রলয়ে-সৃজনে
জ্বলিছে নিবিছে, যেন খদ্যোতের জ্যোতি!
কখনো বা ভাবময়, কখনো মূরতি।"

যাহাকে ভালবাসি তাহার দেহ আছে, দেহে লাবণ্য আছে, কান্তি আছে, সৌন্দর্য্য আছে, তবু সে দেহ যেন দেহ নয়, তাহা যেন মর্ম্মের প্রীতিরসের অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী রচনা। সমস্ত প্রকৃতিতে যাহা কিছু সুন্দর আছে, যাহা লইয়া আমাদের কবিকল্পনা আমাদিগকে সৌন্দর্য্য-লোকের মধ্যে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে—তাহাই যেন তাহার স্বরূপ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের যে প্রণয় ও রতির কথার উল্লেখ আছে তাহাতে দেখা যায় যে সেই রতি দেহজ রতি নয়, তাহা অপ্রাকৃত রতি, অপ্রাকৃত বিহার। তাহার স্থান পৃথিবী নহে—গুপ্ত বৃন্দাবন। ভক্তেরা তাঁহাদের পার্ষদ-স্বরূপ হইয়া কৃষ্ণমুখে সেই অপ্রাকৃতলীলার আস্বাদন করেন। রবীন্দ্রনাথের "মানসসুন্দরী" কবিতাটিতে দেখা যায় প্রত্যেক নরনারীর প্রীতির মধ্যে এই একটি অপ্রাকৃত স্বরূপ আছে। এই অপ্রাকৃত স্বরূপের সঙ্গে যিনি বিগ্রহধারিণী তিনি কবির কল্পনার মধ্যে সৌন্দর্য্যের উৎসস্বরূপিণী হইয়া কল্পনাধারার ভাগীরথীস্রোতে আপনাকে প্রবাহিত করিয়া তুলিতেছেন, এবং সেই তরঙ্গের মধ্যে, সেই উর্ম্মিমালার মধ্যে ভাসিয়া উঠিতেছে নারী। নারী শুধু নর্ম্মসহচরী নন, তিনি কল্পমূর্ত্তি মর্ম্ম-সহচরী। কল্পনা হইতে বহির্লোকে ও বর্হির্লোক হইতে কল্পনালোকে, কাল হইতে কালান্তরে, যুগ হইতে যুগান্তরে, এই অশরীরী কল্পলোক-বিহারিণীর অবাধগতি, তাই তিনি শরীরিণী হইয়াও শরীর-হীনা, শরীর-হীনা হইয়াও শরীরিণী। প্রেমের বিদ্রাবণ-শক্তিতে মূর্ত্তও অমূর্ত্তরূপে প্রকাশ পায়, অমূর্ত্তও মূর্ত্তরূপে প্রকাশিত হয়।—

> The glory of her being, issuing thence,
> Stains the dead, blank, cold air with a
> warm shade
>
> Of unentangled intermixture, made
> By Love, of light and motion ; one intense
> Diffusion, one serene omnipresence,
> Whose flowing outlines mingle in their
> owing,

Around her cheeks and utmost fingers
glowing
With the unintermitted blood, which there
Quivers (as in a fleece of snow-like air
The crimson pulse of living morning quiver,
Continuously prolonged, and ending never,
Till they are lost, and in that Beauty furled
Which penetrates and clasps and fills the world;

* * *

See where she stands! a mortal shape indued
With love and life and light and deity,
And motion which may change but cannot die;
An image of some bright Eternity;
A shadow of some golden dream; a Splendour
Leaving the third sphere pilotless; a tender
Reflection on the eternal Moon of Love,
Under whose Motions life's dull billows move.

—Epipsychidion.

শরীরসঙ্গের গভীর গাঢ়-স্পর্শের মধ্য দিয়া প্রেম যে আদি-অন্তহীন অশরীর উদার গভীরতার মধ্যে ডুবিয়া যাইতে পারে, তাহার পরিচয় "হৃদয় যমুনা" কবিতাটির মধ্যে পাওয়া যায়। অভিনবগুপ্তের প্রত্যভিজ্ঞান দর্শনগ্রন্থের মধ্যে নানা স্থানে ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া অতীন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিবার কথা লিখিত আছে। "হৃদয় যমুনাতে" কবি বলিতেছেন—

যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাও সলিল মাঝে,
স্নিগ্ধ, শান্ত সুগভীর, নাহি তল নাহি তীর,
মৃত্যু সম নীল নীর স্থির বিরাজে।

নাহি রাত্রি, দিনমান, আদি অন্ত পরিমাণ
যে অতলে গীত গান কিছু না বাজে,
যাও সব যাও ভুলে, নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এসো কূলে সকল কাজে।

"প্রেমের অভিষেক" কবিতাটিতে কবি বলিতেছেন যে, প্রেম যে মহিমার শিখা আমাদের ললাটে অাঁকিয়া দেয়, তাহাতে আমাদের অন্তর্লোক আলোকিত হইয়া উঠে—

সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে নাহি পায় পথ
যে অন্তর অন্তঃপুরে।

সেখানে অবস্থিত থাকিয়া অজয় বীণায় দূর-দূরান্তর হইতে দেশবিদেশের ভাষায়, যুগযুগান্তরের দিবস-নিশীথের মিলন-বিরহের গাথা তৃপ্তিহীন, শ্রান্তিহীন, আগ্রহের উৎকণ্ঠিত তানে ধ্বনিত হইয়া উঠে। সেখানে ভাসিয়া উঠে করতললীনা ধ্যানরতা শকুন্তলার মুখ—পুরুরবার দুঃসহ বিরহগীত, তপস্বিনী মহাশ্বেতার অন্তর বেদনার রাগিণী, হরপার্ব্বতীর মিলনের গীতি। সেইখানে আমরা অক্ষয় যৌবনে দেবতার তুল্য হইয়া উঠি। নিখিল প্রণয়িজনের লাবণ্যমহিমা আমাদের বদন-মণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলে। সেখানে আমরা রবি-চন্দ্র-তারার সভাসদ্ হইয়া তারালোকের সঙ্গীত শুনিতে পাই এবং সর্ব্বচরাচর আমাদের চিরসুহৃদ হইয়া উঠে।

তোমার অাঁখির দৃষ্টি, সর্ব্ব দেহ-মন
পূর্ণ করি; রেখেছে যেমন সুধাকর
দেবতার গুপ্ত সুধা যুগযুগান্তর
আপনারে সুধাপাত্র করি; বিধাতার
পুণ্য অগ্নি জ্বালায়ে রেখেছে অনিবার

সবিতা যেমন সযতনে ; কমলার
চরণ-কিরণে যথা পরিয়াছে হার
সুনির্ম্মল গগনের অনন্ত ললাট !
হে মহিমময়ী মোরে করেছ সম্রাট।

এই কবিতাটি হইতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিয়াছিলেন যে, একটি নারীপ্রীতি হইতে যে অন্তর-জাগরণ উপস্থিত হয় তাহার ফলে আমাদের চিত্তের যে অন্তরোন্মেষ হয় তাহাতে সমস্ত বিশ্ব-জগতের বন্ধন যেন দূর হইয়া যায়। বিশ্বচরাচর আমাদের সুহৃদ হইয়া উঠে এবং সমস্ত কালের নরনারীর সহিত আমাদের একটি পরম সৌখ্যের অনুভব ঘটে। এই ভাবটিই 'চিত্রার' অন্য আর একটি কবিতায় উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, গ্রন্থ হইতে আমরা যাহা শিখি তাহা বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা মাত্র। প্রেমের মধ্য দিয়া আমাদের হৃদয়ে যাহা আসে তাহা মৌন হইলেও গভীর ও ব্যাপক।

"কি জানি কেমন ক'রে, লুকায়ে দাঁড়ালে
একটি ক্ষণিক ক্ষুদ্র দীপের আড়ালে
হে বিশ্বব্যাপিনী লক্ষ্মী ! মুগ্ধ কর্ণপুটে
গ্রন্থ হ'তে গুটিকত বৃথা বাক্য উ'ঠে
আচ্ছন্ন করিয়াছিল কেমনে না জানি
লোক-লোকান্তর পূর্ণ তব মৌন বাণী।"

নারী-প্রীতির মধ্যে যে বিশ্বের সমস্ত বাসনা নানা ভাবে আপনাকে নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে, "উর্ব্বশী" কবিতাটিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

"স্বর্গের উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী তুমি হে উষসী,
হে ভুবনমোহিনী উর্ব্বশি।
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণশোণিমা,

মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।
অখিল মানস-স্বর্গে অনন্ত রঙ্গিণী,
হে স্বপ্ন-সঙ্গিনি।

"বিজয়িনী" কবিতাটিতে নারীমূর্ত্তি আঁকিতে গিয়া কবি নারীদেহের সৌন্দর্য্যের আলম্বন ও উদ্দীপন-বিভাবকে নানা ভঙ্গিমার মধ্য দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কবি বলিতেছেন যে কামদেব তাঁহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া পুষ্পশর হাতে লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহার পুষ্পধনু পুষ্পশর পূজার উপহাররূপে তাঁহার চরণপ্রান্তে উপহার দিলেন এবং তাঁহার প্রশান্ত দৃষ্টির সম্মুখে তাঁহার সমস্ত বীর্য্য নিভিয়া গেল।

ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদুমন্দ হাসি'
উঠিল অনঙ্গ দেব।
সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমিপরে
জানু পাতি' বসি, নির্ব্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদন পানে
চাহিল সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

সমস্ত কামকে জয় করিয়া সমস্ত বিলাস-ভঙ্গিমার উপরে সমস্ত দেহলাবণ্যকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার মহীয়সী মূর্ত্তিতে কবি নারীর সাক্ষাৎলাভ করিলেন।

'সিন্ধু পারে' কবিতাটিতে অবগুণ্ঠিতা রমণীর আকর্ষণে বহুদূর ভ্রমণ করিয়া, জীবনের বহু বিচিত্র ব্যাপারের মধ্য দিয়া আসিয়া যথার্থ লগ্নে কবি রমণীর অবগুণ্ঠনখানি মোচন করিলেন।

"সুধীরে রমণী দুবাহু তুলিয়া—অবগুণ্ঠনখানি
উঠায়ে ধরিয়া মধুর হাসিল মুখে না কহিয়া বাণী।
চকিতে নয়ানে হেরি মুখপানে পড়িনু চরণ তলে—
"এখানেও তুমি জীবন দেবতা"। কহিনু নয়নজলে।
সেই মধু মুখ, সেই মৃদু হাসি, সেই সুধাভরা আঁখি
চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল, চিরদিন দিল ফাঁকি!"

এই কবিতাটি হইতে দেখা যায় যে, জীবনদেবতার যেমন নানা বিলাসলীলা আমাদের চিত্তের মধ্যে নানা শিহরণ জাগাইয়া তুলে অথচ তাঁহার নিজের রূপটি সর্ব্বদাই আমাদের দৃষ্টিকে এড়াইয়া যায়, নারীও তেমনি যেন আমাদের জীবন-দেবতা হইয়া রহিয়াছেন। তাহার প্রেম সম্ভোগ করিতে গিয়া নানা বিলাস-বিভ্রমের ছটার মধ্যে আমরা আমাদিগকে হারাইয়া ফেলি। কিন্তু আমাদের অন্তরঙ্গ উৎসরূপে বিরাজমান, আমাদের সকল শক্তির প্রস্রবণরূপে মূর্ত্তিমতী সৌন্দর্য্যবাসনারূপে অনন্তের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপে যে যথার্থ নারীমূর্ত্তি রহিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাই না।

কবি এই ভাবটী "চৈতালীর" অনেক কবিতাতে প্রকাশ করিয়াছেন। একটি কবিতাতে তিনি বলিতেছেন—

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী!
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য্য সঞ্চারি

*　　*　　*

লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ,
তোমারে দুর্ল্লভ করি করেছে গোপন।

পড়েছে তোমার পরে প্রদীপ্ত বাসনা,
অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা।

আর একটি কবিতাতে কবি লিখিতেছেন,

তুমি এ মনের দৃষ্টি, তাই মনোমাঝে
এমন সহজে তব প্রতিমা বিরাজে।
যখন তোমারে হেরি জগতের তীরে
মনে হয় মন হতে এসেছে বাহিরে।
যখন তোমারে দেখি মনোমাঝখানে
মনে হয় জন্ম জন্ম আছ এ পরাণে।
মানসীরূপিণী তুমি তাই দিশে দিশে
সকল সৌন্দর্য্য সাথে যাও মিলে মিশে

মনের অনন্ত তৃষ্ণা মরে বিশ্ব ঘুরি,
মিশায়ে তোমার সাথে নিখিল মাধুরী।
তার পরে মনগড়া দেবতারে মন
ইহকাল পরকাল করে সমর্পণ।

আর একটি কবিতাতে তিনি বলিতেছেন—

"তোমার মহিমাজ্যোতি তব মূর্ত্তি হ'তে
আমার অন্তরে পড়ি ছড়ায় জগতে।

* * *

তুমি এলে আগে আগে দীপ ল'য়ে করে,
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।"

আর একটি কবিতাতে বলিতেছেন—

"যত ভালবাসি যত হেরি বড় করে'
তত, প্রিয়তমে, আমি সত্য হেরি তোরে।

নিত্যকাল মহাপ্রেম বসি বিশ্বভূপ
তোমামাঝে হেরিছেন আত্মপ্রতিরূপ।"

এই কবিতাগুলি পড়িলে বুঝা যায় যে কবি অনুভব করিয়াছেন, নারীকে লইয়া আমাদের যে প্রীতি, তাহা দেহপিণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ লালসার ক্ষীণ দীপশিখা নহে; সূর্য্যের দীপ্তির ন্যায় তাহা ভাস্বর। বিশ্বধাতার প্রেমপ্রস্রবণে যে সৌন্দর্য্যমূর্ত্তির আত্মবিকাশে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে—নারী তাহারই প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ। আমাদের অন্তরের মধ্যে বিশ্বধাতা তাঁহার চিরমঙ্গল-জ্যোতিতে স্নাত ও অভিষিক্ত হইয়া প্রেমমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। সেই প্রেমের ভাস্বর দীপ্তি আমাদের মধ্যে নানা আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। দেহের আবরণের মধ্য দিয়া যখন তাহা প্রতিফলিত হইয়া প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে আমরা রূপতৃষ্ণার মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু এই রূপতৃষ্ণা একটি স্বতন্ত্র তৃষ্ণা নহে। ইহা আমাদের আত্মার আপন অনন্তস্বরূপের একটি শান্ত প্রতিধ্বনিমাত্র। তাই ক্ষুদ্র রূপতৃষ্ণাকে যতই আমরা অতিক্রম করিতে থাকি ততই প্রেমের মহিমময়ী মূর্ত্তি তাহার আপন সত্তায় আমাদিগের নিকট আত্মপ্রকাশ করে। যতই নারী তাহার দেহকে অতিক্রম করিয়া তাহার সাজসজ্জা, অঙ্গসৌষ্ঠব, বিলাস-বিভ্রমকে অতিক্রম করিয়া, এমন কি তাহার শান্ত মঙ্গলদায়িনী বিশুদ্ধ স্নেহমূর্ত্তিকেও অতিক্রম করিয়া, তাহার আপন স্বরূপের মহিমায় আমাদের অন্তরকে ব্যাপ্ত করিয়া তুলে ততই মনে হয় নারী বাহিরের নয়—নারী অন্তরের। নারীমূর্ত্তিকে অবলম্বন করিয়া আমাদের অন্তরের প্রেমধাতু যখন তাহার প্রকৃত পরিচয়ের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলে, তখন তাহা অনাদি অনন্তকালের প্রকৃতির সমস্ত

গান, সমস্ত ছন্দ, সমস্ত সুষমা, সমস্ত সামঞ্জস্যের সহিত একতানে মিলিত হয় এবং অনন্তের দিকে আমাদের হৃদয়ের যে অভিনর্ত্তন, তাহার গতিস্বরূপ হইয়া আমাদের আত্মাকে সার্থক করিয়া তুলে। সহজিয়া ও বাউল সম্প্রদায়ে নারী-প্রীতির যে মর্ম্ম কথা—'Epipsychidion'-এ নারীপ্রীতির যে গভীর নিবেদন, তাহার সহিত কবির আত্মোপলব্ধির একটি গভীর ঐক্য আছে। কিন্তু সহজিয়াবাদের উদ্দেশ্য ছিল নারীপ্রীতিকে উপায়স্বরূপ করিয়া সেই রস-সম্ভোগের নিরাভরণতা ও নিঃসীমতা দ্বারা আত্মার প্রেমস্বরূপকে উপলব্ধি করা। কিন্তু কবির কোন সাধনপদ্ধতি নাই, তাঁহার আত্মা কোন একটি বিরাট পুরুষের মধ্যে নিজের হৃদয়গুহার অভ্যন্তরে অবস্থিত নহে, তাহা বিশ্বতোমুখী, বিশ্বতঃ সঞ্চারী, এবং বিশ্বব্যাপক। তাই কবির নারীপ্রীতি যেন তাহার অন্তরের ভাস্বর মূর্ত্তিতে প্রভাযুক্ত হইয়া বহির্জগতে প্রকাশলাভ করিয়াছে। সেই প্রকাশের দীপ্তিতে বিশ্বচরাচরের সহিত আপনার পরিচয়কে আপনার আনন্দকে কবি তাহার প্লাবক-মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। রবি-চন্দ্র-তারার সহিত মিলিত হইয়া কবি তাহাদের সঙ্গীত আপন হৃদয়ের সঙ্গীতে শ্রবণ করিতেছেন; তাহাদের নৃত্যতালের সহিত আপনার গতিছন্দকে সম্মিলিত করিতেছেন; যুগ-যুগান্তের, দেশদেশান্তের নরনারীর প্রাণের সহিত আপন প্রাণকে এক করিয়া দেখিতেছেন। এই প্রেম আত্মগুহায় ফিরিয়া যাইবার প্রেম নহে। তাহা আত্মগুহা হইতে বাহির হইয়া জগতের সহিত মিলিত হইবার প্রেম। ইহা সেই প্রেম, যাহাতে তৃণশষ্প হইতে আরম্ভ করিয়া জগৎপিতা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; যাহাতে প্রকৃতিলোক ও নরলোক বিধৃত হইয়া রহিয়াছে—

"True love in this differs from gold and clay,
That to divide is not to take away,
Love is like uuderstanding, that grows bright,
Gazing on many truths; 'tis like thy light,
Imagination! which from earth and sky,
And from the depths of human fantasy,

As from a thousand prisms and mirrors, fills
The Universe, with glorious beams, and kills
Error, the worm, with many a sun like arrow
Of its reverberated lightning. Narrow
The heart that loves, the brain that contemplates,
The life that wears, the spirit that creates,
One object, and one form and builds thereby
A sepulchre for its eternity."

মানুষের চিত্ত স্বতঃপ্রবাহশীল, স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু দেহের বন্ধনে, জৈবিক প্রয়োজন ও তাহার সহিত সম্বন্ধে সামাজিক জীবনে নানা বন্ধন, আবরণ ও সীমার মধ্যে এই স্বতঃস্ফূর্ত চিত্তধারা আপনার অবাধগতিতে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না। যোগী বলেন যে এই চিত্তধারাকে তাহার ধারাপ্রবন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কোন একটি বস্তুর মধ্যে তাহার সহস্রগতিকে নিরুদ্ধ করিলে, আলম্বনীভূত বস্তু যোগমার্গের প্রসারের সহিত যেমন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিতে থাকে তেমনি চিত্তধারা তাহার স্বাভাবিক ধারাগতি হইতে স্থিতিপদবী লাভ করে। ধারাগতি চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সেই গতির বিলোপ হইলে চিত্ত বিনষ্ট ও বিধ্বস্ত হয় এবং তাহার ফলে চিত্ত হইতে বিনির্ম্মুক্ত চিৎস্বরূপ পুরুষ আপন কৈবল্যে বিরাজ করেন। প্রেমিক বলেন—

"চক্ষু কর্ণ বুদ্ধি মন সব রুদ্ধ করি
বিমুখ হইয়া সর্ব্ব জগতের পানে
শুদ্ধ আপনার ক্ষুদ্র আত্মাটিরে ধরি,
মুক্তি আশে সন্তরিব কোথায় কে জানে!

* * *

বহে যাবে শূন্য পথে সকরুণ স্বরে
অনন্ত জগৎভরা যত দুঃখ শোক
বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসি রব মুক্তি সমাধিতে!"

তাই প্রাচীন মুক্তিপথে প্রেমিকের কোন উৎসাহ নাই। তিনি অনুভব করেন যে চিত্তধারার মুক্তি তাহার আপন ব্যাপক ধারাস্বভাবের মধ্যে। সে মুক্তির বন্ধন জৈবজীবনের শত সহস্র আবরণ ও আকর্ষণ। কিন্তু সেই ধারাস্বভাবের মধ্যে প্রেমের যে প্রচ্ছন্নমূর্ত্তি রহিয়াছে সেই মূর্ত্তি যদি আত্মপ্রকাশ ও আত্ম-পরিচয় লাভ করিতে পারে তাহা হইলে তাহার ধারাস্বভাব তাহার আপন ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া বিশ্বমৈত্রীতে জগন্ময় ব্যাপ্ত হইতে পারে। বিশ্বমৈত্রীর মুখে এই যে ব্যাপ্তি তাহাকেই বলে ব্রহ্মবিহার। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারিটি এই ব্রহ্মবিহারের মধ্যে আপনাদের পরিচয় লাভ করে। যে আবরণ আমাদের চিত্তধারার স্বাভাবিক প্রসারকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সে আবরণ ভাঙ্গিবার উপায় সেই আবরণের মধ্যেই রহিয়াছে। জৈব আকর্ষণের বশে যখন আমরা রূপ-লালসায় নারীর দিকে আকৃষ্ট হই, তখন দৈহিক আবরণের মধ্য দিয়া প্রেম আপনাকে কামরূপে প্রকাশ করে। কিন্তু এই আবরণকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রেম যতই প্রসার প্রাপ্ত হয়, ততই এই আবরণের বাঁধকে ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহা একটি আপ্লাবনের সৃষ্টি করে। এই আপ্লাবনের মধ্যেই আমরা নারীকে একদিকে যেমন আমাদের আত্মার অঙ্গীভূত, আত্মার সহিত একাত্মভূত বলিয়া অনুভব করিতে পারি, অপরদিকে তেমনি সেই আপ্লাবনের একাত্মীকরণের দ্বারা যুগযুগান্তরের নরনারীর সহিত, স্থাবর-জঙ্গমের সহিত, গ্রহ-চন্দ্রের সহিত, আমাদের যে একটি সহজ নাড়ীর যোগ রহিয়াছে, সেই যোগকে অনুভব করিয়া প্রেম-প্রেরণার দ্বারা চিত্তধারাকে সর্ব্বতঃ প্রসারিত করিতে পারি। চিত্তধারার এই সর্ব্বত্র প্রসারণই আমাদের চিত্তের মুক্তি। একটি হৃদয়ের নিকট আমাদের সমস্ত আবরণ আমরা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া দিতে পারি। আমাদের সমস্ত মোহ-অভিমান, পদগর্ব্ব, জাতিগর্ব্ব, সমাজ-সংস্থানের নানা গ্রন্থি-বন্ধনের সঙ্কীর্ণতাকে যদি খণ্ডিত করিয়া দিতে পারি তবে সেই আবরণভঙ্গের দ্বারা আমাদের সমস্ত হৃদয়-গ্রন্থি উন্মুক্ত হইয়া যায়। উপনিষদে আছে—

"ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥"

পর ও অবরকে লইয়া যিনি রহিয়াছেন তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিলে আমাদের সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি ত্রুটিত হইয়া যায়; সমস্ত সংশয় বিলীন হয়, সমস্ত কর্ম্মাশয় ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু প্রেমিক বলেন যে, প্রেমের প্রেরণায় যখন সমস্ত গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় দূর হইয়া যায়, তখনই যে বিরাট সত্তা পর ও আত্মাকে লইয়া রহিয়াছে তাহা আমাদের উপলব্ধিগোচর হইয়া উঠে; ইহাতে দেহের আকর্ষণকে দমন করিবার কোন কথা নাই; লাবণ্য বনকে উপভোগ করিবার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি নাই। ইহার মর্ম্মকথা এই যে, যখন প্রেমের আপ্লাবন আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন এই সমস্ত আকর্ষণ থাকিয়াও নাই হইয়া যায়। সর্ব্বত্র সংপ্লাবন হইলে কূপের কূপত্ব থাকে না, নদীর নদীত্ব থাকে না, পুষ্করিণীর পুষ্করিণীত্ব থাকে না—এক বিরাট প্রসারের মধ্যে সমস্তই অবিভক্ত হইয়া অবস্থান করে ও তাহাকে আপূরণ করে কিন্তু তাহাকে সঙ্কীর্ণ করিতে পারে না। প্রেম এক হিসাবে Anti-biological বা জৈবগতি বিরোধী। কাম biological বা জৈববন্ধনে আবদ্ধ। জৈববন্ধনের মধ্যে মানুষ আবদ্ধ। যদি সে বন্ধনের কোন মুক্তির পথ থাকে তবে সে পথও এই বন্ধনের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। তাই কাম প্রেমের বিরোধী হইলেও কামকে অবলম্বন করিয়াই প্রেম উৎপন্ন হয়, পঙ্কে পঙ্কজের উৎপত্তি, অথচ পঙ্ক থাকে গভীর জলের মধ্যে ক্লিন্নতায় অবসন্ন হইয়া, আর পঙ্কজ মৃণালদণ্ডের উপর ভর করিয়া, পঙ্কে নিরুঢ়মূল হইয়া সূর্য্যের দিকে, বিশ্বের দিকে, আপন বদন-মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া, আপন-সৌরভে বিশ্বের রস আপনাদের মধ্যে অনুভব করে। কোন একটি হৃদয়ের নিকট যখন সমস্ত আবরণ প্রেমের উত্তাল-তরঙ্গে ভিন্ন হইয়া যায়, তখন সমস্ত হৃদয়-গ্রন্থি শিথিল হইয়া আসে এবং সেই শিথিল বন্ধনের মধ্য দিয়া মুক্তিধারার আনন্দ উপচিয়া উঠিতে থাকে। যে কাম মানুষকে দেহের দিকে টানে তাহার যদি বেগ থাকে, দীপ্তি থাকে, প্রেরণা থাকে, তবে তাহা দেহের আবরণের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। দেহের আনন্দ তাহার সহিত মিলিত হইতে পারে; কিন্তু যে প্রেম দেহের বাঁধ ভাঙিয়াছে

তাহার কাছে দেহের আকর্ষণের সীমা কোন সঙ্কীর্ণতা আনিতে পারে না। আমাদের দেশের প্রাচীন দার্শনিকরা অনেক সময়ে বলিয়াছেন যে, শুধু ইন্দ্রিয়ের যে আনন্দ তাহাও যখন গভীর হইয়া উঠে, তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের সীমাকে অতিক্রম করে। আমরা যাহাকে কাম বলি তাহা যখন অন্তরেরই আকর্ষণ তখন তাহা গভীর হইলে যে দেহের সীমাকে লঙ্ঘন করিবে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। কবি একদিকে উপলব্ধি করিয়াছেন যে, যুগল-প্রীতির মধ্যে বিশ্ব-চরাচরের আনন্দ এক হইয়া গিয়াছে এবং যুগল-মূর্ত্তি একলোলভাবাপন্ন হইয়াছে এবং অপরদিকে অনুভব করিয়াছেন যে নারী বাহিরের নহে; অন্তরের পরিকল্পনা, অন্তরের আকর্ষণ, অন্তরের প্রেমই নারীরূপে বহির্জগতে প্রতিভাত হইয়াছে। কিন্তু প্রেমের এই অদ্বৈত তত্ত্বের মধ্যেই তাহার বিশ্রাম নহে, আলম্বন-উদ্দীপনবিভাবের ও নানা অনুভবের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা আসিয়া সে বিশাল তরঙ্গের মধ্যে আপনাদের বিচিত্র বর্ণসত্তায় প্রতিফলিত করিয়া তুলিয়াছে।

বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে
আমার নিভৃত নবজীবন পরে।
প্রভাত কমল সম ফুটিল হৃদয় মম,
কার দু'টি নিরুপম চরণ ভরে।
জেগে উঠে সব শোভা, সব মাধুরী,
পলকে পলকে হিয়া পুলকে পূরি'।
কোথা হ'তে সমীরণ আনে নব জাগরণ
পরাণের আবরণ মোচন করে।
বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে।
লাগে বুকে সুখে দুঃখে কত যে ব্যথা
কেমনে বুঝায়ে কব না জানি কথা।
আমার বাসনা আজি ত্রিভুবনে উঠে বাজি,
কাঁপে নদী বনরাজি বেদনাভরে।
বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে।

নারীর মধ্যে এই যে মূর্ত্তি রহিয়াছে তাহার বলে বিশ্বের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সমগ্র অন্তর যে আমাদের মধ্যে প্রস্ফুরিত হইয়া উঠে এইখানেই তিনি বিদ্যারূপিণী সরস্বতী। আর যে মূর্ত্তিতে তিনি নিখিল বিশ্বের সৌন্দর্য্যরূপে আমাদের কল্যাণময়ীরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাহা তাঁহার লক্ষ্মীমূর্ত্তি। "স্মরণে" তিনি লিখিয়াছেন—

"হে লক্ষ্মী তোমার আজি নাই অন্তঃপুর!
সরস্বতীরূপ আজি ধরেছে মধুর,
দাঁড়ায়েছ সঙ্গীতের শতদল-দলে।
মানস-সরসী আজি তব পদতলে
নিখিলের প্রতিবিম্বে রচিছে তোমায়।"
"যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি;
যে ভাবে সুন্দর তিনি সর্ব্ব চরাচরে,
যে ভাবে আনন্দ তাঁর প্রেমে খেলা করে,—
যে ভাবে লতায় ফুল, নদীতে লহরী,
যে ভাবে বিরাজে লক্ষ্মী বিশ্বের ঈশ্বরী

* * *

হে রমণী ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য আভাসে।"

"দুই নারী"—কবিতায় দেখিতে পাই—

একজন তপোভঙ্গ করি,—
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি'
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি,
দুহাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে
রাগ-রক্ত কিংশুক গোলাপে
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

আর জন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির-স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়;
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায়;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্ব্বাদ পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্য সুধায় মধুর।
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবন-মৃত্যুর
পবিত্র সঙ্গমতীর্থ তীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।"

'মালিনী' নাটকে দেখা যায় যে, ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয় দুই বন্ধু ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বিরোধী সর্ব্বজীবে দয়ামূলক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের জন্য কাশীরাজকন্যা মালিনীকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিতে উদ্যত হন। ক্ষেমঙ্কর এই প্রচেষ্টায় বিফল-মনোরথ হইয়া অন্যদেশ হইতে সৈন্য আনিয়া কাশীরাজকে উৎখাত করিতে কৃতোদ্যম হন, কিন্তু মালিনীকে প্রেম-দৃষ্টিতে দেখিয়া সুপ্রিয় তাহার মনে সর্ব্বজীবে দয়া-ধর্ম্মের সারবত্তা বুঝিতে পারেন এবং ক্ষেমঙ্করের চেষ্টা ব্যর্থ করেন। ক্ষেমঙ্কর বন্দীবেশে রাজসভায় আনীত হন। বন্দীবেশে আনীত ক্ষেমঙ্কর বলেন যে, রাজকুমারী মালিনীর প্রতি আমারও প্রীতিরস জাগিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু কর্ত্তব্যের কঠোরতায় তিনি তাহা সকলের সম্মুখে নিষ্কাসিত করিয়াছেন, কিন্তু সুপ্রিয় প্রেমের অছিলায় গার্হস্থ্য-ভোগ-সম্ভোগের ব্যবস্থা করিয়া ক্ষেমঙ্করের প্রতি প্রেমের বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন—এই বলিয়া তাহাকে ধিক্কার দেন। পরে সুপ্রিয় বলেন—

"হে দেবি! তোমারি জয়! নিজ পদ্মকরে
যে পবিত্র শিখা তুমি আমার অন্তরে

জ্বালায়েছ—আজি হ'ল পরীক্ষা তাহার—
তুমি হ'লে জয়ী! সর্ব্ব-অপমানভার
সকল নিষ্ঠুর ঘাত করিনু গ্রহণ!
রক্ত উচ্ছুসিয়া উঠে উৎসের মতন
বিদীর্ণ হৃদয় হতে,—তবু সমুজ্জ্বল
তব শাস্তি, তব প্রীতি, তব সুমঙ্গল
অম্লান অচল দীপ্তি করিছে বিরাজ
সর্ব্বোপরি! ভক্তের পরীক্ষা হ'ল আজ,
জয় দেবি!—ক্ষেমঙ্কর, তুমি দিবে প্রাণ,—
আমার ধর্ম্মের লাগি করিয়াছি দান
প্রাণের অধিক প্রিয় তোমার প্রণয়,
তোমার বিশ্বাস! তার কাছে প্রাণভয়
তুচ্ছ শতবার!"

ক্ষেমঙ্করও বুঝিয়াছিলেন যে কাশীরাজকুমারীর মূর্ত্তি ধরিয়া অনাদি ধর্ম্ম তাহাকে স্নেহপ্রেমের দিকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু তিনি সবলে সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া শাস্ত্রগ্রন্থে যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে তাহারই অনুসন্ধানে বাহির হইয়া অনেক দুঃখ ক্লেশকে বরণ করিয়াছিলেন। কচ ও দেবযানীর উপাখ্যানে দেখিতে পাই যে কচও এই কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্রেরণায় দেবযানীর প্রেমকে উপেক্ষা করিয়া দেবকার্য্যে স্বর্গরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন—

স্বর্গ আর স্বর্গ বলে'
যদি মনে নাহি লাগে, দূর বনতলে
যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধ মৃগসম,
চির-তৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম
সর্ব্বকার্য্য মাঝে—তবু চলে যেতে হবে
সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে!"

কিন্তু দেবযানীর কামনা স্বর্গের কামনা। তাই ভোগকে উপেক্ষা করিয়া প্রেমকে বক্ষে লইয়া কচের স্বর্গ-রাজ্যে প্রয়াণ যথার্থ প্রেমিকেরই অনুরূপ হইয়াছে। কামগন্ধহীন গভীর প্রেম যেখানে জাগে, সেখানে কর্ত্তব্যে ও প্রেমে কোন দ্বন্দ্ব আসে না। চির-বিরহের মধ্যে সেখানে চির-মিলন জাগ্রত থাকে। কারণ সেই প্রেম সরস্বতীরূপিণী নারীকে আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া তুলে এবং ব্রহ্মবিহারের মধ্যে আমাদিগকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দেয়। তাই "মালিনী" নাটকে সুপ্রিয় বলিতেছেন—

"সত্য বুঝিয়াছ সখে।
মোর ধর্ম্ম অবতীর্ণ দীন মর্ত্ত্যলোকে
ওই নারীমূর্ত্তি ধরি! শাস্ত্র এতদিন
মোর কাছে ছিল অন্ধ জীবন-বিহীন;
ওই দুটি নেত্রে জ্বলে সে উজ্জ্বল শিখা—
সে আলোকে পড়িয়াছি বিশ্বশাস্ত্রে লিখা—
যেথা দয়া সেথা ধর্ম্ম, যেথা প্রেমস্নেহ,
যেথায় মানব, যেথা মানবের গেহ।
বুঝিলাম, ধর্ম্ম দেয় স্নেহ মাতারূপে,
পুত্ররূপে স্নেহ লয় পুনঃ;—দাতারূপে
করে দান দীনরূপে করে তা' গ্রহণ,—
শিষ্যরূপে করে ভক্তি, গুরুরূপে করে
আশীর্ব্বাদ; ক্রিয়া হয়ে পাষাণ অন্তরে
প্রেম-উৎস লয় টানি, অনুরক্ত হয়ে
করে সর্ব্ব সমর্পণ! ধর্ম্ম বিশ্বলোকালয়ে
ফেলিয়াছে চিত্তজাল,—নিখিল ভুবন
টানিতেছে প্রেম ক্রোড়ে—সে মহাবন্ধন
ভরেছে অন্তর মোর আনন্দ বেদনে

চাহি ওই উষারুণ করুণ বদনে।
ওই ধর্ম্ম মোর!"

এই কথা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে প্রিয়াপ্রেম মানুষের মধ্যে প্রেম-উৎসকে নির্ঝর ধারায় প্রবাহিত করিয়া প্রেমের মূর্ত্তিতে, কল্যাণের মূর্ত্তিতে বিশ্বময় ব্যাপ্ত করিয়া ফেলে। এখানেই সরস্বতী ও লক্ষ্মীর বা উর্ব্বশী ও লক্ষ্মীর মিলন। প্রাচীন পুস্তকের জীর্ণ ধর্ম্ম সহজ প্রেমের গতিতে তাহার ধূলিধূসর আবরণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া তাহার যথার্থ ব্রহ্মস্বভাবকে আত্মার মধ্যে প্রতিভাত করে। প্রেমের এই মহীয়সী শক্তি হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিয়া সুপ্রিয় অনায়াসে তাহার বন্ধুর সম্মুখে, তাহার প্রিয়ার সম্মুখে, মৃত্যুর দ্বারের মধ্যেই অমৃতকে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অধিষ্ঠাত্রীদেবীর জয়গান করিয়া দেহান্তে অনন্তকে আশ্রয় করিলেন ও সেই প্রেমের বলেই মালিনী ক্ষেমঙ্করকে ক্ষমা করিল।

মহুয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রেমের যে স্বরূপের আমরা পরিচয় পাই, তাহাতে দেখা যায় অন্তর-গুহাবর্ত্তী আত্মস্বরূপ প্রেমধাতু আমার অন্তরের মধ্যে নিবদ্ধ না থাকিয়া বহিঃ-প্রকৃতির মধ্যে ও নরলোকের পরম মৈত্রীর মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। প্রেম একদিকে যেমন আত্মোপলব্ধির সোপান ও প্রকাশ, অপরদিকে তেমনি বহির্জগতের সহিত, নরলোকের সহিত আপন অন্তরঙ্গতা অনুভবের উপায়। কিন্তু প্রায় অধিকাংশ কবিতাতেই পুরুষের দিক হইতে প্রেমের আত্মপরিচয় দিবার জন্যই যেন কবি ব্যস্ত। নারীর প্রেম তাহার আপন স্বাধীনতায় ও স্বতন্ত্রতায় যেভাবে আত্মপরিচয় দেয়, তাহার কোনো সন্ধান মহুয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যগ্রন্থে স্ফুট হইয়া উঠে নাই। চিরপ্রাণময়ী প্রকৃতির মধ্যে ও নবজাগরণময়ী নারীর মধ্যে প্রেম কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করে মহুয়াতেই আমরা তাহার প্রথম পরিচয় পাই।

কান্তা-প্রেম—মহুয়া

কাম ও প্রেমের যে দ্বন্দ্ব লইয়া রবীন্দ্রনাথ আরম্ভ করিয়াছিলেন সে দ্বন্দ্ব আমাদের অন্তর-বাহিরের দ্বন্দ্ব। আত্মা ও দেহের দ্বন্দ্ব। সে দ্বন্দ্বে পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাচীন পন্থায় ত্যাগধর্ম্মকে প্রধান করিয়া বৈরাগ্যের আশ্রয় দেন নাই—

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার।
যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

উৎসর্গের একটি কবিতাতে তিনি বলিয়াছেন,—

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

এইজন্য প্রেমের পরিকল্পনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেহের লাবণ্য, নারীসঙ্গে চিত্তের শিহরণ ও নানা-মাধুর্য্যের আপূরণ পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু অন্তরের

প্রেমের আপ্লাবনের দ্বারা তিনি সমস্ত বন্ধনকে জয় করিয়াছেন; তিনি দেখিয়াছেন যে একটি যুগল-প্রীতির উৎস কামগন্ধহীন হইয়া এমন করিয়া মহাভাবের কল্পনাতে বিহার করিতে পারে, যাহাতে আমাদের হৃদয়ের সমস্ত আবরণ খণ্ডিত হইয়া যায়। সেই আবরণহীন অন্তঃস্পর্শের মধ্যে নিখিলবিশ্বের হৃদয় আমাদের হৃদয়ের মধ্যে স্পন্দিত হইতে পারে। সেই স্পন্দনের যোগে বিশ্ব-স্পন্দনকে আমরা আমাদের অন্তরের মধ্যে সাক্ষাৎ করিতে পারি। কিন্তু এই যে বহির্লোকের সহিত দ্বন্দ্বে, দেহের সহিত সজ্যাতে, প্রেমের বিজয়ের মধ্যে আমরা আমাদের আত্মার চিরন্তন ও ব্যাপক মিলনকে সাক্ষাৎ করি, ইহা একান্তভাবে আমাদের আত্মার ঘনিষ্ঠ মূর্ত্তি। সত্যকে তাহার বহিঃস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত না দেখিয়া তাহাকে তাহার অন্তঃস্বরূপের মধ্যে ধ্যানলোকে উপলব্ধি করি। এই যে আত্মবিজয়, এই যে দেহ-দ্বন্দ্বের মধ্যে দেহের উপরে উঠিয়া ভাবসম্মিলন, ইহা আমাদের প্রাচীনদের মুক্তি অনুসন্ধানের উপায়ান্তর মাত্র; প্রেমের বিজয়কে কেমন করিয়া তাহার মহীয়সী মূর্ত্তিতে বহির্লোকের আদানে প্রদানে ও কর্ম্মযাত্রার পথে উপলব্ধি করিতে হইবে ইহাতে তাহার কোন সঙ্কেত নাই। চিত্রাঙ্গদা নাটকে কবির মনে একবার এই দিকটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহা এমন করিয়া বিকশিত হইয়া উঠে নাই যে সেই পথের প্রেরণা কবিকে ব্যাকুল করিয়া তুলে। সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে তাহার পরবর্ত্তী রচনায় তিনি প্রেমকে অন্তরের বিকাশের মধ্যেই অনুভব করিয়াছেন। তাহাকে তাহার বহিঃপ্রকাশের মধ্যে তেমন করিয়া স্থান দিতে পারেন নাই। 'মহুয়া' কাব্যে আবার চিত্রাঙ্গদার সুরটি তাঁহার চিত্তে বাজিয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাই। 'বলাকার' মধ্যে যেমন দেখি যে অন্তর্য্যামী তাঁহার অন্তরের আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া অন্তর-বাহিরকে একত্র করিয়া অজানার যে যাত্রা চলিয়াছে তাহার দিকে আপনাকে প্রধাবিত করিয়াছেন, 'মহুয়ার' মধ্যে তেমন দেখিতে পাই যে, প্রেমের অন্তরাস্বাদ তাঁহাকে বহির্যাত্রার পথে বরণ করিয়া লইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের পরিণত যুগের কবিতার মধ্যে দেখা যায় যে প্রকৃতি আর

মানুষের নানা চিত্তধারার উদ্দীপনবিভাবের উপাদানভূত হয় নাই। তাঁহার পূর্ব্ব যুগের কবিতায় এবং আমাদের দেশের প্রাচীন কবিতায় দেখা যায় যে প্রকৃতি পুরুষার্থ-প্রবর্ত্তিনী। প্রকৃতির বিচিত্র লীলার আবেষ্টনের কেবল এইমাত্র কাজ যে সে মানুষের ভাবধারাকে তাহার চঞ্চল ভঙ্গীতে ফুটাইয়া তুলিবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিত্তপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবটিই প্রধান ভাবে দেখা যায় যে একই দেবতা অন্তরলোকে ও বহির্লোকে, মনোলোকে ও প্রকৃতি লোকে তাহার একই গতিভঙ্গীতে বিহার করিতেছেন। মানুষও যেমন সুখদুঃখ জন্মমৃত্যুর বিচিত্রলীলার মধ্য দিয়া নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে প্রকৃতিও যেন ঠিক তেমনি ভাবে জন্ম-মৃত্যুর লীলার মধ্য দিয়া কোন্ অজানার পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রকৃতি তাহার আপন স্বভাবকে মানুষের সম্মুখীন করিয়া মানুষের মধ্যে যেন তাহা প্রতিফলিত করিয়া তুলিয়াছে। তাহার নিজের মধ্যে যে এক গভীর মন্ত্র সুপ্তপ্রায় অবস্থার মধ্য দিয়া জাগরণের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাকেই মানুষের মধ্যে তাহারই প্রবুদ্ধস্বরূপে সাক্ষাৎ করে। ঋতুমণ্ডলের মধ্যে ঋতুরাজ যে ক্রীড়া-নৃত্য দেখাইতেছেন মানুষের মধ্যেও তাহারই বিচিত্র-ভঙ্গী উহার নানা ভাবধারার মধ্যে তাহার জন্মমরণের ছন্দে প্রকাশ পাইতেছে। একই নটরাজ বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। কবির 'বলাকা' ও অন্যান্য কাব্য পড়িলে দেখা যায় যে সমস্ত জগৎ জুড়িয়া যে সত্যটি আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহার মূলস্বরূপ হইতেছে যৌবন, গতি, চঞ্চলতা ও তাহার নানা ছন্দ। রবীন্দ্রনাথের চিত্ত, বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে যেন হৃদয়ের মায়াগৃহের আগল ভাঙ্গিয়া বহির্লোকে আসিয়া পড়িয়াছে। হৃদয়ে যে সত্য অনুভব করিয়াছেন তাহা কেবলমাত্র হৃদয়গুহা-স্পর্শের গভীরতার মধ্যে বিলীন হইয়া যায় নাই। চৈতালী পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন সে কবিতাগুলিতে প্রেমকে ব্যাপক ও সর্ব্বপ্লাবী বলিয়া অনুভব করিলেও সে ব্যাপ্তি কর্ম্মের মধ্যে জীবনের মধ্যে তেমন প্রতিফলিত হয় নাই যেমন প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে। ১৩০৪ সালে লিখিত 'কল্পনাতে' কবি লিখিয়াছিলেন—

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কী, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তা'রে ছড়ায়ে।
ব্যাকুলতর বেদনা তা'র বাতাসে উঠে নিঃশ্বাসি'
অশ্রু তা'র আকাশে পড়ে গড়ায়ে।
ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতি-বিলাপ-সঙ্গীতে
সকল দিক কাঁদিয়া উঠে আপনি।
ফাগুন মাসে নিমেষ মাঝে না জানি কা'র ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি' মূরছি' পড়ে অবনী॥

ইহার মধ্যে হৃদয়-যন্ত্রের যন্ত্রণা তরুপল্লবের গুঞ্জরণের মধ্যে দিয়া গুঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ১৩৩৬ সালে লিখিত 'মহুয়া'র 'উজ্জীবন' কবিতাটিতে দেখা যায়—

ভস্ম-অপমান শয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু,
রুদ্র-বহ্নি হ'তে লহ জলদর্চ্চি তনু।
যাহা মরণীয় যাক ম'রে,
জাগ অবিস্মরণীয় ধ্যান-মূর্ত্তি ধ'রে।
যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ় তব
যাহা স্থূল, দগ্ধ হোক্, হও নিত্য নব।
মৃত্যু হ'তে জাগো, পুষ্পধনু
হে অতনু, বীরের তনুতে লহ তনু॥

* * * *

দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর যে-পথ,
সে-দুর্গমে চলুক, প্রেমের জয়রথ।
তিমির তোরণে রজনীর
মন্দ্রিবে যে রথচক্র নির্ঘোষ-গম্ভীর।
উল্লঙ্ঘিয়া তুচ্ছ লজ্জা ত্রাস,
উচ্ছলিবে আত্মহারা উদ্বেল উল্লাস।

মৃত্যু হতে ওঠো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহ তনু ॥

এই কবিতাটি পড়িলে দেখা যায় যে প্রেম এখানে তাহার মৃত্যুঞ্জয়রূপে আবির্ভূত হইয়াছে। অগ্নি-উৎসের প্রবাহকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার দুঃসহ সুন্দর দুর্দ্দাম বেগে প্রেম তাহার তেজোময় স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। দেহকে আলিঙ্গন করিয়া যে আকুতি ও আকাঙ্ক্ষা ছিল তাহা ভস্ম হইয়া গিয়াছে। প্রেম তাহার মৃত্যুজয়ী শক্তি-স্বরূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

ইহার পরের 'বোধন' কবিতাটিতে দেখা যায় যে মাস শেষ হইয়া আসিয়াছে। শীতের রথের ঘূর্ণী-ধূলিতে গোধূলি ম্লান কিন্তু তথাপি বনমর্ম্মরের মধ্যে কোন অতিথির আশ্বাসবাণী যেন শোনা যাইতেছে। শীত নবযৌবনের দূত। তাই ম্লান-চেতনার সমস্ত আবর্জ্জনা দূর করিয়া দিয়া নূতন অতিথির যাত্রা-পথকে পরিষ্কার করিয়া দিয়া নূতন করিয়া ভরিবার জন্য ভরাপাত্রটিকে শূন্য করিয়া মৃত্যুর স্নানে অলস ভোগের গ্লানি কালিমা মুছাইয়া দিয়া চিরপুরাতনকে নবোজ্জল চেতনায় সঙ্কেতিত করিবার জন্য শীতের প্রয়াস। নির্দ্দয় নবযৌবন ভাঙনের মহারথে আরোহণ করিয়া চিরন্তনের চঞ্চলতায় প্রান্তরের পর্ব্বতের লতাগুল্মকে থরথর করিয়া কাঁপাইয়া আসিতেছেন, পাতায় পাতায় তাঁহার বার্ত্তা ঘোষিত হইতেছে, পলাশের আরতি পত্রে তাঁহার রক্ত প্রদীপ জ্বলিয়াছে। দাড়িম্ববনের রক্তিম রাগে, মাধবিকার সুরভিসোহাগে, তাহার লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। বকুল পুষ্পোপহারে রিক্ত হইতেছে; শিমুল আপনাকে নগ্ন করিয়া রক্তবাস উপহার দিতেছে, এবং আকাশে-বাতাসে অপরিচিতার জয়-সঙ্গীত উদ্ঘোষিত হইয়া উঠিতেছে। এই যে নব-যৌবনের নব বসন্তের প্রাণবন্যা সমস্ত আর্ত্তিকে সমস্ত দীনতাকে দলিত করিয়া আপন উদ্দামবেগের ফেনিল উচ্ছ্বাসে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে, অজানার সন্ধানে দূর দিগন্তের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহাই যদি জগৎ-রহস্যের চিরন্তন সত্য হয় তবে প্রেমের সত্যও এইখানে; অন্তরের ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যে ভাবোপলব্ধির মধ্যে যে প্রেমকে আমরা পাই তাহা তাহার সম্পূর্ণ পরিচয়

নয়। তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় বিশ্বপতির সহিত তাহার অবাধ একতানতা। বসন্তের যদি প্রকৃতি হয় :—

ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী,
দুর্গ কোথায়, অস্ত্র বা কই,
কেন সুকুমার বেশ ?
মৃত্যু-দমন শৌর্য্য আপন
কী মায়ামন্ত্রে করিলে গোপন,
তূণ তব নিঃশেষ।
বর্ম্ম তোমার পল্লবদলে,
আগ্নেয়-বাণ বনশাখাতলে
জ্বলিছে শ্যামল শীতল অনলে
সকল তেজের বাড়া॥
জড় দৈত্যের সাথে অনিবার
চিরসংগ্রাম ঘোষণা তোমার
লিখিছ ধূলির পটে,
মনোহর রঙে লিপি-ভূমিতলে
যুদ্ধের বাণী বিস্তারি' চলে
সিন্ধুর তটে তটে!
হে অজেয়, তব রণভূমি 'পরে
সুন্দর তার উৎসব করে,
দক্ষিণ বায়ু মর্ম্মর স্বরে
বাজায় কাড়া নাকাড়া॥

তবে অন্তরের মধ্যে অন্তর্য্যামীকে সাক্ষাৎ করাই আমাদের চরম প্রাপ্তি নহে। কিন্তু যিনি আন্তর্য্যামীরূপে বিরাজ করিতেছেন তিনিই যে প্রবাহলীন জগৎশক্তির

মধ্যে, সৃষ্টির ক্রমবিকাশের মন্ত্রের মধ্যে, জন্ম-মৃত্যুর রহস্যের মধ্যে, মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃতের পরিস্ফুর্তির মধ্যে, অজানা লোকের দিকে যে অভিযান চলিয়াছে তাহারই চিরপান্থরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন ও আমাদের সমস্ত পরিচয় সেই যাত্রার মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিতেছেন এই সত্যই গভীর সত্য। এই উপলব্ধি যদি চরমতত্ত্ব হয় তবে প্রেমের চরম প্রকাশ আত্মোপলব্ধির পূর্ণতার মধ্যে নয়। শুধু হৃদ্‌গুহার মধ্যে বিশ্ব-নরনারীর হৃদয়ের সঙ্গে ও প্রকৃতির আনন্দ-প্রস্রবণের ধারার সঙ্গে আপনাকে একীকৃত করিয়া দেখার মধ্যে নয়; প্রেমের চরম সত্য বিশ্বনিয়মের চরম সত্য; তাহা গতির সত্য, নৃত্যের সত্য, ছন্দের সত্য। তাহার উদ্বোধন ভিতরে বাহিরে যুগপৎ চলিয়াছে। তাই কবি বসন্ত-সমাগমের মধ্যে, শীত-বসন্তের দ্বন্দ্বের মধ্যে, অরণ্যের সুপ্তিহরণের মধ্যে, মল্লিকার প্রস্ফুরণের মধ্যে, অশোকের রোমাঞ্চের মধ্যে ও কিংশুক-কুঙ্কুমের বনশয্যার মধ্যে বসন্তের বরবেশ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। মানুষের মধ্যে যে লীলা প্রকৃতির মধ্যেও সেই লীলা। প্রকৃতি ও মানুষ এই উভয়কে লইয়া নটরাজের নৃত্য চলিয়াছে। তাই দেখিতেছি—

বসন্তের জয়রবে
দিগন্ত কাঁপিল যবে
মাধবী করিল তা'র শয্যা।
মুকুলের বন্ধ টুটে
বাহিরে আসিল ছুটে
ছুটিল সকল তার লজ্জা।
অজানা পান্থের লাগি'
নিশি নিশি ছিল জাগি'
দিনে দিনে ভ'রেছিলো অর্ঘ্য।
কাননের একভিতে
নিভৃত পরাণটিতে
রেখেছিলো মাধবীর স্বর্গ।

এখানে প্রকৃতি যেন প্রেমের অন্তর লীলায় বিভোর। প্রাঙ্গনের শিরীষ-শাখায় ক্লান্তিবিহীন ফুলফোটানোর খেলা চলিয়াছে। তাহার ডালে ডালে স্বর্গপুরের নূপুরধ্বনি রণৎকারে বাজিয়া উঠিতেছে আর তাহারই মধ্য দিয়া বসন্ত-জীবনের আগমনধ্বনির প্রত্যাশা যেন স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে—

ডালগুলি তা'র রইবে শ্রবণ পেতে
অলখজনের চরণ-শব্দে মেতে!
প্রত্যহ তা'র মর্ম্মরস্বর ব'ল্‌বে আমায় কী বিশ্বাসে
"সে কি আসে?"

'অর্ঘ্য' কবিতাটিতে তিনি বলিতেছেন—

এই ভুবনেব একটি অসীম কোণ,
যুগলপ্রাণের গোপন পদ্মাসন,
সেথায় আমায় ডাক দিয়ে যায় নাই জানা কে,
সাগরপারের পান্থপাখীর ডানার ডাকে।

প্রকৃতির মধ্যে যুগলপ্রাণের যে পদ্মাসন রহিয়াছে তাহার মধ্য হইতে অজানা লোকের দিকে যে প্রেমের বাণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে তাহাই কবির চিত্তের মধ্যে প্রেমের আবেশ ফুটাইয়া তুলিতেছে। ঝিল্লীঝনন অশোকের প্রদীপমালায়, ফাল্গুনবনের রক্তদীপন প্রাণের আভায়, কবির চিত্তের মধ্যে একটি নূতন প্রকাশ, বচন ও নূতন রচনের মধ্যে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। প্রকৃতির মধ্যে যে আদিম অগ্নিশিখা জ্বলিয়া রহিয়াছে তাহাই কবির ললাটে নূতন আলোর টীকা পরাইয়া দিয়াছে এবং তাহার 'নীরব হাসির সোনার বাঁশরী'-ধ্বনি হইতে প্রেমের একটি নূতন উদ্বোধিনী-গীতির আলাপ উঠিয়াছে। তিনি বলিতেছেন—

প্রাণ-দেবতার মন্দির দ্বার
যাক্ রে খুলে,
অজ আমার অর্ঘ্যের থাল
অরূপ ফুলে।

প্রকৃতির আদিম প্রেমানুসন্ধান কবিকে যেন প্রেমের নূতন জাগরণে নূতন চেতনায় উদ্বোধিত করিয়াছে। তিনি অনুভব করিতেছেন যে সমস্ত প্রকৃতি যেন আপনাকে একটি সীমাহীন প্রেমের প্রেরণায় আন্দোলিত করিয়া লইয়া চলিয়াছে তার মহা-অভিযানের পথে। মানুষরূপে আমাকে ফুটাইবে, মানুষের নিঃসীমতার মধ্যে আপন সীমাকে মগ্ন করিয়া দিবে—এইটিই তার অভিলাষ। মানুষের স্পর্শে প্রকৃতি তার সূর্য্য-চন্দ্র তারাকে বিস্মৃত হইয়া একটি নূতন চেতনায় যেন সঞ্চেতিত হইয়া নানারূপের লীলার মধ্য দিয়া নানা বিকাশের ধারার মধ্য দিয়া মানুষের অন্তর-লোকের দিকে আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে, ইহাই প্রকৃতিপ্রেমের দ্বৈততা—

তোমার মঞ্জরী
কভু ফোটে, কভু পড়ে ঝরি ;
তোমার পল্লবদল
কভু স্তব্ধ, কভু বা চঞ্চল।
একেলার খেলা তব
আমার একেলা বক্ষে নিত্য-নব।
কিশলয় গুলি—
কম্পমান করুণ অঙ্গুলি—
চায় সন্ধ্যা-রক্তরাগ,
আলোর সোহাগ ;
চায় নক্ষত্রের কথা,—
চায় বুঝি মোর নিঃসীমতা।

কবিচিত্তের মধ্যে নিরন্তর প্রকৃতিকে সম্ভোগ করিবার প্রতি-স্পর্শে যে ভাবধারা জাগিয়া উঠে তাহার আভাষণ যেন নিরন্তর মানুষের চিত্তকে প্রকৃতির দিকে অগ্রসর করিয়া লইয়া যায়। মানুষের সহিত প্রকৃতির নিরন্তর আদান-প্রদান চলিতেছে। প্রকৃতির বার্ত্তা মানুষের চিত্তপটে নিরন্তর লেখা হইতেছে, কিন্তু মানুষের চিত্ত

হইতে যে ভাবধারা নিরন্তর বাহির হইতেছে প্রকৃতির চিত্তের মধ্যে তাহা প্রবেশ করে কি না সে সম্বন্ধে কবির চিত্তে সংশয় জাগিয়া উঠায় কবি বলিতেছেন,—

আমার হৃদয়ে সে কথা লুকান, তার আভাষণ
ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয়তলে
দুয়ারে এঁকেছি রক্তরেখায় পদ্ম-আসন,
সে তোমারে কিছু বলে ?

প্রকৃতির মধ্যে যে নিরন্তর মিলনের লীলা চলিয়াছে কবি তাহা তাঁহার মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করেন। পূর্ণচন্দ্রকে দেখিয়া উৎসুক ধরণীর সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া তরঙ্গের ধন্য ধন্য ধ্বনি কূলে কূলে মন্দ্রনিনাদে গর্জ্জন করিয়া উঠে। কোটালের বানে নদীর গদ্‌গদ বাণী, যেন অশ্রুবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে। এই আবেগের মধ্য দিয়া পৃথিবী চন্দ্রের নিকট যে আত্মনিবেদন করে তাহাতে সে কি চায়, কি বলে তাহা যেন আপনিই জানে না। মানুষের জীবনেও যখন প্রথম মিলনের ভাববন্যা আসে তখন তাহাও এমনি উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ, নির্দ্দিষ্ট ভাবাভিব্যক্তির দীনতায় আচ্ছন্ন। আবার বসন্তের উৎকণ্ঠিত দিনে যখন পলাশের রক্তপত্রে সমস্ত বন ব্যাপিয়া বর্ণবহ্নি জ্বলিয়া উঠে, অজস্র ঐশ্বর্য্যভারে শিমুলের পত্ররিক্ত দরিদ্রশাখা যখন পাগল হইয়া উঠে, তখন আকাশে বাতাসে যে রক্তফেণসুরা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহাতে প্রকৃতির সমস্ত আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া যেন এক নিমেষে সমস্ত আবেদনকে নিঃশেষ করিয়া ফেলে। নরনারীর প্রীতি-মিলনের প্রথম উচ্ছ্বাস এমনি ভাববেগে আত্মনিঃশেষ।

এই কবিতাগুলি পড়িলে দেখা যায় যে প্রকৃতির মধ্যে যে প্রেমপ্রেরণা তাহাকে বিকাশের পথে উদ্বুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে, যে প্রেম সেই বিকাশকে মানুষের অন্তরের দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া, প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে প্রেম-লীলার পথকে অবারিত করিয়া দিয়াছে, যে প্রেম প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যের নিরন্তর আদানপ্রদানকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে, তাহাই কবিচিত্তে কুঞ্জবিতানে আনন্দবংশীর বিচিত্র ঝঙ্কারে নূতন নূতন মায়ামূর্ত্তিতে আপনাকে সাক্ষাৎ

করাইতেছে। প্রকৃতির আপন লীলার মধ্যে যে পূর্ণিমার মিলনের উৎসব চলিয়াছে, যে বসন্তের ফেণিল উচ্ছ্বাস চলিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া কবি যেন প্রকৃতি-ব্যাপারের মধ্যে ঠিক মানুষেরই মিলনের মত নূতন নূতন প্রেমের মিলনকে উপলব্ধি করিয়াছেন। "নটরাজ" ও "বলাকা"তে প্রকৃতি ও মানুষের জীবনের মধ্যে যে ঐক্যলীলার কথা বলা হইয়াছে ইহাও তাহারই অনুরূপ।

আর একটি কবিতাতে কবি-প্রকৃতির সহিত কবি-চিত্তের মিলনোৎসবের গান গাহিয়াছেন। প্রকৃতি এবং প্রেয়সী যেন এক হইয়া গিয়াছে। ইহাকে রূপক বলা যায় কি অতিশয়োক্তি বলা যায় তাহা বলা সুকঠিন, কারণ এখানে উভয়ের মধ্যে দ্বৈতবোধ পরিস্ফুট নহে। প্রেয়সীর আনন্দরস তাহার মানব-মূর্ত্তিকে আশ্রয় না করিয়া প্রকৃতির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া কবির চিত্তপাত্রকে কাণায় কাণায় ভরিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতিপ্রেয়সী সঙ্গোপনে কবিচিত্তের মধ্যে তাঁহার বাণীছন্দরূপে যেন প্রকাশ লাভ করিয়াছে। চিত্তের অন্ধকারের মধ্যে প্রকৃতি-প্রেয়সীর বা প্রেয়সী-প্রকৃতির দীপশিখাটি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আর সেই দীপশিখার সহিত রস-সম্ভোগের সৌরভে কবিচিত্ত তন্ময় হইয়া উঠিয়াছে। রূপের রেখার সঙ্গে সঙ্গে রসের লেখা মিলিত হইয়াছে। এবং সেই রসের লেখার মধ্য দিয়া প্রকৃতির বস্তুরূপ আপনার বস্তুতাকে পরিত্যাগ করিয়া রস-স্বরূপে প্রতিভাত হইয়াছে—

"চিত্তকোণে ছন্দে তব
বাণীরূপে
সঙ্গোপনে আসন লবো
চুপে চুপে।
সেইখানেতেই আমার অভিসার,
যেথায় অন্ধকার
ঘনিয়ে আছে চেতন বনের
ছায়াতলে

যেথায় শুধু ক্ষীণ জোনাকির
আলো জ্বলে ॥"

"হাওয়ায় ছায়ায় আলোয় গানে
আমরা দোঁহে
আপন মনে র'চবো ভুবন
ভাবের মোহে।
রূপের রেখায় মিল্‌বে রসের রেখা,
মায়ার চিত্র-লেখা,—
বস্তু চেয়ে সেই মায়া তো
সত্যতর,
তুমি আমায় আপনি র'চে
আপন করো ॥"

এই কবিতায় যিনি প্রাণবতীরূপে দেখা দিয়াছেন তিনি প্রকৃতি-প্রেয়সী কি প্রেয়সী-প্রকৃতি তাহা নির্ণয় করা যায় না। তিনি উভয়ই। প্রেয়সী যেন প্রকৃতির আভরণের মধ্য দিয়া তাহার আপন মূর্ত্তিকে কবি-চিত্তের মধ্যে প্রতিভাত করিতেছে। আবার আর এক দিক দিয়া দেখিলে ইহা প্রকৃতিসুন্দরীর মানসচিত্তে যে নিত্য বিহার চলিয়াছে তাহারই শৃঙ্গার-গীতি। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য মানুষের চিত্তে আসিয়া ঔৎসুক্যে ও আবেগে ভাব ও ভাষা-প্রবাহকে জাগাইয়া তুলে; বাহিরে যাহা নির্ঝরিণীরূপে প্রকাশ পাইয়াছে কবি-চিত্তের মধ্যে তাহারই অন্তররূপ বাণীরূপে ফুটিয়াছে।

"আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে
মিলিত ছবি,
তাই নিতে আজি পরাণে আমার
মেতেছে কবি।

পদে পদে তব আলোর ঝলকে
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে,
মোর বাণী-রূপ দেখিলাম আজি
নির্ঝরিণী।
তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়,
নিজেরে চিনি॥

"প্রকাশ" কবিতাটি হইতেই প্রকৃতির প্রেম হইতে কবি নারীর প্রেমে অবতীর্ণ হইলেন। এই কবিতাটির মধ্যে কবি অনুভব করিয়াছেন যে প্রেয়সীর প্রেমদৃষ্টির মধ্যেই আমাদের মর্ম্মগত প্রাণ তাহার আপন পরিচয় লাভ করে। অসংখ্য যুগের প্রত্যেক মানুষের যে একটি বিশিষ্ট স্বতন্ত্রতা উৎপন্ন হইয়াছে তাহার উদ্বোধন হয় প্রিয়া-প্রেমের মধ্যে। জগতের মধ্যে কর্ম্ম-বন্ধনে মানুষের যে পরিচয় তাহাতে তাহার বিশিষ্ট স্বতন্ত্রতার কোন পরিচয় নাই। তাহাতে তাহার আত্ম-আবিষ্কার নাই। সেখানে সে দশজনের একজন মাত্র, সেখানে তাহার যথার্থ মূল্য ও যথার্থ সার্থকতা বিলুপ্তপ্রায়।

"ছায়া আমি সবা কাছে অস্ফুট আমি-যে,
তাই আমি নিজে
তাহাদের মাঝে
নিজেরে খুঁজিয়া পাই না-যে।
তা'রা মোর নাম জানে, নাহি জানে মান,
তা'রা মোর কর্ম্ম জানে, নাহি জানে মর্ম্মগত প্রাণ।
সত্য যদি হই তোমা কাছে
তবে মোর মূল্য বাঁচে,—
তোমার মাঝারে
বিধির স্বতন্ত্র সৃষ্টি জানিব আমারে।

প্রেম তব ঘোষিবে তখন
অসংখ্য যুগের আমি একান্ত সাধন।
তুমি মোরে করো আবিষ্কার,
পূর্ণ ফল দেহো মোরে আমার আজন্ম প্রতীক্ষার।
বহিতেছি অজ্ঞাতের বন্ধন সদাই,
মুক্তি চাই
তোমার জানার মাঝে
সত্য তব যেথায় বিরাজে॥"

'বরণডালা' কবিতাটিতে দেখা যায় যে যেমন নব বসন্তে লতায় লতায় পাতায় ফুলে প্রভাতের স্বর্ণকূলে প্রেমজাগরণের বাণী-হিল্লোল উচ্ছ্বসিয়া উঠে, তেমনি নারীদেহের সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রেমের ছন্দ যেন মনের বেলা ছাপাইয়া বাহির হইয়া আসে। নারীর সৌন্দর্য্য বাহিরের উপকরণ নহে, তাহা অন্তরের মূর্ত্ত প্রকাশ। দেহ সৌন্দর্য্যের অর্ঘ্য বাহিরের উপকরণ নহে তাহা প্রাণের স্রোতাবেগে আবর্ত্তিত পূজার সামগ্রী। দেহকে যতক্ষণ শুধু দেহ বলিয়া মনে করা যায়, ততক্ষণ তাহার আকর্ষণকে লালসা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ক্লেদ ও মলিনতায় তাহা পরিপূর্ণ। ভর্তৃহরি যখন নারীদেহের প্রতি বৈরাগ্য সঞ্চার করিবার চেষ্টায় লিখিয়াছিলেন—

স্তনৌ মাংসগ্রন্থী কনককলসাবিত্যুপমিতৌ
মুখং শ্লেষ্মাগারং তদপি চ শশাঙ্কেন তুলিতম্।

তখন নারীদেহকে তিনি শুধু দেহরূপেই দেখিয়াছিলেন। কামুকের লালসা দেহের প্রতি একটি জৈব আকর্ষণ মাত্র। কিন্তু যখন নারীদেহের সৌন্দর্য্যকে তাহার প্রাণের প্রেমজীবনের পত্রপুষ্পের অর্ঘ্যরূপে দেখা যায়, তখন তাহাতে পবিত্রতা ও পূজার মাহাত্ম্যই ফুটিয়া উঠে। দেহের ক্লিন্নতার লেশমাত্রও থাকে না।

"অর্ঘ্য তোমার আনিনি ভরিয়া
বাহির হ'তে,
ভেসে আসে পূজা পূর্ণ প্রাণের
আপন স্রোতে।

মোর তনুময় উছলে হৃদয়
বাঁধনহারা,
অধীরতা তারি মিলনে তোমারি
হোক না সারা॥

ঘন যামিনীর আঁধারে যেমন
ঝলিছে তারা,
দেহ ঘেরি মম প্রাণের চমক
তেমনি রাজে।
সচকিত আলো নেচে ওঠে মোর
সকল কাজে॥"

প্রকৃতির প্রেরণায় মানুষের চিত্ত যখন আপনার মধ্যে ফিরিয়া আসে তখন নিজের নিঃসীমতার মধ্যে, আভ্যন্তরীণ আন্তরিকতার মধ্যে, নিঃসঙ্গতার মধ্যে, মুক্তিরসকে উপলব্ধি করা যায় একথা আমরা জানি; কিন্তু কেবলমাত্র প্রকৃতির উপভোগের মধ্যে আমাদের মনকে বিলীন করিয়া দিলে তাহাতেও যে আমাদের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায় ও একটি মুক্তিরস উত্তাল হইয়া উঠে একথা আমাদের সাহিত্যে অত্যন্ত নবীন।

"ভোরের পাখী নবীন আঁখি-ছুটি
গুহাবিহারী ভাবনা যত
নিমেষে নিল লুটি'।

কী ইঙ্গিতে আচম্বি
ডাকিল লীলাভরে
দুয়ার-খোলা পুরানো খেলা-ঘরে।
যেখানে ব'সে সবার কাছাকাছি
অজানা ভাবে অবুঝ গান
একদা গাহিয়াছি।
প্রাণের মাঝে ছুটে-চলার
ক্ষ্যাপামি এলো ছুটি;
লাভের লোভ, ক্ষতির ক্ষোভ
সকলি গেল টুটি' ॥"

এই অন্তর হইতে বাহিরে মুক্তি পাওয়ার এই ভাব 'মহুয়ার' প্রেমের কবিতা-গুলির মধ্যে ক্রমশঃই স্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। 'মহুয়া' কাব্যের অনেকগুলি কবিতাতে প্রকৃতিই প্রেমরসের আলম্বন। অনেকগুলিতে প্রকৃতি প্রেমরসের উদ্দীপক। কিন্তু এই উদ্দীপকতার মধ্যে প্রাচীন সংস্কৃত-কবিদের কামোদ্রেকতা নাই, আছে একটি বিশুদ্ধ প্রেমজ্যোতির শিখাসঞ্চরণ। সেই শিখাসঞ্চরণ এত বিশুদ্ধ ও এত স্নিগ্ধ যে তাহাতে প্রেমের একটি নূতন জাগরণ, নূতন আস্বাদ ও নূতন প্রেরণা অনুভূত হয়। 'মহুয়া'র কবিতাগুলির মধ্যে যে প্রেম ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা প্রকৃতির সহিত এমনই ওতপ্রোত ভাবে জড়িত যে যেন তাহা প্রকৃতির প্রেমেরই একটি রসনিষ্যন্দ।

'অসমাপ্ত' কবিতাটিতে দেখা যায় যে মনের মন্দিরের মধ্যে, তরুর তম্বুরার কলনিস্বনে, অনন্তের স্তবগানে, যে বন্দনায় চিত্ত আবর্জ্জিত হইয়া আসে, তাহারই শুচিস্পর্শ প্রেমিকের চিত্তে জন্মজন্মান্তরের আশ্বাস আবাহন করিয়া আনিতেছে। প্রিয়তমার বক্ষের মধ্যে যে প্রেমের পূর্ণিমা সদাজাগ্রত হইয়াছিল তাহা অন্তরের মধ্যে ছিল বলিয়াই রূপ লইয়া বাহিরে ফুটিতে পারে নাই এবং প্রেমাস্পদের নিকট তাহার আত্মপরিচয় দিতে পারে নাই। কত চৈত্রমাসের রাত্রিতে, প্রচ্ছন্ন

পুষ্পের বাসে, যে অতিথি ছায়ারূপে বারম্বার হৃদয়দ্বার কম্পিত করিয়াছে, যাহার নিঃশ্বাস হৃদয়যন্ত্রের তারগুলিকে কাঁপাইয়াছে ও অবগুণ্ঠনকে স্পন্দিত করিয়াছে, তাহার স্পর্শ নিগূঢ় অন্তর্বেদনার মধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল। তাহাকে প্রিয়তমের নিকট অর্ঘ্যের থালিরূপে সাজাইয়া দেওয়া হয় নাই।

"ব'লো তারে আজ,
অন্তরে পেয়েছি বড় লাজ।
কিছু হয় নাই বলা,
বেধে গিয়েছিল গলা,
ছিল না দিনের যোগ্য সাজ।
আমার বক্ষের কাছে
পূর্ণিমা লুকানো আছে,
সেদিন দেখেছো শুধু অমা
দিনে দিনে অর্ঘ্য মম
পূর্ণ হবে, প্রিয়তম,
আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা।"

মাঘের অরুণরাগে বনের দুকূল ও আমের মুকুলের সহিত স্বর্গের যে নূতন দ্বার মুক্ত হয়, নবীন রাগের নবসোহাগের রাগিণীতে যে বীণার তার ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, তাহারই প্রেরণায় যেমন মুখর বাতাসে যুগান্তরের সুখ ভাসাইয়া আনিয়া বনের মর্ম্মর-স্বরে মনের ভার নামিয়া যায় তেমনি প্রেমিকের হৃদয়-বদ্ধ প্রেমচেতনা বাণীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া নূতন ছন্দের উচ্ছ্বাসে আপন অন্তরবীণার সুরের সাহায্যে আপনাকে নানা প্রকাশের ভঙ্গিমায় ঝঙ্কৃত করিয়া তুলে। নারী যতক্ষণ প্রেমকে চেনে না ততক্ষণ সে প্রেম থাকে আত্মবিস্মৃতির তন্দ্রালীনতায়। কিন্তু তাহার সহিত পরিচয় হইলে হৃদয়ের কপাট যখন খুলিয়া যায়, সেই কপাটের মধ্য হইতে যখন সে বাহির হইয়া আসে, তখন তাহার মুখনিঃসৃত বাণী কেবল হৃদয়তন্ত্রের বীণার উপর ঝঙ্কার দিয়া নিরস্ত থাকে না, তাহা তাহার

আপনার স্বরূপকে সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব হইতে মুক্তি দিয়া বলদৃপ্ত জয়ের সহিত জগতের আলোকের মধ্যে আপনাকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলে এবং নিজের মুক্তির মধ্যে প্রেমিককে মুক্তির দীক্ষায় দীক্ষিত করে—

"তোর সাথে চেনা
সহজে হবে না,
কানে কানে মৃদুকণ্ঠে নয়।
ক'রে নেবো জয়
সংশয়-কুণ্ঠিত তোর বাণী ;
দৃপ্ত বলে লবো টানি'
শঙ্কা হ'তে, লজ্জা হ'তে, দ্বিধাদ্বন্দ্ব হ'তে
নির্দ্দয় আলোতে।
জাগিয়া উঠিবি অশ্রুধারে,
মুহূর্ত্তে চিনিবি আপনারে ;
ছিন্ন হবে ডোর,
তোমার মুক্তিতে তবে মুক্তি মোর।"

যুগলের মধ্যে যে প্রেমের চাওয়া তাহা যে আপনার মধ্যে আপনি অনাদি অনন্ত—এ ভাবটি কবির মধ্যে তাঁহার যৌবন হইতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ক্ষণিক মানে অভিমানে ক্ষোভ-বিক্ষোভে তাহা বিচলিত হইবার নহে। সমস্ত ধরিত্রী আপন বনানী লইয়া বৈশাখের মেঘপুঞ্জ হইতে রসসম্ভাষণ অপেক্ষা করিয়া থাকে। সে মেঘ হয়তো বায়ুভরে কোথায় উড়িয়া যায়। কুঁড়ি ধরে না ফুল ফোটে না, মাটির তলের তরুমূল তৃষিত হইয়া থাকে, পাতা ঝরিয়া পড়ে তবু ধরিত্রীর প্রেমাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই। দহনজয়ী সন্ন্যাসীর বেশে রাত্রির পর রাত্রি, দিনের পর দিন কাটাইয়া দারুণ উপবাসের নিষ্ঠুর তপস্যায় সে আপনাকে উৎপীড়িত করিতে থাকে। তখন এক দিন কোন্ শুভলগ্নে আষাঢ়ের জলধারা আকাশ হইতে প্রেমবন্যায় ছাপাইয়া ধরণীর বক্ষে পড়ে—

"পূর্ব্বগিরি-আড়াল হ'তে বাড়ায় তার পাণি
করিও ক্ষমা, করিও ক্ষমা, গুমরি' উঠে বাণী,
নামিয়া পড়ে নিবিড় মেঘরাশি,
অশ্রুবারি-বন্যা নামে ধরণী যায় ভাসি।"

তাই কবি বলিয়াছেন যে প্রেমের অধিকার অতীত যুগ হইতে বিধাতার লিপিতে লিখিত হইয়াছে। মান-অভিমানের হেলা-ফেলায় তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। নিখিল বিশ্বনিয়মের মধ্যে তাহার নিয়ম অবস্থিত—

"ফিরালে মোরে মুখ!
এ শুধু মোরে ভাগ্য করে ক্ষণিক কৌতুক।
তোমার প্রেমে আমার অধিকার
অতীত যুগ হ'তে সে জেনো লিখন বিধাতার।
অচল গিরিশিখর 'পরে সাগর করে দাবী,
ঝরণা পড়ে নাবি'।
সুদূর দিক্-রেখার পানে চায়,
অকূল অজানায়
শঙ্কাভরে তরল স্বরে কহে,
নহে গো, নহে নহে।
এড়ায়ে যাবে বলি'
কত না আঁকা-বাঁকার পথে চলে সে ছলছলি'॥
বিপুলতর হয় সে ধারা, গভীরতর সুরে,
যতই আসে দূরে।
উদার-হাসি সাগর সহে অবুঝ অবহেলা,—
একদা শেষে পলাতকার খেলা,
বক্ষে তা'র মিলায় কবে, মিলনে হয় সারা
পূর্ণ হয় নিবেদনের ধারা॥"

'নির্ভয়' কবিতাটি হইতে মহুয়াতে একটি নূতন স্বর বাজিয়া উঠিয়াছে। সেইটিই মহুয়ার নিজস্ব। এই কবিতাটিতে কবি বলিয়াছেন—

"আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা
　　　　গড়িব না ধরণীতে,
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে॥
পঞ্চশরের বেদনা-মাধুরী দিয়ে
বাসর-রাত্রি রচিব না মোরা, প্রিয়ে;
ভাগ্যের পায়ে দুর্ব্বল প্রাণে
ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাহি ভয়, জানি নিশ্চয়
　　　　তুমি আছ, আমি আছি।
উড়াবো উর্দ্ধে প্রেমের নিশান
　　　　দুর্গম পথ-মাঝে
দুর্দ্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
　　　　রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাবো
　　　　চাইনা শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাবো॥
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি
　　　　ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব
　　　　তুমি আছ, আমি আছি।
দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ
দোঁহারে দেখেছি দোঁহে,—
মরু-পথ-তাপ দুজনে নিয়েছি স'হে।
ছুটিনি মোহন মরীচিকা পিছে পিছে,
ভুলাইনি মন সত্যেরে করি মিছে—

এই গৌরবে চলিব এ ভবে
যত দিন দোঁহে বাঁচি,
এ-বাণী প্রেয়সী হোক মহীয়সী
তুমি আছ, আমি আছি।"

যুগলের নিকট পরস্পরের অস্তিত্ব এমন গভীরভাবে পরস্পরের মধ্যে উপলব্ধ হয় যে সেই উপলব্ধির বলে তাহারা কর্ত্তব্যের কঠোর পথে দুঃসহ দুঃখের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। এ প্রেম মানুষকে তার অন্তরতম উপলব্ধির মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে না। এ প্রেম সমস্ত অবরোধ ভঙ্গ করিয়া অন্তরের মধ্যে যে উৎসাহ-সঙ্গীত বাজাইয়া তোলে, তাহার বলে দুঃসহতম কাজের মধ্যে দুর্গম পথ বাহিয়া সমস্ত সংসারের সংগ্রামকে মানুষ নির্ভীকভাবে আলিঙ্গন করিতে সাহস পায়। বাহিরের সত্যকে মুছিয়া দিয়া অন্তরের একটি মোহিনী উপলব্ধির মধ্যে, পঞ্চশরের বেদন-চাতুর্য্যের দ্বারা মানুষ আপনাদিগকে বঞ্চিত করে না। এই সুরটি আমরা প্রথম 'চিত্রাঙ্গদায়' দেখিয়াছিলাম, তাহার পর প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে আবার এই বাণী কবির চিত্তে নূতনভাবে জাগ্রত হইয়াছে। বর্ত্তমানের যুগ চলনের যুগ, গতির যুগ, প্রবাহের যুগ, সংগ্রামের যুগ। এ যুগে বাসর-শয়নের অবসর নাই। এ যুগে নারী নর্ম্ম-সহচরী নহে কর্ম্মসহচরী। নারী বিশ্রামের স্থান নহে, কর্ম্মের শক্তি দায়িনী। তিনি ললিতকলাবিধিতে শিষ্যা নহেন, ভোগের সঙ্গিনী নহেন, তিনি সংগ্রামের তূর্য্যবাদিনী। তাই এই নবযুগের প্রেম শুধু কামাসক্তিবিহীন অন্তরের ব্যাপকতার মধ্যে পর্য্যাপ্ত নহে। শুধু প্রকৃতির সহিত অনাদি অনন্তকালের নর-নারীর ঐক্য-বন্ধনের মধুরতার মধ্যে অবসন্ন হইলে ইহা মানুষকে বিশ্বকর্ম্মের প্রাঙ্গন-ভূমিতে সঞ্চোদিত করিতে পারে না। গায়ত্রীতে আছে যে, সেই দেবতার বরণীয় তেজকে আমরা ধ্যান করি, যাহা আমাদের বুদ্ধিকে সর্ব্বদা প্রচোদিত করিতে থাকে। এই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীই গায়ত্রী সরস্বতী। এই গায়ত্রীসরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়াছেন নীলা সরস্বতী, যিনি আমাদিগকে সমস্ত কর্ম্মে প্রেরণ করেন। আজিকার দিনে নারী শুধু বাক্‌বাদিনী বা বীণাবাদিনী সরস্বতী নহেন,

তাঁহার বিদ্যা কেবলমাত্র মৈত্রী করুণার ব্রহ্মবিহারের মধ্যে পর্য্যাপ্ত নহে, তিনি আজ দেবসেনানী স্কন্দমাতার জননীরূপে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূতা হইয়াছেন। নারীর প্রেম আজ আমাদিগকে ঘরের কোণায় বাঁধিয়া রাখিতে পারে না, সে প্রেম আমাদিগকে বহির্জগতের মধ্যে উন্মুক্ত করিয়া দেয়। পৃথিবীর যজ্ঞ-বেদিকায় যে দুঃখের হোমশিখা জ্বলিতেছে, যে প্রাণের আহুতি চলিয়াছে তাহারই চতুর্দ্দিকে তিনি আমাদের সপ্তপদীগমনের সহযাত্রিণী। তিনি আমাদের অজানাপথের পাহাড়কাটার সঙ্গিনী।

"পথ বেঁধে দিল বন্ধন-হীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চ'লতি হাওয়ার পন্থী।

* * *

নাই আমাদের কনক-চাঁপার কুঞ্জ।
বন-বীথিকায় কীর্ণ বকুল পুঞ্জ।

* * * *

নাই আমাদের সঞ্চিত ধন-রত্ন,
নাই যে ঘরের লালন-ললিত যত্ন।
পথপাশে পাখী পুচ্ছ নাচায়।
বন্ধন তারে করি না খাঁচায়,
ডানা-মেলে দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের
কূজনে দুজনে তৃপ্ত।
আমরা চকিত অভাবনীয়ের
ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত।"

আজিকার এই প্রেম যখন বিচ্ছেদ ও অন্ধকারের মধ্যে বিষাদমগ্না নির্জ্জন-কুটীর-লীনা প্রেয়সীর দ্বারে বজ্রধ্বনি-মন্দ্রিত-মল্লারে মৃত্যুনির্ঘোষে আসিয়া প্রিয়ের চিরবিরহ সূচনা করে, তখন শোকাচ্ছন্না নারী যুদ্ধশায়ী বীরের চিরপ্রয়াণের বার্ত্তার মধ্যে তাহার আপন বিবাহমাল্যের আঘ্রাণ পায়।

"শুধালেম তুমি দূত কার ?
সে কহিল আমি তো সবার।
যে ঘরে তোমার শয্যা একদিন পেতেছি আদরে
ডাকিলাম তারে সেই ঘরে।
আনিলাম অর্ঘ্যথালি,
দীপ দিনু জ্বালি।
দেখিলাম বাঁধা তারি ভালে।
যে মালা পরায়েছিনু তোমারেই বিদায়ের কালে॥"

'দায়মোচন' কবিতাটিতে নারী তাহার প্রিয়তমাকে প্রেমের ঋণ হইতে মুক্তি দিতেছেন। তাঁহার প্রিয়তম অন্তর হইতে তাঁহাকে যেটুকু ভালবাসিয়াছে, যেটুকু তাঁহার প্রেম ভিক্ষা করিয়াছে, সেইটুকুর মধ্যেই যে রসের আভাস পাইয়াছেন, সেইটুকু লইয়াই তিনি থাকিতে প্রস্তুত। মিথ্যা চাটু-বচনে নিজেকে তিনি প্রলুব্ধ করিতে চান না, প্রিয়তম যদি কোন সময়ে তাঁহার প্রেম প্রত্যাহার করিতে চায়, তাহাকেও তিনি বাধা দিতে চান না—

"মনে করাবো না আমি শপথ তোমার,
আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা রবে দ্বার,
যাবার সময় হ'লে যেয়ো সহজেই,
আবার আসিতে হয় এসো।"

তিনি তাঁহার প্রিয়তমকে তাহার সম্মুখের গতিপথ হইতে টানিয়া আনিয়া তাঁহার প্রেমের মধ্যে আবদ্ধ করিতে চান না। তাঁহার জীবনের লক্ষ্য বা কেন্দ্র হইতেও চান না। ক্ষণিক মিলনের ক্ষণিক পাওয়াটি প্রিয়তমের মধ্যেই বিস্মৃত হইলেও, তিনি সেই একমুহূর্তের সত্যকে তার সেই মুহূর্তের মধ্যে তাহাকে যতটুকু পাইয়াছেন, সেইটুকুতেই তৃপ্ত—

"বন্ধু তোমার পথ সম্মুখে জানি,
পশ্চাতে আমি আছি বাঁধা।

অশ্রু-নয়নে বৃথা শিরে কর হানি,
যাত্রায় নাহি দিব বাধা।
আমি তব জীবনের লক্ষ্য তো নহি,
ভুলিতে ভুলিতে যাবে, হে চিরবিরহী;
তোমার যা দান তাহা রহিবে নবীন
আমার স্মৃতির আঁখি জলে,
আমার যা দান সেও জেনো চিরদিন
র'বে তব বিস্মৃতিতলে।'

বিরহিণীকে ত্যাগ করিয়া যাইবার সময়ে যদি প্রিয়তমের চিত্তে তাহার অশ্রুসিক্তনয়ন দেখিয়া দ্বিধা উপস্থিত হয়, তবে তাহার প্রতি গভীর করুণা উদ্রিক্ত হইয়া যেন তাহাকে তাহার গন্তব্য হইতে বিমুখ না করে। তাহার দুঃখে মুগ্ধ হইয়া তিনি যে অতিরিক্ত তাহাকে দিবেন, তেজস্বিনী নারী তাহা গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। যেটুকু সত্য ও ভালবাসা তিনি পাইয়াছিলেন সেইটুকুই তাহার জীবনের সম্বল। কোন মিথ্যা দিয়া তিনি তাহার আয়তন বৃদ্ধি করিতে চান না। নিজের দুর্ব্বলতা দিয়া তিনি কোন নূতন অধিকারের প্রত্যাশিনী নহেন! প্রেমের একটি সীমা আছে, সেই সীমার মধ্যে যেটুকু সহজে পাওয়া যায়, সেই ক্ষণিক মিলনটিকে মৃত্যুঞ্জয় করিয়া চিত্তের মধ্যে বরণ করিয়া লওয়াতেই প্রেমের সার্থকতা। নারী যেখানে সঙ্গিনীরূপে প্রিয়ের কর্ম্মসহচরী হইতে পারেন না, সেখানে তিনি পুরুষের পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইতে চান না। অবাধগতির মধ্যে তাহাকে মুক্ত করিয়া দিয়া মুহূর্ত্তমিলনের সহজপ্রাপ্তির মহিমাকে হৃদয়ের মধ্যে অক্ষয় অমর করিয়া তিনি রাখিতে পারেন।

"প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাব না ফাঁকি,
সীমারে মানিয়া তার মর্য্যাদা রাখি,
যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন,
যা পাইনি বড় সেই নয়।

চিত্ত ভরিয়া র'বে ক্ষণিক মিলন
চিরবিচ্ছেদ করি' জয় ॥"

'সবলা' কবিতাটিতে সবলা নারী বলিতেছেন—

"যাব না বাসর কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী,—
আমারে প্রেমের বীর্য্যে কর অশঙ্কিণী।"

পাতিব্রত্যের বিনম্র দীনতা বীর পতির সম্মানের যোগ্য নহে। লজ্জার দুর্ব্বল আচ্ছাদন হইতে বাহিরে আসিয়া সংসারের সংগ্রামের মধ্যে দুঃসহতম কার্য্যে বীর্য্যের ঝঙ্কারে রণোন্মত্তা থাকিয়া কেবলমাত্র মাথার অবগুণ্ঠন খুলিয়া তিনি প্রিয়কে এই কথা বলিয়া যাইতে চান "একমাত্র তুমিই আমার"। এই যে বীর্য্যের আবাহন "আবিরাবির্মএধি" এই যে নারীর অন্তরের জাগরণ ইহার মধ্যেই নারীর যথার্থ নারীত্ব। সেই নারীত্বের যথার্থ স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া দেহসৌখ্যের মিলন-সম্ভোগের হীনতার মধ্যে নারী তাহার মিলনকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতে চান না। তাঁহার রক্তে যে রুদ্র বীণা জাগ্রত হইয়াছে তাহার সঙ্গীতের মধ্য দিয়া তাহার যে মাহাত্ম্য ও মহিমা নির্ঝরিত হইয়া আসিতেছে তাহাকেই তিনি প্রেমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহাররূপে প্রিয়তমের নিকট অর্ঘ্য দিতে চান। সেইটুকু হইলেই তিনি সন্তুষ্ট, তারপর—

"সময় ফুরায় যদি, তবে তা'র পরে
শান্ত হোক সে নির্ঝর নৈঃশব্দ্যের নিস্তব্ধ সাগরে—" ॥

পুরুষও তেমনি নারীকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন,

"সেবা কক্ষে করি না আহ্বান"

যখন তিনি মধ্যাহ্নতপ্ত দুর্গম পথে অনিদ্রায় রজনী যাপন করিবেন, শুষ্ক বাক্য-বালুকার ঘূর্ণীপাকে যখন তিনি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবেন, তখন তাঁহার নিষ্কলুষা কল্যাণী দয়িতা আসিয়া তাঁহাকে মধুর শুশ্রূষায় সঞ্জীবিত করিবেন, ইহা তিনি চান না। তিনি চান,

"তোমার প্রবল প্রেম প্রাণভরা সৃষ্টির নিঃশ্বাস,
উদ্দীপ্ত করুক চিত্তে ঊর্দ্ধশিখা বিপুল বিশ্বাস।"

দেশময় মিথ্যা নিশাচর অস্তাচল-পথ রুদ্ধ করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে, আলো-আঁধারের বঞ্চনায় পথিক পথভ্রান্ত। মোহের দীক্ষায় বিধাতা আমাদিগকে ধিক্কৃত করিতেছেন; ভাগ্যের ভিক্ষুক কুটিল সিদ্ধির বহু-জন-উচ্ছিষ্ট প্রসাদকে আশীর্ব্বাদ মনে করিতেছেন; কুৎসার পঙ্কের গ্লানির ক্লেদে চারিদিক কর্দ্দমাক্ত, বঞ্চনার ভঙ্গুর ভেলায় লোকে দুর্য্যোগের সিন্ধু উত্তরণ করিতে চায়, অন্তরে বন্ধনকে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া বাহিরে মুক্তির অন্বেষণ করে। কলহকে শৌর্য্য বলিয়া মনে করে, ছলনাকে শক্তি বলিয়া জ্ঞান করে, মর্ম্মগত খর্ব্বতায় সর্ব্বকালকে খর্ব্ব করিয়া রাখে। এই তো নারীপ্রেমের আবাহনের উপযুক্ত সময়। সেই প্রেম আমাদের চিত্তে অভয় বাণী জাগাইয়া আমাদের মর্ম্মগত চিরসত্যকে কুজ্ঝটিকার আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া প্রকাশ করুক ও আমাদের চিত্তকে মহত্ত্বের উচ্চ শিখরে উত্তোলিত করিয়া তুলুক,

"হে বাণীরূপিণী, বাণী জাগাও অভয়,
কুজ্ঝটিকা চির সত্য নয়।
চিত্তেরে তুলুক ঊর্দ্ধে মহত্ত্বের পানে
উদাত্ত তোমার আত্মদানে।
হে নারী, হে আত্মার সঙ্গিনী,
অবসাদ হ'তে লহ জিনি',—
স্পর্দ্ধিত কুশ্রীতা নৃত্য যতই করুক সিংহনাদ,
হে সতী সুন্দরী, আনো তাহার নিঃশব্দ প্রতিবাদ।"

এই কবিতাটিতে দেখিতে পাই যে নারীর উদাত্ত আত্মদানের মধ্যে যে মহত্ত্ব উদ্ভাসিত হইতেছে তাহারই প্রেরণা দেশব্যাপী কুটিলতা, কলুষতা, মূঢ়তা ও শৌর্য্যহীনতার গ্লানি হইতে ঊর্দ্ধদিকে স্পন্দিত করিয়া আমাদিগকে মহত্ত্বের দিকে, মুক্তির দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।

নারীর সহিত আমাদের মিলনের লগ্ন আষাঢ়ের কদম্ব-কেশরের অভিষেকে নয়, ফাল্গুনের নাগকেশরের কেশরধূলায় নয়। আশ্বিনে যখন ধরণী প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণা, যখন তরঙ্গিণী তপস্বিনীবেশে সমুদ্রবন্দনানিরতা, যখন নীলাম্বর বাষ্পাভিষেক-নির্ম্মুক্ত, নির্ম্মল আলোক যখন শুভ্রব্রতা বনলক্ষ্মীকে আমাদের নয়নগোচর করে, শেফালি মালতী যখন পূজারিণী বেশে প্রণামলুণ্ঠিতা, রিক্তবিত্ত শুভ্র মেঘ যখন উদাসী সন্ন্যাসী হইয়া গৌরীশঙ্করের তীর্থের দিকে ভাসিয়া চলিয়াছে,—

"সেই স্নিগ্ধক্ষণে, সেই স্বচ্ছ সূর্য্যকরে,
পূর্ণতায় গম্ভীর অম্বরে
মুক্তির শান্তির মাঝখানে
তাহারে দেখিব যারে চিত্ত চাহে, চক্ষু নাহি জানে।"

নারী যখন পুরুষের সহিত সমান বীর্য্যে রণসঙ্গিনী জীবনযাত্রিণীরূপে দাঁড়াইতে পারেন না, তখনও তিনি পুরুষের গতি রোধ করিতে চান না। কিন্তু তাঁহার শুশ্রূষায়, তাঁহার আমন্ত্রণে, তাঁহার ভাষণে, তাঁহার পূজায়, তাঁহার প্রেমাস্পদের দুর্গম পথযাত্রায় যদি কিছু সাহায্য হয়, যদি তাঁহার স্নিগ্ধ চিত্তখানি তাহার অন্তরে অঙ্কিত থাকিয়া তাহার শ্রান্তি হরণ করে, যদি প্রেমের উদ্বোধনে, প্রেমের পরিচয়ে তাহার অজানা পথের সন্ধানের পরিচয় লাভের অনুকূল হয়, তবে সেই অনুকূলতাকেই তাঁহার সর্ব্বস্বসাধন বলিয়া মনে করেন। তাঁহার প্রেমে তিনি আপনাকে হারাইয়া কর্ম্মমগ্ন পুরুষের মধ্যে অশরীরীরূপে অবস্থান করিয়া তাহার সাধনফলের মধ্যে আপন সাধনফলকে সমাপ্ত করিয়া দেন। তাহার পথ তাঁহার পরমপ্রিয় ও পরম বরণীয়। যাত্রা যখন শেষ হইবে, নারীর প্রয়োজন যখন আর থাকিবে না, তখনও তিনি তাহারই উদ্দেশে তাঁহার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া সেই আনন্দে আপন মুক্তির সন্ধান পাইবেন। তিনি আপনার জন্য কিছু চান না, তিনি শুধু চান যে তাঁহার প্রেমের বিস্তার তাঁহার তীর্থগামী বন্ধুর অংশভূত হইয়া তাহারই সার্থকতার মধ্যে আপন চরম সার্থকতা লাভ করিবে।

দূর মন্দিরে সিন্ধু কিনারে
পথে চলিয়াছ তুমি।
আমি তরু মোর ছায়া দিয়া তারে
মৃত্তিকা তা'র চুমি।
হে তীর্থগামী, তব সাধনার
অংশ কিছু-বা রহিল আমার,
পথ পাশে আমি তব যাত্রার
রহিব সাক্ষীরূপে।
তোমার পূজায় মোর কিছু যায়
ফুলের গন্ধ ধূপে॥
তব আহ্বানে বরণ করিয়া
নিয়েছি দুর্গমেরে।
ক্লান্তি কিছু-বা নিলাম হরিয়া
মোর অঞ্চল-ঘেরে।
যা ছিল কঠোর, যাহা নিষ্ঠুর
তা'র সাথে কিছু মিলাই মধুর,
যা ছিল অজানা, যাহা ছিল দূর
আমি তারি মাঝে থেকে
দিনু পথপরে শ্যাম অক্ষরে
জানার চিহ্ন এঁকে॥
মোর পরিচয়ে তোমার পথের
কিছু রহে পরিচয়।
তব রচনায় তব ভকতের
কিছু বাণী মিশে রয়।
তোমার মধ্য দিবসের তাপে

আমার স্নিগ্ধ কিশলয় কাঁপে,
মোর পল্লব সে-মন্ত্র জপে
গভীর যা তব মনে,
মোর ফলভার মিলাত্ম তোমার
সাধন-ফলের সনে ॥
বেলা চলে যাবে, একদা যখন
ফুরাবে যাত্রা তব,—
শেষ হবে যবে মোর প্রয়োজন
হেথাই দাঁড়ায়ে রবো।
এই পথখানি রবে মোর প্রিয়,
এই হবে মোর চির বরণীয়,
তোমারি স্মরণে রব স্মরণীয়
না মানিব পরাভব।
তব উদ্দেশে অর্পিব হেসে
যা কিছু আমার সব ॥

"মুক্তরূপ" কবিতাটিতে দেখি যথার্থ প্রেম মানুষকে পৃথিবীর কর্ম্মাঙ্গনের মধ্যে মুক্তরূপে ছাড়িয়া দেয়, প্রেমিকা তাঁহার প্রাণের শক্তি প্রেমিকের প্রাণের মধ্যে উচ্ছ্বসিত করিয়া দেন, তাঁহার দুঃখযজ্ঞের শিখায় তাঁহার গভীর রাত্রি কাটিয়া যায়, তিনি শ্রদ্ধার পাথেয় দিয়া তাঁহার প্রেমিকের যাত্রাকে ধন্য করিয়া দিতে চান। যদি নির্দ্দয় সংগ্রামে মৃত্যু আসিয়া প্রেমিকের ললাটে অমৃতের টীকা দেয়, তাহা তিনি আপন জীবনজয়রেখার তিলক বলিয়া মনে করেন।

"তোমারে আপন কোণে স্তব্ধ করি যবে
পূর্ণরূপে দেখি না তোমায়,
মোর রক্ত তরঙ্গের মত্ত কলরবে
বাণী তব মিশে ভেসে যায়।

তোমার পাথারে আমি রুদ্ধ করি বুঝি,
সে-বন্ধনে তোমারেই পাই না তো খুঁজি',

*   *   *

বিরাজে মানব-শৌর্য্যে সূর্য্যের মহিমা,
মর্ত্তে সে তিমির-জয়ী প্রভু,
অজেয় আত্মার রশ্মি, তা'রে দিবে সীমা
প্রেমের সে ধর্ম্ম নহে কভু।
যাও চলি রণক্ষেত্রে, লও শঙ্খ তুলি'
পশ্চাতে উড়ুক তব রথচক্র ধূলি,
নির্দ্দয় সংগ্রাম অন্তে মৃত্যু যদি আসি'
দেয় ভালে অমৃতের টীকা
জানি যেন সে-তিলকে উঠিল প্রকাশি',
আমারো জীবন-জয়-লিখা।"

'স্পর্দ্ধা' কবিতাটিতে দেখা যায় যে নারী কামের লালসাকে দুঃসহ ঘৃণায় বর্জ্জন করেন,

"শ্লথপ্রাণ দুর্ব্বলের স্পর্দ্ধা আমি কভু সহিব না।
লোলুপ সে লালায়িত, প্রেমেরে সে করে বিড়ম্বনা,
ক্লেদঘন চাটুবাক্যে বাষ্পে বিজড়িত দৃষ্টি তা'র,
কলুষ-কুণ্ঠিত অঙ্গে লিপ্ত করে গ্লানি লালসার,
আবেশ মন্থর কণ্ঠে গদগদ সে প্রার্থনা জানায়,

*   *   *

জীর্ণমজ্জা কাপুরুষে
নারী যদি গ্রাহ্য করে, লজ্জিত দেবতা তা'রে দূষে
অসহ্য সে অপমানে। নারী সে-যে মহেন্দ্রের দান
এসেছে ধরিত্রীতলে পুরুষেরে সঁপিতে সম্মান॥"

পুরুষের দুঃসাধ্যসাধনের ব্রত যদি নারীর কর্ণকুহরে মন্ত্রিত নাও হয়, যদি তাহার সহিত তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় নাও ঘটে, যদি কেবল মাত্র দূর রণাঙ্গনের মধ্যে সমুদ্র তরঙ্গরবে তাহার হ্রেষাধ্বনি, তাহার অস্ত্রের ঝন্‌ঝনি মাত্র শোনা যায়, তথাপি তিনি তাঁহার চিত্তের অন্তরালে বসিয়া গোপন রজনী জাগিয়া সেই বীরের উদ্দেশে আপন বরমাল্য অর্ঘ্য-থালায় সাজাইয়া রাখেন; লালসা-লোলুপের দিকে তিনি ফিরিয়া চান না। শৌর্য্যের মধ্যে অপরিচয়ের যে পরিচয় সেই বীর লাভ করেন, তাহা দ্বারাই তিনি নারীর বীরবরমাল্য অর্জ্জন করেন।

'আহ্বান' কবিতাটিতে নারী পুরুষকে ডাকিয়া বলিতেছেন যে, তিনি তাঁহার বন্ধন নন, তিনি তাঁহার পথের সম্বল। দুর্গম নীরস নিষ্ঠুর আতিথ্যবিহীন পথে যখন তিনি চলিবেন তখন ক্লান্তিহীন সঙ্গ দিয়া নিঃশঙ্ক অন্তরে শুশ্রূষার পূর্ণ শক্তি দিয়া তিনি তাঁহার সেবায় নিরত থাকিবেন। সে সেবা এমন যে,

"শুকায় না রসবিন্দু প্রখর নির্দ্দয় সূর্য্য তেজে;
নীরস প্রস্তর তলে দৃঢ়বলে রেখে দেয় সে-যে
অক্ষয় সম্পদরাশি। সহাস্য উজ্জ্বল গতি তা'র
দুর্য্যোগে অপরাজিত, অবিচল বীর্য্যের আধার॥"

নারী পুরুষকে বলিতেছেন,

"তোমারে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্যা কখনো কহিনি",

তাঁহার মনে হইতেছে

"কোন' দিন ফুরাবে না
পরিচয়, তোমারে বুঝিব আমি করি না সে আশা,
কথায় যা বলো নাই, আমি যে জানি না তা'র ভাষা।
ভয় হয় পাছে
যে-সম্পদ চেয়েছিলে মোর কাছে
সে-যে মোর নাই, তাই শেষে পড়ে ধরা,
দেখো দূর হ'তে এসে জলাশয়ে জল নাই ভরা।"

কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করিতেছেন যে নারীর কামনা পরিপূরণের জন্য প্রেমাস্পদ তাঁহার নিকট হইতে কিছু লাভ করিবেন বলিয়া তাঁহার নিকট আসেন নাই, তিনি আসিয়াছেন তাঁহার দেবার আনন্দ পরিপূর্ণ করিবার জন্য।

"নহে নহে, হে রাজন্, তোমার অনেক ধন আছে,
তাই তুমি আস মোর কাছে
দেবার আনন্দ তব পূর্ণ করিবার লাগি
যদি তাই পূর্ণ হয়, তবে আমি নহি তো অভাগী ॥"

পুরুষের আত্মবিলয়নের ও আত্মদানের আনন্দের মধ্যেই নারীর সার্থকতা যে পুরুষ নারীর কামনা পরিপূরণের জন্য আসে সে হয় ব্যর্থ, যে আসে তাহার সমগ্র প্রেমের স্রোতে তাহার আপন দানের মত্ততায়, তাহার আপন হৃদয়পদ্মের সৌরভবিকিরণের স্বাভাবিক বেগমূর্ত্তিতে সূর্য্যের আলোর ন্যায়, আকাশের বর্ষণের ন্যায়, তাহার সেই প্রেম নারী-ধরিত্রীকে ধন্য করে, উজ্জ্বল করে, জীবনময় করে

যুগ যুগান্ত ধরিয়া বিশ্ব ভরিয়া শক্তির যে আদিম তপস্যা চলিয়াছে, সেই তপস্যাই তাহার অক্লান্ত দুর্গম সাধন পথ বহিয়া আমাদের চিত্তকোরক উন্মেষিত করিয়া প্রেমের মহাসৃষ্টিকে আমাদের মধ্যে উদ্ভাসিত করিয়াছে। যে প্রেমদৃষ্টিতে একজন আর একজনকে দেখে, যে মোহন মন্ত্রে একজন আর একজনের চক্ষুতে সুন্দরতম হইয়া প্রতিভাত হয়, যে জ্যোতির সঙ্কেতে একজনের অনন্তরূপের মধ্যে আর একজন আপনার গভীর সত্য আবিষ্কার করে সে তো চোখের দেখা নয় ত্বগিন্দ্রিয়ের স্পর্শ নয়, সে যে মহতী সৃষ্টি। সে সৃষ্টি জ্ঞানের সৃষ্টি নয়, ধ্যানের সৃষ্টি নয়, রূপের সৃষ্টি নয়, জীবনের সৃষ্টি নয়, সে অন্তরাত্মার সমগ্র মিলনের সৃষ্টি।

"অন্তহীন কাল আর অসীম গগন
নিদ্রাহীন আলো
কি অনাদি মন্ত্রে তা'রা অঙ্গ ধরি
তোমাতে মিলালো।

যুগে যুগে কী অক্লান্ত সাধনায়
অগ্নিময়ী বেদনায়,
নিমেষে হ'য়েছে ধন্য শক্তির মহিমা
পেয়ে আপনার সীমা
ওই মুখে, ওই চক্ষে, ওই হাসিটিতে।"

ইহার পরে "নাম্নী" কবিতাগুলির মধ্যে প্রকৃতির বিচিত্র সৃষ্টির অনুরূপে নারীর বিচিত্র রূপ অঙ্কিত হইয়াছে। যাহাকে শ্যামলী বলা হইয়াছে—

"সে যেন গ্রামের নদী
বহে নিরবধি
মৃদু মন্দ কলকলে;
তরঙ্গের ভঙ্গী নাই, আবর্ত্তের ঘূর্ণি নাই জলে।
* * *
সায়াহ্নের শান্তিখানি নিয়ে ঘোমটায়
নদীপথে যায়
ঘট কাঁখে বেণুবীথিকার বাঁকে বাঁকে
ধীর পায়ে চলি'—"

যিনি কাজলী,

"প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে চিত্ত তা'র নত
স্তম্ভিত মেঘের মতো
তৃষ্ণাহরা
আষাঢ়ের আত্মদান-প্রত্যাশায় ভরা
* * *
সুগম্ভীর স্নিগ্ধ অশ্রুবারি;
যেন তাহা দেবতারি করুণা-অঞ্জলি,—"

যিনি হেঁয়ালি, তাঁর অন্তরে যে বিরোধ রহিয়াছে তাহাতে তাহার গতিচ্ছন্দে সর্ব্বদা যেন একটা অভাবনীয়কে টানিয়া আনে।

"যারে সে বেসেছে ভাল তারে সে কাঁদায়।

* * *

কেন তার চিন্তাকাশে সারা বেলা
পাগল হাওয়ার এই এলোমেলো খেলা!
আপনি সে পারে না বুঝিতে
যেদিকে চলিতে চায় কেন তা'র চলে বিপরীতে!"

যিনি খেয়ালী, তার

"উদাস হয়েছে মন সে-যে কোন্ কবি কল্পনাতে।
সুদূরের বেদনায় অতীতের অশ্রু বাষ্প হৃদয়ে ঘনায়।
বীরের কাহিনী না-দেখা জনের লাগি'
তা'রে যেন করে বিরহিণী॥"

যিনি কাকলী,

"কলচ্ছন্দে পূর্ণ তার প্রাণ,—নিত্য বহমান"

অরণ্যের পাতায় পাতায়, আশ্বিনের ধানের ক্ষেতে, তারায় তারায়, মহুয়ার বনে, মধুর গুঞ্জনে, যে কথাটি গুঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাই যেন তাহার মধ্য দিয়া সঙ্গীতের তরঙ্গ তুলিয়া প্রাত্যহিক জড়তাকে মুখর করিয়া তুলিতেছে।

যিনি পিয়ালী,

"চাহনি তাহার, সব কোলাহল হ'লে সারা।
সন্ধ্যার তিমিরে ভাসা তারা।

* * *

নাও যদি কয় কথা
মনে যেন ত'রি স্নেহ সুস্নিগ্ধ মমতা।"

যিনি দিয়ালী, তিনি

"ললাটে ঘোমটা টানি' দিবসে লুকায়ে রাখে নয়নের বাণী।
রজনীর অন্ধকার
তুলে দেয় আবরণ তা'র।

* * *

আপন সহস্র দীপ জ্বালি'
—নাম কি দিয়ালী?"

যিনি নাগরী,

"বুদ্ধি তার ললাটিকা,
চক্ষুর তারায় বুদ্ধি জ্বলে দীপশিখা;
বিদ্যা দিয়া রচে নাই পণ্ডিতের স্থূল অহঙ্কার,
বিদ্যারে ক'রেছে অলঙ্কার।

* * *

আপন তপস্যা ল'য়ে যে পুরুষ নিশ্চল সদাই,
যে উহারে ফিরে চাহে নাই,
জানি সেই উদাসীন
একদিন
জিনিয়াছে ওরে,
জ্বালাময়ী তারি পায়ে দীপ্ত দীপ দিল অর্ঘ্য ভ'রে।"

যিনি সাগরী,

"বাহিরে সে দুরন্ত আবেগে উচ্ছলিয়া উঠে জেগে,—

* * *

গভীর অন্তর তা'র নিস্তব্ধ গভীর,
কোথা তল, কোথা তীর;
অগাধ তপস্যা যেন রেখেছে সঞ্চিত করি,'—"

যে জয়ন্তী,

"দুঃসাধ্য সাধন তরে পথ খুঁজে মরে।
তুচ্ছতারে দাহে তা'র অবজ্ঞা-দহন;
এনেছে সে করিয়া বহন
ইন্দ্রাণীর গাঁথা মালা; দিবে কণ্ঠে তা'র
কার্ম্মুকে যে দিয়েছে টঙ্কার",

যে ঝামরী,

"সে যেন অকালে ফোটা কুবলয়,
শিশিরে লুণ্ঠিত হ'য়ে রয়।

পথরুদ্ধ চারিধারে,
মুখ ফুটে বলিতে না পারে
অলক্ষ্য কী আচ্ছাদনে কেন সে আবৃতা।"

সুরতীর মূর্ত্তি দিতে গিয়া কবি বলিতেছেন

"রঙীন বুদ্বুদ সে কি, ইন্দ্রধনু বুঝি,
অন্তর না পাই খুঁজি'—
সকলি বাহির,
চিত্ত অগভীর।
কারো পথ চেয়ে নাহি থাকে,
কারেও না-পাওয়ার দুঃখ মনে নাহি রাখে।"

যে মালিনী, সে যেন প্রভাতের সূর্য্যমুখী, মধ্যাহ্নের স্থলপদ্ম, সায়াহ্নের যুঁই, রাত্রির রজনীগন্ধা,

"প্রসন্নতা তা'র অন্তহীন
রাত্রিদিন
গভীর কী উৎস হ'তে
উচ্ছলিছে আলো-জ্বলা কথা-বলা স্রোতে।"

যে করুণী,

"তাহার মমতা

সকল প্রাণীর 'পরে বিছায়েছে স্নেহের সমতা ;

* * সে তরুলতারি মতো স্নিগ্ধপ্রাণ তা'র ;

শ্যামল উদার

সেবাযত্ন সকল শান্তিতে

ঘনচ্ছায়া বিস্তারিয়া আছে চারিভিতে,"

যে প্রতিমা সে যেন চতুর্দ্দশীর চন্দ্রমা,

"দুঃখেশোকে অবিচল, ধৈর্য্য তার প্রফুল্লতাভরা,

সকল উদ্বেগ-ভার-হরা, * *

দুর্য্যোগ মেঘের মতো

নীচে দিয়া ব'হে যায় কত

বারে বারে,

প্রভা তা'র মুছিতে না পারে।"

যে নন্দিনী,

"প্রথম সৃষ্টির ছন্দখানি

অঙ্গে তার নক্ষত্রের নৃত্য দিল আনি'।

* * বীণার তন্ত্রের মতো গতি তার সঙ্গীত-স্পন্দিনী,"—

যে উর্বসী, সে যেন ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের অরুণোদয়ের নব জাগরণের শিহরণ, ধ্যানমগ্ন অব্যক্ত বিরাট আশা।

"চিত্ত তা'র আপনার গভীর অন্তরে

নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে

পরিপূর্ণ সার্থকতা লাগি'।

সুপ্তি মাঝে প্রতীক্ষিয়া আছে জাগি,

নির্ম্মল নির্ভয়

কোন্ দিব্য অভ্যুদয়!"

কোন্ সে পরমা মুক্তি, কোন্ সেই আপনার
দীপ্যমান মহা আবিষ্কার !"* *

সোনার বীণায় তার সঙ্গীত আনিছে কোন্ গুণী।
জাগিবে হৃদয়,
ভুবন তাহার হবে বাণীময়।"

নাম্নী কবিতাগুলি পড়িলে দেখা যায় যে প্রকৃতিলোকের মধ্যে যেমন সৃষ্টিঃ নানা বৈচিত্র্য হৃদয়ের মধ্যে নানা ভাবকে মূর্ত্ত করিয়া তোলে, নারীলোকের মধ্যেও তেমনি নানা মূর্ত্তি সৃষ্টির নানা বিচিত্রতাকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে! প্রকৃতি-লোক ও নারীলোক যেন একই ছন্দে গাঁথা। উভয়ের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হয় আমাদের ভাবলোকে। যেমন প্রকৃতি-সৃষ্টির সার্থকতা আমাদের ভাবলোকের মধ্যের মিলনে, নারীলোকেরও সার্থকতা তেমনি আমাদের সেই অন্তর-লোকের মিলনে।

ছায়ালোক কবিতাটিতে নারী বলিতেছে,

"যেথায় তুমি গুণী জ্ঞানী, যেথায় তুমি মানী,
যেথায় তুমি তত্ত্ববিদের সেরা,
আমি সেথায় লুকিয়ে যেতে পথ পাব না জানি,
সেথায় তুমি লোকের ভিড়ে ঘেরা।"

কিন্তু যেখানে তাহার প্রাণে তীক্ষ্ণ চক্ষুর কোন প্রশ্ন নাই, হৃদয়ের দ্বার অসতর্ক ও মুক্ত, যেখানে তিনি দৃষ্টিকর্ত্তা নন, রস-রচনার সৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্ত্তা, সেইখানেতে নারীর সহিত তাঁহার মিলন। সেইখানেতে তিনি,

"দেখবে আমায় স্বপন-দেখা চোখে
চম্‌কে উঠে বলবে তুমি 'ও কে,
কোন্ দেবতার ছিল মানসলোকে
এলো আমার গানের ডাকে ডাকা।'
সে-রূপ আমার দেখবে ছায়ালোকে
যে-রূপ তোমার পরাণ দিয়া আঁকা।"

নারীর সহিত পুরুষের যে মিলন তাহা দেহলোকের মধ্যে নহে, অন্তরের অর্দ্ধপ্রচ্ছন্ন ছায়ালোকের মধ্যে,

"ছায়ায় ঢাকা আধেক-দেখা তোমার বাতায়নে,—
যে-মুখ তোমার লুকিয়েছিল সে-মুখ আঁকি মনে।"

ছান্দোগ্য উপনিষদের অনুকরণে কবি বলেন যে নারীর অজর অমর মূর্ত্তি, আদর্শে তাহার যে প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় তাহার মধ্যে নহে—নারীর দেহ তাহার ছায়া নয়। তাহা দ্বারা বহিরঙ্গনে নৃত্য করা যায় অন্তর মন্দিরে প্রবেশ করা যায় না।

"জান নাকি, হে রমণী, দর্পণে যা দেখিছ তা ছায়া,
পারে না রচিতে কভু তাই দিয়ে চিরস্থায়ী মায়া।
* * লয়ে আত্ম নিবেদন,
গৌরবে জিনিলা শচী ইন্দ্রলোকে নন্দন আসন।"

ইহার পরে দেখা যায় যে ভাবলোকে মিলনের নানা চিত্র কবির চিত্তপটে প্রভাত আকাশের বর্ণচ্ছটার চঞ্চল ভঙ্গীতে দোল খাইতেছে। 'একাকিনী'কে দেখিয়া তিনি বলিতেছেন,

"অনাদি বিরহ রস, তাই দিয়ে ভরিয়া আঁধার
কোন্ বিশ্ব বেদনার মহেশ্বরে দেয় উপহার।
* * মিলায়েছ, সুগভীর দুঃখের মাঝারে
যে-মুক্তি র'য়েছে লীন বন্ধহীন শান্ত অন্ধকারে।
* * অনন্তেরে সম্বোধিয়া কহিল সে উর্দ্ধে তুলি' আঁখি,
'তুমিও একাকী'।"

'নববধূ'কে তিনি বলিতেছেন,

"র'য়েছে কঠোর দুঃখ, র'য়েছে বিচ্ছেদ,
তবু দিন পূর্ণ হবে, রহিবে না খেদ,

যদি ব'লে যাও, বধূ, আলো দিয়ে জেলেছিনু আলো,
সব দিয়ে বেসেছিনু ভালো ॥"

আর একজনকে তিনি বলিতেছেন,

"আজি বসন্ত চিরবসন্ত হোক্,
চিরসুন্দরে মজুক্ তোমার চোখ।
প্রেমের শান্তি চিরশান্তির বাণী
জীবনের ব্রতে দিনে রাতে দিক্ আনি,'
সংসারে তব নামুক্ অমৃতলোক' ।"

'বিদায়' কবিতাটিতে মৃত্যুপথে বিলীয়মানা নারী বলিতেছেন

"সবচেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম।
তা'রে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্ত্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে। * *
তোমার হয়নি কোনো ক্ষতি
মর্ত্তের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃত মূরতি
যদি সৃষ্টি ক'রে থাকো, তাহারি আরতি
হোক তব সন্ধ্যাবেলা,
পূজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ লেগে;
* * হে ঐশ্বর্য্যবান্
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান;
গ্রহণ ক'রেছো যত ঋণী তত ক'রেছো আমায়।
হে বন্ধু বিদায় ॥"

মহুয়া কাব্যখানির মধ্যে কিংশুক, অশোক, বকুল ও মালতী মল্লিকার রূপ ও

গন্ধের লঘু আহ্বান নাই। অরণ্য-সভায় বনস্পতির গোষ্ঠি মধ্যে শাল তাল সপ্তপর্ণ অশ্বথের সহিত আকাশের দিকে শাখা বাড়াইয়া মহুয়া-পুষ্পের সূর্য্যাভিনন্দনের গভীর বন্দনা চলিয়াছে। অপ্রসন্ন আকাশের ভ্রূভঙ্গে অরণ্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে, কালবৈশাখীর রুদ্ধ কলরোলে যখন মুক্তপথচারী বিহঙ্গম আর্ত্ত হইয়া উঠে, মহুয়া তখন তাহার শাখাব্যূহের মধ্যে তাহাকে আশ্রয় দেয়। অনাবৃষ্টির ক্লিষ্টদিনে বন্য বুভুক্ষুরা তাহার তলায় দুর্ভিক্ষের ভিক্ষাঞ্জলি ভরিয়া নেয়। বহু দীর্ঘ সাধনা সুদৃঢ় উন্নত তপস্বীর ন্যায় বিলাসের চাঞ্চল্যবিহীনতায় সুগম্ভীর হইয়া সে দাঁড়াইয়া আছে। অথচ তাহার অন্তরের মধ্যে অধীর বসন্তের ফাল্গুনীর পুষ্পদোলে তাহার পুষ্পপুট পূর্ণ করিয়া মদিরার রস উচ্ছল হইয়া উঠিতেছে। বনে বনে তাহার গন্ধে মধু মক্ষিকারা চঞ্চল হইয়া উঠে, বন্য নারীরা সেই সুরামন্ত্র হইতে তাহাদের পূর্ণিমার নৃত্যমত্ততার সম্বল সংগ্রহ করে। তরল যৌবন-বহ্নি তাহার মজ্জায় মজ্জায় তাহাকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে অথচ সে অটল কঠিন। সমস্ত মহুয়া কাব্যের মধ্যে নারীর যৌবন-বহ্নি, তাহার মদিররস, তাহার উদ্দাম আকর্ষণ, তাহার ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যের সহিত, তাহার আশ্রয়চ্ছায়ার সহিত, তাহার উর্দ্ধোন্নত মুক্তিচারী অনন্তের আহ্বানের সহিত কেমন কঠিনে মধুরে মিলন ঘটিয়াছে তাহাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির সহিত নারী ও নরলোকের যে একটি অচ্ছেদ্য বন্ধন রহিয়াছে, নানা বন্ধনের মধ্য দিয়া নারীপ্রেম যে বিচিত্র মুক্তির ইঙ্গিতে আমাদের অন্তরাত্মাকে শিহরিত করিয়া দেয়, সে শিহরণ যে শুধু অন্তরের ভাবোচ্ছ্বাসের কারাগৃহের মধ্যে, আপন অনুভবের মুক্তি-সঙ্গীতের মধ্যে আবদ্ধ তাহা নয়, তাহা মানুষকে নরসমাজের ও প্রকৃতিলোকের বিচিত্র, দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রামের মধ্যে মৃত্যুর মধ্যে, বিরহের মধ্যে দুঃখ-সন্তাপের মধ্যে ধৈর্য্যে অটল, গতিতে বাধাবিহীন মুক্তিবিহারী করিয়া তোলে। তাহারই আঘ্রাণ মহুয়া কাব্যের মধ্য হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। মনে হয় যেন নারীপ্রেমের অনুভব ও কল্পনা মানুষের চিত্তলোকে যা কিছু দীপ্তি, যা কিছু বর্ণচ্ছটা, যা কিছু তপস্যা, যা কিছু শৌর্য্য, বীর্য্য ও অগ্নিদীক্ষা আনিতে পারে, মহুয়ার পর্ণপুটে কবি তাহা নিঃশেষে ভরিয়া দিয়াছেন। রবি যেন তাঁহার

আকাশের উত্তুঙ্গ শিখরে সমাসীন হইয়া মহাজ্যোতিঃসম্পাতে মনুষ্যলোক ও প্রকৃতি লোককে যুগপৎ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন।

মহুয়ার পরবর্ত্তী যুগ

"বলাকা" সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রবাহের একটা নূতন দিক সম্বন্ধে সচেতন হোয়ে উঠেছিলেন। সেদিকটা হোচ্ছে বিশ্বের গতির দিক। যাকিছু আমাদের চারিদিকে আমরা বাহিরে দেখি এবং যাকিছু আমাদের অন্তরের মধ্যে আমরা অনুভবে পাই এই সমগ্রটি নিয়ে আমাদের বিশ্ব। এই বিশ্ব যে কেবল চলেছে তা নয়, কেবল যে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত নূতন নূতন ছবি পাচ্ছি, তা নয়, প্রত্যেক ছবির, প্রত্যেকটি বস্তু, প্রত্যেকটি প্রতিভাস যেন আর কিছুই নয় কেবল গতির সংঘাত। গতির সংঘাতে প্রতিভাসিত হয়ে উঠছে নূতন নূতন বস্তু। যখন রজ্জুকে আমরা সর্প বোলে গ্রহণ করি তখন সেই সর্পের আবির্ভাবকে বৈদান্তিকরা বলেছেন প্রতিভাসিক সত্য। প্রতিভাসিক সত্য হোচ্ছে সেই রকমের বস্তু যার সম্বন্ধে একটা প্রতীতি হয়, একটা বোধ হয় কিন্তু সেটা আসলে সত্য নয়, তত্ত্বদৃষ্টিতে চিন্তা কোরলে এই রকম প্রতিভাসিক প্রতীতির মধ্যে যে একটা স্বগত বিরোধ আছে সেটা যে ভ্রম এবং মিথ্যা, সেটা যে চিরন্তন সত্য নয় সেকথা বোঝা যায়। তেমনি চঞ্চলা কবিতাটিতে এবং আরও অন্য দুচারটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই কথাই প্রকাশ কোরতে চেয়েছেন বলে মনে হয় যে যাকে আমরা বস্তু বলি সেইগুলি যথার্থভাবে বস্তু নয়। কিন্তু সেগুলিই হোচ্ছে নিত্য প্রবহমান ঘটনা, ব্যাপার, সচলতা বা ক্রিয়ার স্রোত মাত্র। এই ঘটনার স্রোত, এই ব্যাপারের স্রোত, এই স্পন্দ স্বরূপ ক্রিয়ার স্রোত ছুটে চলেছে; প্রতি মুহূর্ত্তে সেই গতির মধ্যে স্রোতের মধ্যে যেন বুদ্বুদের মত গতি সংঘাতের নূতন নূতন রূপ ফুটে উঠছে, সেই গুলিকে আমরা বলি বস্তু। সেইগুলিকেই ক্রিয়ার স্রোত থেকে আমাদের বুদ্ধির মুঠির মধ্যে

আমরা ধরে রাখতে চাই এবং বস্তু বলে তার আখ্যা দিই এবং এই ভ্রমের জন্তেই আমরা মনে করি যে বস্তু ক্রিয়া থেকে ভিন্ন; জল যেমন ভিন্ন তার স্রোত থেকে। কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখতে গেলে সমস্ত বস্তুর স্বরূপের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে একটা অখণ্ড গতির প্রবাহ। একটা বস্তুর পর যে আর একটী বস্তু আমাদের চোখে পড়ে সেটা হোচ্ছে বস্তুর প্রবাহ কিন্তু এ তা নয়। এই দৃষ্টিতে বস্তুরূপে বস্তুর কোন সত্বা নাই। বস্তু হোচ্ছে ক্রিয়া স্রোতের একটা মায়িক সৃষ্টি মাত্র তাই প্রবাহের সঙ্গে বস্তুর কোন ভেদ নেই, প্রবাহই একমাত্র সত্য, প্রবাহের একটী কাল্পনিক মূর্ত্তিই হোচ্ছে বস্তু।

ইয়োরোপীয় দর্শনে বের্গস্‌ঁ বিশেষ ভাবে এই মত প্রকাশ কোরতে চেষ্টা কোরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে সমগ্র বিশ্বে আর কিছুই নেই আছে কেবল একটা গতি বা স্পন্দ প্রবাহ। আমাদের অন্তরের দিব্যদৃষ্টিতে আমরা যদি বস্তুর মোহ থেকে আমাদের মনকে মুক্ত কোরে নিতে পারি তাহোলে একটা অন্তঃ-সাক্ষাৎকারের দ্বারা এই স্পন্দ-স্বরূপকে প্রত্যক্ষ কোরতে পারি। আমাদের বুদ্ধির স্বভাবই এই যে সে স্পন্দকে গ্রহণ কোরতে পারে না। স্পন্দকে গ্রহণ কোরতে গেলেই সে তাকে টুকরো কোরে একটা অবয়ব দিয়ে তাকে গ্রহণ কোরে থাকে। তাই বুদ্ধি দিয়ে আমরা স্পন্দকে দেখতে পাই না, দেখতে পাই স্পন্দের একটা বিকৃত রূপ, এই বিকৃত রূপটী একটি Geometrical figure বা আকার ও সংস্থানরূপে, বস্তুরূপে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষীভূত হয়। একটা পাত্রে যদি অনেক খানি দুধ থাকে আর সেই দুধ লেবুর রসে কিঞ্চিৎ পূর্ণ কোন পাত্র দিয়ে পূর্ব্ব পাত্র থেকে উঠিয়ে নি তবে সেই পাত্রে তুলে নেওয়া দুধটা তৎক্ষণাৎ দধি হয়ে যাবে। আমাদের মনে হবে যে পূর্ব্ব পাত্রটি যেন দধিতেই পরিপূর্ণ। যে পাত্র দিয়ে আমরা দুধ তুললাম সেই পাত্রের গুণেই দুধ দধিরূপে প্রকাশ পেয়েছে তা আমাদের মোটেই মনে হবে না, তেমনি বুদ্ধির পাত্র দিয়ে প্রবাহকে স্পর্শ করা মাত্রই প্রবাহ জমাট বেঁধে বস্তু হোয়ে আমাদের চোখের সামনে দেখা দেয়। দধি থেকে যেমন আর দুধ ফিরে পাওয়া যায় না তেমনি বস্তু থেকে

প্রবাহে ফিরে যাওয়া যায় না। তাই বস্তুর সঙ্গে ক্রিয়ার কি সম্বন্ধ তা বোঝাতে গিয়ে দার্শনিকেরা চিরকালই গলদ্‌ঘর্ম্ম হোয়েছেন। বস্তুটা বস্তু নয় সেটা স্পন্দ বা প্রবাহেরই একটা কল্পিত ধর্ম্ম মাত্র এই দৃষ্টিতে দেখলে বস্তু ও ক্রিয়ার দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয়; তাহলে যথার্থ সিদ্ধান্ত হোল একটা স্পন্দের অদ্বৈত বাদ অর্থাৎ স্পন্দ বা প্রবাহই একমাত্র সত্য। বস্তু একটা প্রতিভাসিক কাল্পনিক বা মায়িক সৃষ্টি মাত্র।

বলাকার পরবর্ত্তী যুগে লিখিত অধিকাংশ কবিতাতেই আমরা দেখতে পাই যে রবীন্দ্রনাথের মন এই স্পন্দ-দৃষ্টিতে বা প্রবাহ-দৃষ্টিতে একেবারে রঞ্জিত হোয়ে উঠেছে। এই দৃষ্টিটি কিন্তু উপনিষদের সংস্কারে আচ্ছন্ন রবীন্দ্রচিত্তের সম্পূর্ণ বিরোধী, কারণ উপনিষদ বারংবার বোলেছেন অথবা উপনিষদের অনেক মনীষী ব্যাখ্যাতারা এই কথাই বলেছেন যে জগতের মধ্যে আমরা যে ব্যাপার, স্পন্দন বা প্রবাহ দেখতে পাই সেটা তার সত্য রূপ নয়, জগতের যথার্থ সত্যরূপ হোচ্ছে বিশুদ্ধ সত্ত্বা মাত্র। সে সৎ স্বরূপের মধ্যে কোন গতি নাই, কোন প্রবাহ নাই। রবীন্দ্রনাথের "বলাকায়" প্রকাশিত নূতন দৃষ্টির সঙ্গে তাঁর পুরাতন সংস্কারের তাই বাধলো দ্বন্দ্ব। তাই দেখতে পাই যে পরবর্ত্তীকালের কোন কোন গ্রন্থে তিনি দুটোকেই একসঙ্গে স্বীকার কোরেছেন। জীবনকে দেখছেন প্রবাহরূপে, স্পন্দ-রূপে আর তার অন্তরালে, তার গভীরতম প্রদেশে ব্যাপ্ত হোয়ে রয়েছে গতিহীন স্পন্দহীন সৎস্বরূপ।

বনবাণী

১৩৩৮ সনে আশ্বিন মাসে প্রকাশিত "বনবাণী"র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এই সংস্বরূপ যে প্রাণ-স্পন্দনেরই একটা স্বরূপ এই কথা স্বীকার কোরে দুটো মতের মধ্যে একটা সেতু নির্ম্মাণ কোরেছেন। এই ভাবটাও বের্গসঁর মধ্যে দেখা যায়। স্পন্দকেই একমাত্র সত্য বোলে স্বীকার কোরেই তিনি বলেছেন যে এই স্পন্দ স্বরূপের যে অন্তঃস্পর্শ সেটা হোচ্ছে একটা অখণ্ড স্থায়িতা বা Dura। রবীন্দ্রনাথ বনবাণীতে বলছেন, "আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী, "বৃক্ষইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক", শুনেছিলেন "যদিদংকিঞ্চসর্ব্বং প্রাণএজতি নিঃসৃতং"। তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন "কেন প্রাণঃ প্রথমং প্রৈতি-যুক্তঃ"। প্রথম প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে? সেই প্রৈতি সেই বেগ থামতে চায় না, রূপের ঝরণা অহরহঃ ঝরতে লাগলো, তার কত রেখা, কত ভঙ্গী, কত ভাষা, কত বেদনা! সেই প্রথম প্রাণ-প্রৈতির নব নবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে?" বের্গস'র ভাষায় বোলতে গেলে এটি হোচ্ছে Elan vital।

এই ভূমিকারই আর এক জায়গায় তিনি বোলছেন "এই গাছগুলো বিশ্ব-বাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতারা ছন্দের নাচন, যদি নিস্তব্ধ হোয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তা হ'লে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে, মুক্তি সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের কূলে যে-সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত আর গভীর তলে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা-শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। "এতস্যৈব আনন্দস্য মাত্রাণি" দেখি ফুলে ফলে পল্লবে; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্ম্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।"

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুরাণো উপনিষদের সংস্কারকে নূতন দৃষ্টির আলোতে পরিবর্ত্তিত কোরে দেখেছেন। উপনিষদ্ যেখানে বলেছেন "আনন্দরূপং অমৃতং যদ্বিভাতি" কিম্বা "আনন্দাদ্ধ্যেব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন যাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়োন্তি অভিসংবিশন্তি তদ্ ব্রহ্ম।" সেই আনন্দকেই উপনিষদ্ সৎস্বরূপ বোলে বর্ণনা কোরেছেন কিন্তু এখানে রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বোলতে চেষ্টা কোরেছেন যে শক্তির যে স্পন্দরূপ, প্রবাহে প্রবাহে নানা লীলায় ঝরে পড়ছে তারই আদিম স্বরূপ হচ্ছে পরমাশক্তির নিস্তব্ধ আনন্দরূপ। স্তব্ধতা ও স্পন্দের মধ্যে যথার্থ কোন পার্থক্য নেই। স্পন্দের পরমার্থ স্বরূপই হোচ্ছে একটি আনন্দের অদ্বৈততা, গাছ যেমন নানা স্পন্দের মধ্যে আপনার জীবনকে প্রবাহিত কোরে দিয়েও স্তব্ধ ও অচঞ্চল হোয়ে রয়েছে তেমনি বিশ্বপ্রবাহের পরমার্থ সত্যও পরমশক্তিময় বলেই তার সমস্ত শক্তিকে নিজের মধ্যে সংহৃত কোরে আনন্দের চরমরূপে স্থির হোয়ে রয়েছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গীকে একেবারে আকস্মিক বোলে বলা যায় না। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এইখানেই তাঁর বোধ হয় পার্থক্য ছিল যে তিনি জগতের অন্তরালবর্ত্তী পরমার্থ সত্যকে একান্তভাবে স্থির বোলে মনে করেননি, তিনি মনে কোরতেন যে আমাদের অন্তর লোকে যে পরম সত্য আপনাকে নানা স্থষ্টি লীলার মধ্যে প্রকাশ কোরছে সেই শক্তিই বহির্লোকে নানা লীলায় সুন্দরের বিচিত্ররূপকে স্থষ্টি কোরে আমাদের মন হরণ কোরছে এবং এইজন্যই আমাদের Personalityর সঙ্গে বিশ্বের পরমার্থ সত্যের যে একটা স্থষ্টিময় Personality রয়েছে এই উভয়ের ঐক্যকে উপলব্ধি কোরতে পেরেছিলেন।

কিন্তু একথা বোলতেই হবে যে বনবাণীর ভূমিকা লিখতে গিয়ে কবি একটা মানসিক দ্বন্দ্বে পড়েছিলেন। উপনিষদের একটি পংক্তি "কেন প্রাণপ্রথমং প্রৈতি-যুক্তঃ" অর্থাৎ কারদ্বারা যুক্ত হোয়ে, কারদ্বারা প্রেরিত হোয়ে প্রাণ প্রবহমান হোয়েছে। কিন্তু পরের প্যারাতেই তিনি এই "প্রেরকের" অংশ এই "কেন"র অংশ বা অস্তিত্ব একেবারে বাদ দিয়ে প্রৈতি এই ক্রিয়াপদকে বিশেষ্যরূপে ব্যবহার

কোরে প্রেরণাকেই আদিস্থান দিয়েছেন। যে প্রেরণা কোরছে তাকে নিঃশব্দে উল্লঙ্ঘন কোরে গিয়েছেন। তবেই এখানে একথা বলা যায় যে পূর্ব্বজীবনে জগতের "প্রেরক"রূপে যাকে দেখতেন তাকে বলাকার পরবর্ত্তী যুগে নিছক প্রেরণারূপে, প্রৈতিরূপে দেখতে আরম্ভ কোরেছিলেন; যদিও কোন কোন কবিতায় হঠাৎ এই "প্রেরক"ও মধ্যে মধ্যে মধ্যে উঁকিঝুঁকি মেরেছে।

বনবাণীর "বৃক্ষবন্দনা" কবিতাটীতে রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে তরুলোকের মধ্যেই প্রাণের প্রথম প্রকাশ তাই তরুকে দিয়েই পৃথিবীর আত্ম-মর্য্যাদার গৌরব। ক্রমবিকাশের ধারায় এই তরুলোক বহুমৃত্যুকে অতিক্রম কোরে নব নব সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করেছে।

"যে-জীবন
মরণ তোরণ দ্বার বারংবার করে উত্তরণ
যাত্রা করে যুগে যুগে অনন্তকালের তীর্থপথে
নব নব পান্থশালে বিচিত্র নূতন দেহরথে,
তাহারি বিজয়ধ্বজা উড়াইলে নিঃশঙ্ক গৌরবে
অজ্ঞাতের সম্মুখে দাঁড়ায়ে!"

তরুলোকের আবির্ভাবেই আমরা প্রাণলোকের বিজয় ঘোষণার প্রথম পরিচয় পাই। তরুলোক একদিকে যেমন সুন্দরের প্রাণমূর্ত্তিখানি মৃত্তিকার মূর্ত্তপটে আঁকতে গিয়ে সূর্য্যলোক থেকে আপন প্রাণের রূপশক্তি আহরণ করে এবং আলোকের গুপ্তধন নানাবর্ণের মধ্যে অনুরঞ্জিত করে, তরু-লোক যেমন মেঘলোক থেকে বর্ষাবারি আহরণ কোরে যৌবনের অমৃতরসে আপনাকে পূর্ণ করে, আপনার পত্র-পুষ্পপুটে বসুন্ধরাকে অনন্তযৌবনা কোরে সজ্জিত করে; তেমনি সে থাকে নিস্তব্ধ, গম্ভীর, আপনার ধৈর্য্য বীর্য্যকে আবদ্ধ কোরে শক্তির শান্তিরূপকে প্রকাশ করে।

তরু যে সূর্য্যের জ্যোতি থেকে শক্তিগ্রহণ কোরে সেই শক্তির তপস্যায় নূতন সৃষ্টিতে আপনাকে শ্যামলরূপে প্রকাশ করে এই কথাটী বনবাণীর নানা কবিতায় ধ্বনিত হোয়েছে।

"তপোমগ্ন হিমাদ্রির ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করি' চুপে
বিপুল প্রাণের শিখা উচ্ছ্বসিল দেবদারুরূপে।
সূর্য্যের যে-জ্যোতিমন্ত্র তপস্বীর নিত্য উচ্চারণ
অন্তরের অন্ধকারে, পারিল না করিতে ধারণ
সেই দীপ্ত রুদ্রবাণী,—তপস্যার সৃষ্টিশক্তিবলে
সে বাণী ধরিল শ্যামকায়া ; সবিতার সভাতলে
করিল সাবিত্রী গান ; স্পন্দমান ছন্দের মর্ম্মরে
ধরিত্রীর সামগাথা বিস্তারিল অন্তর অম্বরে।"

কোন কোন কবিতায় অন্তরের সহানুভূতিতে কবি তরুলোকের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের ঐক্য অনুভব কোরেছেন। আম্রবন কবিতাটীতে এর একটী সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

"তব পথচ্ছায়া বাহি বাঁশরীতে যে বাজালো আজি
মর্ম্মে মোর অশ্রুত রাগিণী,
ওগো আম্রবন,
তারি স্পর্শে রহি রহি আমারো হৃদয় উঠে বাজি,'—
চিনি তা'রে কিম্বা নাহি চিনি
কে জানে কেমন!

অন্তরে অন্তরে তব যে-চঞ্চল রসের ব্যগ্রতা
আপন অন্তরে তাহা বুঝি,
ওগো আম্রবন।
তোমার প্রচ্ছন্ন মন আমারি মতন চাহে কথা—
মঞ্জরীতে মুখরিয়া আনন্দের ঘন গূঢ় ব্যথা ;
অজানারে খুঁজি'
আমারি মতন আন্দোলন॥

সচকিয়া বিকশিয়া কাঁপে তব কিশলয় রাজি
সর্ব্ব অঙ্গে নিমেষে নিমেষে,
ওগো আম্রবন।

আমিও তো আপনার বিকশিত কল্পনার সাজি
অন্তর্লীন আনন্দ আবেশে
অমনি নূতন ॥

প্রাণে মোর অমনি তো দোলা দেয় সন্ধ্যায় উষায়
অদৃশ্যের নিঃশঙ্কিত ধ্বনি,
ওগো আম্রবন,

আমার যে পুষ্প শোভা সে কেবল বাণীর ভূষায়,
নূতন চেতনে চিত্ত আপনারে পরাইতে চায়
সুরের গাঁথনী—
গীত ঝঙ্কারের আবরণ ॥"

ভূতলের চিরন্তনী কথা যে কুসুমে কুসুমে উচ্ছ্বসিত হোয়ে ওঠে, তরুর সহজ ভাষা যে বাতাসের নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে, মৌমাছির গুঞ্জনে গুঞ্জনে প্রকাশ পায়, সে ভাষা কবির নিভৃত চিত্তে, কবির ধ্যানে, অন্তরের আভাসে, আশ্বাসে, স্বপ্নে ও বেদনায় সঙ্গোপনে প্রবেশ কোরত এবং মিশে যেত। আমের গন্ধে যেন তিনি জন্মজন্মান্তরের ভুলে যাওয়া প্রিয় কণ্ঠস্বর শুনতে পেতেন, যেন তাঁর কানে তাঁর নাম ধরে কে ডাকত তাতে তিনি হোতেন রোমাঞ্চিত। ঋতুতে ঋতুতে নব নব রসের সঞ্চার সঞ্চিত হোয়ে থাকত আম্রবনের মজ্জায়, তার যৌবনের সদ্যোৎফুল্ল পুষ্পরাজি পল্লী-ললনারা তাদের অলক সজ্জায় ভূষণ কোরে আনন্দিত হোয়ে ওঠে।

এই "বনবাণী" সংগ্রহের প্রত্যেকটি কবিতায় এই কথাই প্রকাশ পাচ্ছে যে কবি বৃক্ষলোকের মধ্যে যে প্রাণরস প্রবাহিত হোচ্ছে তার সঙ্গে নিজের

প্রাণরসের ঐক্য অনুভব কোরে এবং এই বৃক্ষলোকের মধ্য দিয়ে যে অনাদি প্রাণলোক এই পৃথিবীকে রসে ও আনন্দে অভিষিক্ত কোরছে তা স্পষ্ট কোরে অনুভব কোরতে পারতেন। সে আনন্দ এই সংগ্রহের প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে যেন দ্রাক্ষারস পানের মত্ততার সূচনা কোরছে।

"তুমি সুদূরের দূতী, নূতন এনেছো নীলমণি
স্বচ্ছ নীলাম্বরসম নির্ম্মল তোমার কণ্ঠধ্বনি।
যেন ইতিহাস জালে
বাঁধা নহ দেশে কালে,
যেন তুমি দৈববাণী বিচিত্র বিশ্বের মাঝখানে,
পরিচয়হীন তব আবির্ভাব, কেন এ কে জানে।"

কি শিল্পে কি সাহিত্যে তরুলতার সহিত নিবিড় পরিচয় এদেশে যেমন প্রকাশ পেয়েছে এরকম অন্য কোথাও পেয়েছে বলে মনে হয়না। আধুনিক evolution-বাদে তরুলতার সঙ্গে আমাদের একটা জৈব সম্বন্ধের পরিচয় পাই ক্রমবিকাশের নিম্নস্তরে তরুলতা ও উচ্চস্তরে আমরা। আমাদের দেশে এই জৈব ক্রমবিকাশের কোন খবর ছিল না, কিন্তু আমাদের প্রাচীনেরা তরু লতাকে আমাদেরই মতন পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত প্রাণী বলে মনে করতেন। মহাভারত মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে এই মতের উল্লেখ আছে। একজন মানুষও মৃত্যুর পরে কোন বৃক্ষ বা লতা হইয়া জন্মাইতে পারে। পুরাণের গল্পের কথা মনে হয়, কোন অধ্যাপক অত্যন্ত পণ্ডিত হোয়েও ছাত্রদের পড়াতে চাইতেন না, সেইজন্যে তিনি আমগাছ হোয়ে জন্মালেন কিন্তু সে গাছে কোন ফুল, ফল ধোরত না এবং পাখীরা সেখানে বসত না। এই হোল তাঁর তরুজীবনের শাস্তি। মনু বলেছেন "অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্তেতে সুখ দুঃখ সমন্বিতা" অর্থাৎ বৃক্ষদের অন্তরের মধ্যে চৈতন্য আছে এবং তাহারা সুখদুঃখ অনুভব করিতে পারে। এইত গেল একদিকে ইউরোপীয় evolution মত। অপরদিকে আমাদের দেশের শাস্ত্রীয় মত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই দুয়ের কোন কূলেই ভেড়েন নাই; তিনি তাঁ

স্বাভাবিক রসস্ফূর্ত্তিতে বৃক্ষলোকের সঙ্গে নিজের স্বাজাত্য অনুভব কোরতে পেরেছিলেন, তাই এই বনবাণীতে অনেক সময় এই বৃক্ষদের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার দেখতে পাই। কালিদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তল" নাটকের শকুন্তলা যখন পতিগৃহে যাত্রা করলেন তখন বনস্পতিরা নানা রকম যৌতুক যোগাতে লাগল, এমন কি পায়ের আলতাও বাদ পড়েনি—"নিষ্ঠ্যূত রণোপভোগ সুলভঃ লাক্ষারসঃ কেনচিৎ।" মেঘদূতে দেখতে পাই যে তরুলতা পশুপক্ষী এমন কি নদনদী পর্য্যন্ত মেঘের সঙ্গে বন্ধুতা কোরতে ছাড়েনি। কালিদাস মনে কোরতেন যে চেতন অচেতন সমস্ত বস্তুই এক ব্রহ্মের চৈতন্যলীলার প্রকাশ—"দ্রবঃসঙ্ঘাতকঠিনঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মঃ লঘুর্গুরুঃ। ব্যক্তো ব্যক্তেতরশ্চাসি প্রাকাম্যং তে বিভূতিষু॥" এই দার্শনিক দৃষ্টিকে কবি কালিদাস তাঁর কাব্যের রসলোচনে এমন স্নিগ্ধ কোরে দেখেছিলেন যে স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বলোক তাঁর কাছে, শুধু তাঁর কাছেও নয় সমস্ত পাঠকের নিকট প্রাণময় হোয়ে উঠেছে। জগতের মধ্যে যে প্রাণের লীলা চলেছে সেটা যেন ঠিক মানুষের জীবনের লীলা। রবীন্দ্রনাথের বর্ত্তমান কাব্যের বৈশিষ্ট্য এই যে কবি এখানে আপন রসানুভূতিতে সমস্ত তরু-লোকের সঙ্গে যেন ব্যক্তিগত ভাবে আত্মীয়তা অনুভব কোরেছেন; তাদের সুখে দুঃখে, সুখ দুঃখ অনুভব কোরেছেন; তাদের মান অপমানের কথা দরদ দিয়ে বুঝেছেন এবং তাদের সঙ্গে পরিচয় যে তাঁর কাব্যজীবনকে গড়বার পক্ষে কতখানি সাহায্য করেছে তা অনুভব কোরে তাঁর কৃতজ্ঞতার মাল্যখানি পরম-স্নেহে তাদের দিকে এগিয়ে দিতে আনন্দ বোধ করেছেন। এই আনন্দের প্রেরণাই বনবাণীর প্রধান প্রেরণা। একথা তিনি যেমন তাঁর ভূমিকাতে প্রকাশ কোরেছেন তেমনি প্রকাশ কোরেছেন রসের ভাষায়, বনবাণীর কবিতাগুলির মধ্যে।

কুরচি ফুল সংস্কৃত সাহিত্যে তেমন স্থান পায়নি যদিও বিরহী যক্ষ কুরচি ফুলের মালা গেঁথে তার মেঘদূতকে অর্ঘস্বরূপ দিয়েছিলেন। কবি কুরচির প্রতি এই অনাদর স্মরণ কোরে লজ্জা অনুভব কোরেছেন।

"শ্বেতভুজা ভারতীর বীণা
তোমারে করেনি অভ্যর্থনা অলঙ্কার ঝঙ্কারিত
কাব্যের মন্দিরে। তবু সেথা অবস্থান অবারিত,
বিশ্বলক্ষ্মী কোরেছেন আমন্ত্রণ যে-প্রাঙ্গণ তলে
প্রসাদ চিহ্নিত তাঁর নিত্যকার অতিথির দলে।
আমি কবি লজ্জা পাই কবির অন্যায় অধিকারে
হে সুন্দরী! শাস্ত্রদৃষ্টি দিয়ে তারা দেখেছে তোমারে
রসদৃষ্টি দিয়ে নহে; শুভদৃষ্টি কোনো সুলগনে
ঘটিতে পারেনি তাই, ঔদাস্যের মোহ আবরণে
রহিলে কুণ্ঠিত হোয়ে।"

কুরচিকে তিনি মন ভোলাতে গিয়ে বলছেন যে এক সময় এমন ছিল যেদিন তার মঞ্জরীতে ইন্দ্রাণী সাজাতেন তাঁর কবরী। অপ্সরীদের নৃত্যলোল মণিবন্ধে কঙ্কনবন্ধনে কুরচি কুসুমের গুচ্ছ তালে তালে দোল খেয়ে ফিরত কিন্তু আজ কুরচির আর সে পদবী নেই। সকলেই ভুলে গেছে তার মহিমা, "যে আত্ম বিস্মৃত তুমি, ধরাতলে সত্য তব নাম"—

"সকলেই ভুলে গেছে সে নাম প্রকাশ নাহি পায়
চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থে পণ্ডিতের পুঁথির পাতায়;
গ্রামের গাথার ছন্দে সে নাম হয়নি আজো লেখা,
গানে পায় নাই সুর।"

প্রত্যেকটি গাছ সম্বন্ধে কবির যে অনুভবের বৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়েছে তাতে বৃক্ষলোকের প্রত্যেকটি বৃক্ষকে যেন একটি সুনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিত্বের মহিমায় মণ্ডিত কোরেছে। শাল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন,

"অন্তরের নিগূঢ় গভীরে
ফুল ফুটাবার ধ্যানে নিবিষ্ট রয়েছো ঊর্দ্ধশিরে;
চৌদিকের চঞ্চলতা পশে না যেথায়।

অন্ধকারে
নিঃসঙ্গ সৃষ্টির মন্ত্র নাড়ী বেয়ে শাখায় সঞ্চারে।"

আবার বলছেন,

"আকাশেরে দাও সঙ্গ বর্ণরঙ্গে শাখার ভঙ্গীতে,
বাতাসেরে দাও মৈত্রী পল্লবের মর্ম্মর সঙ্গীতে ;
মঞ্জরীর গন্ধের গণ্ডূষে।"

যুগে যুগে কতকাল কত পথিক এসেছে, আর ছায়াতলে বসেছে রাখাল ; শাখায় পাখীরা বেঁধেছে নীড় ; তারা সকলে আসন্ন বিস্মৃতির পথে ভেসে গেছে ; খালি উদাসীন হোয়ে শাল রয়েছে দাঁড়ায়ে, অস্তিত্বের আবর্ত্তনে দ্রুতবেগে অনিত্যের দিকে যারা ছুটে গেছে শাল যেন তাদের নিত্যের সূত্রে মালা গেঁথে রেখেছে আপনার মধ্যে।

"যৌবন তুফান লাগা সেদিনের কত নিদ্রা-ভাঙ্গা
জ্যোৎস্না মুগ্ধ রজনীর সৌহার্দ্দ্যের সুধারস ধারা,
তোমার ছায়ার মাঝে দেখা দিল হয়ে গেল সারা।
গভীর আনন্দক্ষণ যতদিন তব মঞ্জরীতে
একান্ত মিশিয়াছিল একখানি অখণ্ড সঙ্গীতে
আলোকে আলাপে হাস্যে, বনের চঞ্চল আন্দোলনে,
বাতাসের উদাস নিশ্বাসে ;"

সে সমস্ত পথিক আজ নেই। তাদের মুক্ত জীবন প্রবাহের আনন্দ-চঞ্চল গতি পূর্ণ করে রেখেছে নারিকেলের মঞ্জরী। ভবিষ্যতে আবার যারা যৌবনের আনন্দে বিভোর হয়ে আসবে শালের তলায় তাদের উৎসব রসের মদিরায় মত্ত হোয়ে তারাও যাবে ক্ষণিক বিভ্রমে দোলা দিয়ে। কিন্তু সেই পুরাতন কালের উৎসব যা অতীত হোয়ে গেছে দৃষ্টির পথ থেকে, যে উৎসব সম্ভার আজকে আমরা এনেছি শালের পর্ণ-বেদিকার তলে আর ভবিষ্যতের যে উৎসব এই

শাল বৃক্ষের তলায় আসবে আনন্দে নৃত্য কোরে সে সমস্ত গিয়ে মিলিত হোচ্ছে মহাশাল বৃক্ষের ফোটাঝরার নিত্য গতিতে উৎসাহিত মঞ্জরীর মধ্যে। যেন শালের অন্তর-লোকের চেতনার মধ্যে সর্ব্বকালের সঙ্গীত রয়েছে বিধৃত হোয়ে। এমনি কোরে নূতন ও পুরাতনের মিলন হোচ্ছে মহাশালের স্মরণ-গ্রন্থিতে।

মধু-মঞ্জরী কবিতাটির একজায়গায় কবি বলছেন যে ভুবনে যে প্রাণ সীমা ছাড়িয়ে গ্রহ তারার মধ্যে সঞ্চার করে দিয়েছে আপনাকে সেই প্রাণেরই ধারা পল্লব-পুটে গ্রহণ কোরে মজ্জায় ভরে নিয়েছে মধু-মঞ্জরী। বাতাসের সঙ্গে তার এমন নিবিড় যোগ যেন সে সেখানে পাচ্ছে তার মাতৃস্তন্যের আস্বাদ। এই কবিতাটির একজায়গায় কবি বলছেন,

"যে-ইন্দ্রজাল দ্যুলোকে ভূলোকে ছাওয়া,
বুকের ভিতর লাগে ওর তারি হাওয়া,—
বুঝিতে যে চাই কেমন সে ওর পাওয়া,
চেয়ে থাকি অনিমিষ ॥
ফুলের গুচ্ছে আজি ও উচ্ছ্বসিত,
নিখিল-বাণীর রসের পরশামৃত
গোপনে গোপনে পেয়েছে অপরিমিত
ধরিতে না পারে তারে।"

এমনি কোরে তরুলোকের হৃদয়ের মধ্যে অবাধ ভাবে কবির হৃদয় যে আনাগোনা করেছে তারি পরিচয় তিনি রেখে গেছেন তাঁর বনবাণীর মধ্যে। পাখীর প্রতি দরদ দেখিয়েও দুএকটি কবিতা এই সংগ্রহে স্থান পেয়েছে কিন্তু সর্ব্বত্রই এই সুরটা প্রধান হোয়ে উঠেছে যে বিশ্বময় প্রাণের যে লীলা চলেছে তার প্রত্যেকটা বিকাশের মধ্যে যে এক একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে, এক একটা বিশেষ সার্থকতা আছে তা আমরা বুঝতে পারি আমাদের হৃদয়ের স্পর্শে। সেইখানেই এই কথাটা ধরা পড়ে যে বিশ্বের প্রাণ-প্রবাহের মধ্যে আমাদের

প্রাণ-প্রবাহ কি পরিচয় লাভ করেছে সে পরিচয় আমাদের পরিচয়; তা যেন প্রাণ-সমুদ্র থেকে এক এক অঞ্জলি অমৃত-নিষেক।

নটরাজ ঋতু রঙ্গশালা

এই বইখানি ১৩৩৪ সালের দোল পূর্ণিমাতে শান্তিনিকেতনে অভিনীত হয়। এর ভেতরের কথাটি বলতে গিয়ে কবি বলেছেন—"নটরাজের তাণ্ডবে, তার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরালোকে রূপলোক আবর্ত্তিত হোয়ে প্রকাশ পায়, তার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরালের রসলোক উন্মেষিত হোতে থাকে, অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। নটরাজ পালা গানের এই মর্ম্ম।"

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর পুরাণে লিখিত আছে যে আদিকালে পৃথিবীতে কেবলমাত্র জলই ছিল। ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি কার্য্যের জন্য আদিষ্ট হোলেন তখন তিনি হতবুদ্ধি হোলেন কেমন কোরে তিনি সৃষ্টি কোরবেন। উপদেশের জন্য তিনি বিষ্ণুর শরণাপন্ন হোলেন। বিষ্ণু দেখলেন যে সৃষ্টির মূল তথ্যটি না বুঝিয়ে দিলে ব্রহ্মা সৃষ্টি কোরতে সক্ষম হবেন না। তখন বিষ্ণু মহাসমুদ্রের ওপরে নৃত্য কোরতে লাগলেন, —উদ্দেশ্য এই যে সেই নৃত্যের ছন্দ অনুসারে ব্রহ্মা কোরবেন তাঁর সৃষ্টি। বিষ্ণুর নাচের মধ্যে সৃষ্টির রহস্যের সাক্ষাৎ পেয়ে ব্রহ্মা লেগে গেলেন তাঁর সৃষ্টির কাজে। এই পৃথিবী গতিময়, গতির প্রকারের প্রধান জ্ঞাতব্যই হচ্ছে সেই গতির ছন্দ। গতির আপনার স্বরূপের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন হোয়ে রয়েছে একটা সংযমের বাধা, গতির প্রকাশ হোতে গেলেই এই অন্তর্নিহিত সংযমের বাধার সঙ্গে ঘটে তার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের ফলেই গতির যে বিশেষ রূপটী লীলায়িত হয়ে ওঠে একটা বিশেষ নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে সেইটিকেই বলা যায় ছন্দ। বের্গসঁ সৃষ্টি-তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেছেন যে

Elan vitalকে বা গতিস্পন্দকে জড়ের সঙ্গে সজ্যাতে এঁকে বেঁকে চলতে হয়েছে। গতির এই আঁকা বাঁকাটাই হোল গতির ছন্দ এবং প্রত্যেক বাঁকে বাঁকে আমরা নূতন নূতন পর্য্যায়ের প্রাণ দেখতে পাই। এইখানেই হচ্ছে বের্গস্‌র্ঁ সঙ্গে Darwinএর evolutionবাদের পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে নটরাজের নৃত্যের ছন্দে একদিকে প্রকাশ পেয়েছে বহির্লোক আর একদিকে প্রকাশ পেয়েছে অন্তর্লোক। নাচের উপমায় সৃষ্টিতত্ত্বকে বুঝতে যাওয়ার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বিশ্ব যে গতিময়, স্পন্দময় এই ভাবটা ক্রমশঃ রবীন্দ্রনাথকে আচ্ছন্ন কোরেছিল, তাঁর পূর্ব্বের ভাব ছিল যে একটি সৃষ্টিময় পুরুষ ভিতরে ও বাহিরে তাঁর আনন্দের উৎফুল্লতায় সৃষ্টি কোরে চলেছেন; নিজেকে ব্যাপ্ত কোরে চলেছেন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, অরূপ যিনি তিনি রূপের সীমানার মধ্য দিয়ে অজস্রভাবে নিজেকে প্রকাশ কোরে চলেছেন, এই প্রকাশের মহিমাতেই এই অরূপ পুরুষের মহত্ত্ব, এইটিই হোচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ। নাচের উপমাটিতে জগতের সৌন্দর্য্যের দিকটি পরিস্ফুর্ত্তভাবে প্রকাশ করবার চেষ্টা হোয়েছে, তাছাড়া এই গতি বা স্পন্দের দিক্‌টা রবীন্দ্রনাথের চিত্ত ক্রমশঃ এমন কোরে অধিকার কোরে উঠছিল যে এর পরবর্ত্তী স্তরে নটরাজকে বাদ দিয়ে শুধু তার নৃত্যটাতেই কাজ চল্‌ত, বলাকার চঞ্চলা কবিতাটা তার দৃষ্টান্ত। যদি স্পন্দই জগৎরূপে আপনাকে প্রকাশ কোরে থাকে তবে সেই স্পর্শের মধ্যে যে একটা সংযম আছে তা স্বীকার কোরতেই হয়। কারণ তা না হোলে জগতে law and order, নিয়ম এবং শৃঙ্খলা কিম্বা natureএর uniformity বা অব্যভিচারী ব্যবহার সম্ভব হোত না; জগতে কার্য্যকারণের কোন নিয়ম থাকত না। গতির মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট রকমের সংযম থাকাতে গতিটা পরিণত হোয়েছে ছন্দে, ছন্দ হোচ্ছে গতির একটা নির্দ্দিষ্ট কাল। জগতে যাকিছু সুন্দর ও শোভন হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে স্পন্দময় জগৎ এক একটা নির্দ্দিষ্ট ছন্দে, এক একটা নির্দ্দিষ্ট ঋতুরূপে প্রকাশ পেয়েছে। ঋতুতেই ফোটে ফুল, তাই সংস্কৃতে ঋতু ও পুষ্প শব্দটি এক অর্থে ব্যবহৃত হোয়েছে। পুষ্পই হোচ্ছে সৃষ্টির symbol বা প্রতীক। সৃষ্টির মধ্যে

একটা হোচ্ছে বাঁধনহারার দিক আর একটা হোচ্ছে বাঁধনের দিক্। "বাঁধনহারা" হোল স্বচ্ছন্দ গতির দিক্। আর বাঁধনের দিক্‌টা হোল সংযমের দিক্। সৃষ্টিতে একটা প্রকাশ হচ্ছে বটে কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ নয়। তার মধ্যে রয়েছে একটা নিবিড় নিয়মের বাঁধন। একটা প্রকাশ থেকে যখন আমরা অন্য প্রকাশে যাই তখন স্পন্দের প্রবাহ তার পূর্ব্বের শৃঙ্খলা ত্যাগ কোরে আর একটা নূতন শৃঙ্খলাকে বরণ করে। এই যে একটাকে অনায়াসে ত্যাগ কোরতে পারে এইটাই হোচ্ছে সৃষ্টির মধ্যে বৈরাগ্যের দিক্। এই চলেছিল পাতায় পাতায় নিজেকে ভরিয়ে তোলবার যুগ, এই আবার এল পাতা ঝরাবার যুগ, আবার এল মঞ্জরী ফোটাবার যুগ, পাতাকে অঙ্কুরিত কোরে তোলবার যুগ। এর প্রত্যেকটীরই মধ্যে রয়েছে এক একটা ছন্দ বা বিশেষভাবে চলবার একটা ক্রম, অনবরত চলেছে ছন্দের পরিবর্ত্তন ; এই পরিবর্ত্তনের মধ্যেও রয়েছে একটা অখণ্ড ছন্দ, আবার প্রত্যেকটা ছন্দের মধ্যে রয়েছে একটি বিশেষ রকমের সংযম। এবং তার ফলেই প্রত্যেকটী ছন্দের মধ্যে একটি স্বতন্ত্রতা, ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। বাইরের জগতে যেমন এই লীলাবৈচিত্র্য চলেছে অন্তরের জগতে ভাবলোকের মধ্যেও তেমনি চলেছে এরই অনুরূপ লীলাবৈচিত্র্য। দুটো যেন parallel বা সমপ্রকাশ। একই নটরাজের দুইটী পদক্ষেপে দুইরকম গতিচ্ছন্দের প্রকাশ। এই গভীর ভাবটীকে নাটকে কেমন কোরে প্রকাশ করা যায় তা আমরা বুঝতে পারি না, প্রকাশ হোয়েছে বলেও মনে হয় না। এই নাটকটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব, বিদায় গ্রহণ ও তিরোভাবের ও আবার আর একটি আবির্ভাবের পরিচয় দেবার একটা চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এর সঙ্গে অন্তর-লোকের যে লীলা-বৈচিত্র্য চলেছে তার কোন ছবি দেওয়া যে সম্ভব হোয়েছে তা মনে হয় না।

এই কথাটিই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঋতুরঙ্গশালার প্রথম কবিতায় (মুক্তিতত্ত্ব) আপন বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রকাশ কোরতে চেষ্টা করেছেন,

"দেখছি, ও যার অসীম বিত্ত
সুন্দর তার ত্যাগের নৃত্য

আপনারে তার হারিয়ে প্রকাশ
আপনাতে যার আপনি আছে।
যে নটরাজ নাচের খেলায়
ভিতরকে তার বাইরে ফেলায়,
কবির বাণী অবাক মানি'
তারি নাচের প্রসাদ যাচে
শুন্‌বিরে আয়, কবির কাছে
তরুর মুক্তি ফুলের নাচে,
নদীর মুক্তি আত্মহারা
নৃত্য ধারার তালে তালে।
রবির মুক্তি দেখনা চেয়ে
আলোক-জাগার নাচন গেয়ে,
তারার নৃত্যে শূন্য গগন
মুক্তি যে পায় কালে কালে।
প্রাণের মুক্তি মৃত্যু-রথে
নূতন প্রাণের যাত্রাপথে,
জ্ঞানের মুক্তি সত্য-সূতার
নিত্য বোনা চিন্তা জালে।*

যিনি অসীম তিনি যখন তাঁর অসীমতাকে ত্যাগ কোরে গতিচ্ছন্দে আপনাকে প্রকাশ করেন, আপনার অসীমতাকে হারিয়ে সসীমতার মধ্যে আপনাকে স্ফুট করেন তখনি হয় সুন্দরের সৃষ্টি। কিন্তু এই সসীম সুন্দরের মধ্যে অসীম আপনাকে অটুট অক্ষয় কোরে রেখেছেন। ভিতরে আমরা যা পাই, গতিচ্ছন্দে তারই প্রতিরূপ (রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব) বাইরের জগতে প্রকাশ পায়। প্রত্যেকটি বস্তুই তার আপন সৃষ্টিক্রিয়ার মধ্যে আপনাকে সার্থক করে, আপন বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসে মুক্তির আস্বাদ পায়। সূর্য্য তার মুক্তি পায় আলোর সৃষ্টির মধ্যে, নদী

তার মুক্তি পায় স্রোতের মধ্যে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রাণধারার যে নূতন নূতন প্রকাশ হয় সেইটিই হচ্ছে প্রাণের মুক্তি। যে কোন রূপের কথাই আমরা ভাবি না কেন সে তার আপন রূপের মধ্যে সীমা-রেখায় আবদ্ধ। সে যখন আর একটা রূপের মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করে তখন সে সীমারেখার বাঁধন থেকে মুক্তি পায়। অসীম যতক্ষণ অসীমে থাকে ততক্ষণ সে অসীমতার সীমায় আবদ্ধ। অসীম যখন আপনাকে হারিয়ে সীমার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে, তখনই হয় অসীমের মুক্তি। গতিচ্ছন্দে যখন কোন একটা রূপের মধ্যে আবদ্ধ হয় তখন সে হারিয়ে ফেলে তার গতি-স্বভাবকে, সেইখানেই তার বন্ধন। সে আবার যখন তার সেই বাঁধা রূপ থেকে আর একটা নূতন রূপের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করে তখনই তার গতি-স্বভাব হয় সার্থক। সেইখানেই তার মুক্তি।

ইহার পরে উদ্বোধন কবিতাটিতে কবি সৃষ্টির রহস্যের মধ্যে এই গতিচ্ছন্দ বা নৃত্য যা আপনাকে প্রকাশ কোরে চলেছে এই কথাটি অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত কোরেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে যদি আমরা আমাদের জীবনটিকে এই গতি স্রোতেরই একটি উর্ম্মি বলে মনে কোরতে পারি তা'হলেই আমাদের অভিমান ও অহঙ্কার থেকে আমরা মুক্তি পাই—

> "সৃষ্টির রহস্যদ্বারে নৃত্যের অঘাত নিত্য হানে;
> যে-নৃত্যের আন্দোলনে মরুর পঞ্জরে কম্প আনে,
> ক্ষুব্ধ হয় শুষ্কতার সজ্জাহীন লজ্জাহীন সাদা,
> উচ্ছিন্ন করিতে কার জড়ত্বের রুদ্ধবাক্ বাধা,
> বন্ধ্যতার অন্ধ দুঃশাসন; শ্যামলের সাধনাতে
> দীক্ষা-ভিক্ষা করে মরু তব পায়ে; যে-নৃত্য আঘাতে
> বহ্নিকম্প-সরোবরে উর্ম্মি জাগে প্রচণ্ড চঞ্চল,
> অতল আবর্ত্তবক্ষে গ্রহ-নক্ষত্রের শতদল
> প্রস্ফুটিয়া স্ফুরে নিত্যকাল।

আবার,—

নটরাজ, আমি তব
কবি-শিষ্য, নাটের অঙ্গনে তব মুক্তি-মন্ত্র লবো।
তোমার তাণ্ডব-তালে কর্ম্মের বন্ধন গ্রন্থখানি
ছন্দবেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সদ্য যাবে খুলি ;
সর্ব্ব অমঙ্গল-সর্প হীনদর্প অবনম্র ফণা
আন্দোলিবে শান্ত-লয়ে।

এরপরে "নৃত্য" কবিতাটিতে তিনি বলছেন,—

"নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ,
নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে
কাঁপে নৃত্যের ছায়া।
তোমার বিশ্ব নাচেরে দোলায়
বাঁধন পরায় বাঁধন খোলায়
যুগে যুগে কালে কালে,
সুরে সুরে তালে তালে ;
অন্তরে তার সন্ধান পায়
ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে

* * * *

নৃত্যের বশে সুন্দর হোল
বিদ্রোহী পরমাণু
পদযুগ ঘিরে জ্যোতি মঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্র ভানু।

তব নৃত্যের প্রাণ-বেদনায়
বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়,
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময়
তোমার পরমানন্দ হে ॥”

এবারে আরম্ভ হোল ঋতু-নৃত্যে বৈশাখের বর্ণনা

“র[illegible]ন তরু, নির্জীব মরু,
পবনে গর্জ্জে রুদ্র ডমরু,
এই চারিধার করে হাহাকার
ধরাভাণ্ডার রিক্ত।

* * * *

তব তপ-তাপে হের’ সবে কাঁপে
দেবলোক হোল ক্লান্ত।
ইন্দ্রের মেঘ নাহি তার বেগ,
বরুণ করুণ শান্ত।”

পরবর্ত্তী কয়েকটী কবিতায় বৈশাখের বর্ণনা চলেছে। বৈশাখের রুদ্র রূপটাই এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই বৈশাখ তার রুদ্রতার মধ্যে আবদ্ধ হোয়ে থাকতে চায় না। সে তার অন্তরে অন্তরে আসন্ন বরষার মধ্যে আপনাকে বিলীন কোরতে চায়।

“পরাণে কার ধেয়ান আছে জানি
জানি হে জানি, কঠোর বৈরাগী।
সুদূর পথে চরণ দুটি বাজে
পূরব কূলে বকুল-বীথিমাঝে,
লুটায়ে পড়া অমল-নীল সাজে

নব কেতকী-কেশর আছে লাগি।
তাহারি ধ্যান পরাণে তব জাগি ॥"

তারপরেই দেখছি নৃত্যচ্ছন্দে গতি গেল বদলে, বর্ষার আবির্ভাব এল ঘনিয়ে :

"অকস্মাৎ কোমলের কমলমালার স্পর্শ লেগে
শান্তের চিত্তের প্রান্ত অহেতু উদ্বেগে
ভ্রূকুটিয়া ওঠে কালো মেঘে ;
বিদ্যুৎ বিচ্ছুরি' উঠে দিগন্তের ভালে,
রোমাঞ্চ কম্পন লাগে অশ্বত্থের ত্রস্ত ডালে ডালে ;
মুহূর্তে অম্বর-বক্ষে উলঙ্গিনী শ্যামা
বাজায় বৈশাখী-সন্ধ্যা ঝঞ্ঝার দামামা,
দিগ্বিদিকে নৃত্য করে দুর্ব্বার ক্রন্দন,
ছিন্ন ছিন্ন হ'য়ে যায় ঔদাসীন্য-কঠোর বন্ধন ॥"

তার পরে পাই বর্ষা-বর্ণনের কতকগুলি কবিতা

"তোমার ললাটে জটিল জটার ভার
নেমে নেমে আজি পড়িছে বারম্বার,
বাদল আঁধার মাতালো তোমার হিয়া,
বাঁকা বিদ্যুৎ চোখে উঠে চমকিয়া ;

চির-জনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া
আজি এ বিরহ-দীপন-দীপিকা
পাঠালো তোমারে এ কোন্ লিপিকা,
লিখিল নিখিল-আঁখির কাজল দিয়া,
চির-জীবনের শ্যামলী তোমার প্রিয়া।

কিন্তু এরি মধ্যে শ্রাবণ যেন বাতাসে কার আভাস পেয়েছে ; প্রথমেতে সে

করছে বারি-বর্ষণ। কেয়া "হায়" "হায়" কোরে কাঁদছে, কদম ঝরছে, কালো মেঘের দিন এল ফুরিয়ে। শ্রাবণের বুকে থেকে শরৎ বলছে—

"শরৎ বলে গেঁথে দেব কালোয় আলো,
সাজবে বাদল আকাশ মাঝে
সোনার সাজে
কালিমা ওর মুছে ফেলে।"

মেঘ হ'য়ে এল রিক্তবৃষ্টি এবং জ্যোতি-শুভ্র। মুক্তি পেল মেঘ তার জলভার থেকে। শ্রাবণের আর থাকবার সময় নেই।

"শ্রাবণ সে যায় চ'লে পান্থ,
কৃশতনু ক্লান্ত,
উড়ে পড়ে উত্তরী প্রান্ত
উত্তর পবনে।
যূথীগুলি সকরুণ গন্ধে
আজি তা'রে বন্দে,
নীপ-বন মর্ম্মর ছন্দে
জাগে তার স্তবনে।
শ্যামঘন তমালের কুঞ্জে
পল্লবপুঞ্জে
আজি শেষ মল্লারে গুঞ্জে
বিচ্ছেদগীতিকা" ... ...

* * * *

তারপর এল শরৎ বর্ণনের পালা :—

"শরৎ ডাকে ঘরছাড়ানো ডাকা
কাজ ভোলানো সুরে—

চপল করে হাঁসের দুটি পাখা
ওড়ায় তারে দূরে।
শিউলি কুঁড়ি যেমনি ফোটে শাখে
অম্‌নি তারে হঠাৎ ফিরে ডাকে,
পথের বাণী পাগল করে তাকে,
ধূলায় পড়ে ঝুরে।
শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা
কাজ খোয়ানো সুরে॥"

আবার শরতের এল বিদায় নেবার পালা—

"তোমার নয়নে এখনো র'য়েছে হাসি,
বাজায়ে সোহিনী এখনো মোহিনী বাঁশী ওঠে উচ্ছাসি।
এই তব আসা-যাওয়া
একি খেয়ালের হাওয়া,
মিলন-পুলক তাতেও কি অবহেলা,
আজি বিরহ-ব্যথার বিষাদ এও কেবলি খেলা ?"

শরতের বিদায়ে শেফালি ও পদ্ম লাগলো কাঁদতে। কাশের শিখা থরথর ক'রে উঠল কেঁপে। মালতী ফুল মলিন হয়ে পড়ল ঝরে, কিন্তু শরতের আর থাকবার জো নাই। এল হেমন্ত, হিমের ঘন ঘোমটায় তার নয়ন পড়েছে ঢাকা, কুয়াশাতে মলিন হোয়েছে সন্ধ্যা-প্রদীপ ; করুণবাষ্পে পূর্ণ হোয়েছে বাতাস কিন্তু ধরার আঁচল ভরে উঠল সোনার ধানে। এর পরে এল শীত—

"জাগুক মন, কাঁপুক বন, উড়ুক ঝরা-পাতা,
হউক জয়, তোমারি জয়, তোমারি জয়-গাথা।

ঋতুর দল নাচিয়া চলে
ভরিয়া ডালি ফুলে ও ফলে,
নৃত্য-লোল চরণতলে
মুক্তি পায় ধরা,—
ছন্দে মেতে যৌবনেতে রাঙিয়ে ওঠে জরা ॥

সর্ব্বনাশার নিঃশ্বাস বায়
লাগলো ভালে।
নাচ চরণ শীতের হাওয়ায়
মরণ তালে।
করবো বরণ, আসুক কঠোর,
ঘুচুক অলস সুপ্তির ঘোর,
যাক্ ছিঁড়ে মোর বন্ধন ডোর
যাবার কালে ॥
ভয় যেন মোর হয় খান্ খান্
ভয়েরি ঘায়ে,
ভরে যেন প্রাণ ভেসে এসে দান
ক্ষতির বায়ে।
সংশয়ে মন না যেন দুলাই,
মিছে শুচিতায় তা'রে না ভুলাই,
নির্ম্মল হবো পথের ধূলাই
লাগিলে পায়ে ॥"

শীতের সময় যে সমস্ত পাতা ঝরে যায় মনে হয় যেন বনস্পতির জীবনী-শক্তি গেছে বিনষ্ট হোয়ে, তাতেই আভাস দেয় একটা মৃত্যুর। কিন্তু তারই

পরে আসে বসন্তের নব গুঞ্জরণ। এই ভাবটী কবির মনকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করে তুলত। ফাল্গুনী নাটকে এবং আরও অনেক কবিতায় তিনি এই ভাবটী প্রকাশ করেছেন যে আমাদের জীবন মৃত্যুগুহার মধ্যে ক্ষণকাল অদৃশ্য হোয়ে আবার নবীনরূপে আত্ম প্রকাশ করে :—

"যাহা-কিছু মোর তুমি, ওগো চোর,
হরিয়া ল'বে
জেনো বারে বারে ফিরে ফিরে তা'রে
ফিরাতে হবে।
যা কিছু ধূলায় চাহিবে চুকাতে
ধূলা সে কিছুতে নারিবে লুকাতে,
নবীন করিয়া নবীনের হাতে
স'পিবে কবে॥"

কিন্তু শীতকেও বিদায় নিতে হোল। শীতের বিবর্ণ সজ্জা থেকে নগ্ন-তরুর শাখা পত্রে পত্রে হোল মুঞ্জরিত। নানা রঙের ফুল ফুটে উঠলো তার গায়ে। যে সম্পদ শীত নিয়েছিল হরণ কোরে, তার বহুগুণ এল বসন্তের দানে—

"তোমার নিয়মে বিবর্ণ ছিল সজ্জা
নগ্নতরুর শাখা পেতো তাই লজ্জা।
তাহার আদেশে আজি নিখিলের বেশে
নীল পীত রাঙা নানা রঙ্ ফিরে এসে,
আকাশের আঁখি ডুবাইবে রসাবেশে
জাগাইবে মত্ততা।"

তারপরে এল বসন্ত, অনেকগুলি কবিতায় কবি বসন্তের বর্ণনা করেছেন, তার পরিচয় এই স্বল্প-পরিসর প্রবন্ধে দেওয়া অসম্ভব, তবু দুএকটী কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি :—

"তাই আজি ধরিত্রীর যত কর্ম্ম, যত প্রয়োজন
হলো অবসান।
বৃক্ষশাখা রিক্ত ভার, ফলে তার নিরাসক্ত মন,
ক্ষেতে নাই ধান।
বকুলে বকুলে শুধু মধুকর উঠিছে গুঞ্জরি'
অকারণ আন্দোলনে চঞ্চলিছে অশোক-মঞ্জরী,
কিশলয়ে কিশলয়ে নৃত্য উঠে দিবস-শর্ব্বরী,
বনে জাগে গান॥"

আবার

"রঙ্ লাগালে বনে বনে
ঢেউ জাগালে সমীরণে।
আজ ভুবনের দুয়ার খোলা,
দোল দিয়েছে বনের দোলা
কোন্ ভোলা সে ভাবে ভোলা
খেলায় প্রাঙ্গণে॥"

আবার

"সন্ন্যাসী যে জাগিল, ঐ জাগিল, ঐ জাগিল,
হাস্যভরা দখিন বায়ে
অঙ্গ হ'তে দিল উড়ায়ে
শ্মশান-চিতাভস্মরাশি ভাগিল কোথা, ভাগিল।
মানস লোকে শুভ্র আলো
চূর্ণ হয়ে রং জাগালো,
মদির রাগ লাগিল তা'রে,
হৃদয়ে তা'র লাগিল,

আয়রে তোরা আয়রে তোরা আয়রে,
রঙের ধারা ঐ যে ব'হে যায় রে ॥"

বসন্তের এবার এল বিদায়ের পালা—

"রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার
যাবার আগে,—
আপন রাগে
গোপন রাগে,
অরুণ হাসির অরুণ-রাগে,
অশ্রুজলের করুণ-রাগে
রং যেন মোর মর্ম্মে লাগে
আমার সকল কর্ম্মে লাগে
সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে,
গভীর রাতের জাগায় লাগে ॥"

নানারূপের মধ্য দিয়ে কবি ফিরছিলেন তাঁর মনের মানুষকে অনুসন্ধান কোরে। কার যেন নয়নের চাওয়া তাঁর পানে যুগিয়েছিল হাওয়া। কত ফাগুনের দিনে তিনি পথ চলেছেন। কত শ্রাবণ-রাতের স্বপ্নে বিভোর করেছেন মন। চাওয়া পাওয়া নিয়ে চলেছিল খেলা। তাঁর মনের মানুষটিকে কখন বা পেতেন পাশে, কখন সে যেত হারিয়ে। শরৎ এসেছিল ফুলের সাজি নিয়ে, শীত এসেছিল গোধুলি কালের দীপশিখা নিয়ে। কত না বেজেছিল করুণ সুর, কত না মেতে উঠেছিল আনন্দের নৃত্য। সেই সমস্ত হাসি-কান্না, বাঁধন-খোলা ও বাঁধন বাঁধা অনেক দিনের অনেক মধু, অনেক মায়া, আজ যেন এক হোয়ে কবির চিত্তকে মত্ত কোরে তুলেছে। নানা স্থানে যারা ছিল নানা হোয়ে, আজ তারা জানায় দুয়ারে দিয়েছে হানা; এখন কবি বুঝতে পেরেছেন

এই ঋতু-নাট্যের যথার্থ তাৎপর্য্য। একই দোলাতে যে ভিতর বাহির নৃত্য কোরে ফিরছে তার তাৎপর্য্য তিনি উপলব্ধি কোরেছেন।—

"আজ নাই আধা আধি
ভিতর বাহির বাঁধি'
এক দোলাতেই দোলে
মোর অন্তরতম॥"

ঋতুদের মধ্যে আনাগোনার যে উৎসব চলেছে, পৃথিবীময় একটা আনন্দের নাট্যলীলা চলেছে, কবি সেই রস এমন কোরে পান কোরতেন যে বাস্তব জগতে এই প্রাণলীলা তাঁর চোখের কাছে মানুষের আনন্দলীলার মতনই প্রত্যক্ষ হোয়ে উঠত। নবীন বলে একটী সঙ্গীত-নৃত্যে তাঁর মনের এই রসসম্ভোগের দিকটী স্ফূর্ত্ত হোয়ে উঠেছে। প্রথম পর্ব্বে আমরা দেখতে পাই বসন্ত-বন্দনা—

"বাসন্তী, হে ভুবন মোহিনী,
দিক্‌প্রান্তে, বনবনান্তে
শ্যাম প্রান্তরে আমছায়ে
সরোবর তীরে নদীনীরে
নীল আকাশে মলয় বাতাসে,
ব্যাপিল অনন্ত তব মাধুরী।"

এই বসন্তের আনন্দের সুর যেন নির্ঝরিণীকে কোরে তুলেছে কলহাস্য-চঞ্চলা। চূর্ণ চূর্ণ সূর্য্যের আলো উদ্বেল তরঙ্গ-ভঙ্গের অঞ্জলি বিক্ষেপে। এই আনন্দ আবেগের মধ্যে রয়েছে অক্ষয় শৌর্য্যের অনুপ্রেরণা। রসরাজের নিমন্ত্রণের প্রসন্নতা আজ নেমে এসেছে কুঞ্জে কুঞ্জে; পুঞ্জীভূত হোয়ে উঠেছে অন্তঃস্মিত গন্ধরাজ মুকুলের প্রচ্ছন্ন গন্ধরেণুতে। সকলেই চাচ্ছে নটরাজের সুরের দীক্ষা।

"সুরের গুরু, দাওগো সুরের দীক্ষা
মোরা সুরের কাঙাল, এই আমাদের ভিক্ষা
মন্দাকিনীর ধারা, উষার শুকতারা
কনক চাঁপা কানে কানে যে সুর পেল শিক্ষা।"

সবাই চেয়ে রয়েছে নূতনের আবির্ভাবের পথ চেয়ে

"আন্‌গো তোরা কার কী আছে,
দেবার হাওয়া বইল দিকে দিগন্তরে
এই সুসময় ফুরায় পাছে

* * * *

দখিন হাওয়া হেঁকে বেড়ায় জাগো জাগো,
দোয়েল কোয়েল গানের বিরাম জানে নাগো,
রক্ত রঙের জাগলো প্রলাপ অশোক গাছে।"

মাধুর্য্যের অতল সমুদ্রে আজ দানের জোয়ার লেগেছে।

"ফাগুন তোমার হাওয়ায় হাওয়ায়
করেছি যে দান
আমার আপন-হারা প্রাণ
আমার বাঁধন-ছেড়া প্রাণ।"

কেবল দেওয়ার অজস্র ঝরণা চলেছে—

"গানের ডালি ভরে দেগো উষার কোলে
আয়গো তোরা, আয়গো তোরা আয়গো চলে।
চাঁপার কলি চাঁপার গাছে
সুরের আশায় চেয়ে আছে
কান পেতেছে নূতন পাতা গাইবি বলে।"

চাঁদ তিথির পর তিথি পেরিয়ে তার উৎসবের তরণী পূর্ণিমার ঘাটে পৌঁছে দিচ্ছে।

"তিথির পরে তিথির ঘাটে
আসিছে তরী দোলের নাটে
নীরবে হাসে স্বপনে ধরণী।"

চারিদিকে চলেছে পাওয়া আর না পাওয়ার দোল। এক প্রান্তে মিলন আর এক প্রান্তে বিরহ, এই দুই প্রান্ত স্পর্শ কোরে কোরে দুলছে বিশ্বের হৃদয়। পূর্ণ আর অপূর্ণের মধ্যে চলেছে দোল। ছায়ায় ছায়ায় ঠেকে রূপ জাগায়ে জীবন থেকে মরণে, বাহির থেকে অন্তরে। এই ছন্দটী বাঁচিয়ে যে চলতে চায় তারই থাকে যাওয়া-আসার দরজা খোলা।

"আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্ব্বনাশের আশায়
আমি তার লাগি' পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায়।
যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে
ভালবাসে আড়াল থেকে
আমার মন চলেছে সেই গভীরে
গোপন ভালবাসায়।"

আজ আর সঙ্কোচের দিন নেই। যে বের হোতে ভয় পাচ্ছে তাকে দিতে হবে আজ সাহস।

"হে মাধবী, দ্বিধা কেন, আসিবে কি ফিরিবে কি,
আঙিনাতে বাহিরিতে মন কেন গেল ঠেকি।"

চির নবীন আজ এসেছে শিশু হোয়ে। পাতায় পাতায় জমেছে তার ছেলেখেলা। দোসর হয়েছে সূর্য্যের আলো। সারা বেলা কলপ্রলাপে কোরছে ঝিকিমিকি।

পথ এনে পথিককে পৌঁছে দেয়। কিন্তু যে পথ কাছে নিয়ে আসে সেই

পথই নিয়ে যায় দূরে। ঘরের মধ্যে মিলন স্থায়ী হয় না। পথে বেরিয়ে পড়লে তবেই পথিকের সঙ্গে বিচ্ছেদ এড়ান যায়, তাই পথকে করি প্রণাম।

"মোর পথিকের তুমি এনেছ এবার
করুণ রঙীন পথ,
এসেছে এসেছে অঙ্গনে মোর
দুয়ারে লেগেছে রথ।"

পথ নিয়ে আসে পথিককে। বস্তুত পথ আর পথিকে তফাৎ নেই। পথ হোচ্ছে যাওয়ার স্পন্দনের স্রোত। প্রত্যেকটী স্পন্দন হোচ্ছে তার পথিক; যাত্রার সঙ্গে মিলে গেছে যাত্রী, তাই পথে না বেরুলে পথিককে পাওয়া যায় না!

এর পর আরম্ভ হোল দ্বিতীয় পট। নাট্যলীলায় এল যেন ভাবসন্ধি। কোকিল এখন ডাকছে। শিরীষ বনে পূর্ণ হোয়ে উঠেছে পুষ্পাঞ্জলি, তবু কিসের যেন একটা বেদনা অশথ গাছের পাতায় পাতায় শিউরে উঠছে। বুঝি বা নীরব হোতে চলেছে বসন্তের বীণা।

"কেন ধরে রাখা ওযে যাবে চলে
মিলন লগন গত হোলে,
স্বপন শেষে নয়ন মেল
নিবু নিবু দীপ নিবায়ে ফেল।
কি হবে শুকান ফুলদলে।"

* * "চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন চলে যায়
দূর শাখে পিক ডাকে বিরাম বিহীন।
অধীর সমীর ভরে
উচ্ছ্বসি বকুল ঝরে
গন্ধ সনে হোল মন সুদূরে বিলীন।"

এক দিন ঝরা পাতা বসন্তকে এনেছিল ডেকে। আজ আবার বৈশাখের খর প্রতাপ পাতা ঝরিয়ে তাকেই দিচ্ছে বিদায়।

"ঝরা পাতা আমি গো তোমারই দলে।
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে
ফাগুন দিল বিদায় মন্ত্র
আমার হিয়া তলে।"

পথিক এসে দূরের বাণীকে দেয় জাগিয়ে, আর কাছের বাঁধনকে দেয় আলগা কোরে। একটা অপরিচিতের দিয়ে যায় ঠিকানা, কালে কালে মন হোয়ে ওঠে উদাস।

"বাজে করুণ সুরে, (হায় দূরে,)
তব চরণ-তল-চুম্বিত পান্থ-বীণা।
এমন পান্থচিত-চঞ্চল
জানি না কি উদ্দেশে॥"
"যূথী গন্ধ আশান্ত সমীরে
ধায় উতলা উচ্ছাসে,
তেমনি চিত্ত উদাসীরে
নিদারুণ বিচ্ছেদের নিশীথে।"

সমালোচনায় কাব্যের যথার্থ পরিচয় দেওয়া যায় না। কাব্যের পরিচয় পাওয়া যায় তার আস্বাদে, সে আস্বাদ হোচ্ছে সরবতের মত। তাতে যেমন থাকে রসের মিষ্টতা তেমনি থাকে নানাজাতীয় গন্ধ। থাকে ছন্দ, থাকে শব্দের ছটা, অর্থের দূর-প্রসারী ছায়া, সুরের দোলা ও অন্তর্নিহিত কোন না কোন সত্যের ব্যঞ্জনা। এই সমস্তগুলি মিশ্রিত হোয়ে জমে ওঠে কাব্যের রস। গীতি-নাট্যগুলিতে এর সঙ্গে যোগ দেয় বসন-ভূষণের সজ্জা, রঙ্গমঞ্চের শোভা এবং নাচের ছন্দ। যারা শুনতে আসে তারা অর্দ্ধেক মন ভিজিয়েই আনে, তাই গীতি-নাট্যের প্রত্যক্ষ দর্শনে সদ্য সদ্য ওঠে রসের অঙ্কুর গজিয়ে। এ যেন মায়াবীর মায়া-আচ্ছাদনের মধ্যে থেকে চূত বৃক্ষের উদ্গম আর তার শাখায় শাখায় চূত ফলের আস্বাদ; সমালোচকের সাধ্য নেই যে সে এই রসকে কোনক্রমে পরিবেশন

করে। রসের গণ্ডী পেরিয়ে সমালোচক তার দাঁত ঠেকায় আঁটিতে। তার ভাষায় সে রসকে পারে না ধ্বনিত কোরতে, সে খালি দেখাতে পারে যে রসের অন্তর্নিহিত হোয়ে কোন্ বস্তুটা ধ্বনিত হোয়ে উঠছে। সে পারে বুদ্ধির খোরাক জোগাতে, রস পরিবেশনের দরকারে তার প্রবেশ নেই। রসে যখন মানুষ বিভোর হয় তখন সে অন্য কিছুর খোঁজ রাখে না। রস যখন আসে ফিকে হয়ে, বুদ্ধি তখন চায় তার পাঁচ আঙ্গুলের মুঠো দিয়ে বস্তুটাকে আঁকড়ে ধরতে; সে বলে এমন বিভোর হওয়ার হেতু কি? বস্তুটা কি পেয়েছে? রসিক বলে তাত জানি না, জানবার খেয়ালও হয়নি। আবার প্রশ্ন হয়, অকারণে এত খুসী হওয়ার তোমার অধিকার কি, খুসী হওয়ার অধিকার ঘটে খুসী হওয়ার উপাদানে আর যে খুসী হয় তার মনে, এই দুয়ের আছে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, তাকে বিশ্লেষণ কোরে দেখান যায় না কিন্তু তবু বুদ্ধির খোঁজা নিষ্ফল নয়। আম খেয়ে আমরা আঁটিটা ফেলে দিই, রসাস্বাদের পক্ষে আঁটিটা নিষ্প্রয়োজন। তবু আঁটিটা একেবারে প্রয়োজনহীন নয়। তাকেই অবলম্বন কোরে ঘটবে কালান্তরে বহুরসের পরিবেশন; কবির অন্তরেও আঁটির মতনই থাকে সত্যানুভবের একটা বীজ, মুক্তা গাঁথবার একটা সূত্র! তাই নিয়ে তিনি গাঁথেন মালা, উৎপন্ন করেন নানা ব্যঞ্জনায় নানাবিধ ফুলের ফসল। সমালোচক চায় এ বীজের স্বরূপটি নির্ণয় কোরতে। মালা থেকে সে পৃথক কোরে নেয় মালার সুতো, সে বের কোরতে চায় চেতনার মধ্যে রসের ভিত্তি কোথায়, আর সেই ভিত্তি কাব্য দ্বারা কেমন কোরে হয়েছে উদ্ভাসিত। এই উদ্ভাসের সঙ্গে পরিচয় হোলে চেতনা লোক থেকে রসলোককে স্পর্শ করা যায়। এ স্পর্শ না ঘটলে সত্যের মধ্যে রসলোকের প্রতিষ্ঠা কোথায় তা অনুভব করা যায় না। মেঘের মত ঝরঝরিয়ে ঘটে রসবৃষ্টি কিন্তু রসবৃষ্টিতেই রসের শেষ। বর্ষণের পর আর মেঘকে খুঁজে পাওয়া যায় না। রসবৃষ্টি ক্ষণিক মেঘের ঝরণা নয়, সে ঝরণা ঝরে নিত্য লোকের আকাশ থেকে। সেই আকাশকে একদিকে আমরা যেমন পাই রসের পরিচয়ে অপরদিকে তেমনি পাই চেতনায় উন্মেষিত প্রত্যয়ে, এইটুকুই সমালোচকের কাজ।

শেষ-সপ্তক

বৈশাখ ১৩৪২

সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি এই স্বরসমষ্টিকে সপ্তক বলে। উদারা, মুদারা, তারা এই তিনটি গ্রাম। শেষ গ্রাম হোচ্ছে তারা। এই অনুসারেই শেষ সপ্তক বলতে তারাগ্রামের সাতটি স্বরের সমষ্টি বোঝায়। কবির শেষ জীবনের এই কাব্যগ্রন্থে জীবনের নানা স্বর এসে স্থান পেয়েছে। নামটিতে বোধ হয় এই কথাই বুঝা যায়। এই কাব্যগ্রন্থে ছেচল্লিশটি গদ্য কবিতা আছে। যদিও কবি সাতটি স্বরের কথা বলেছেন তবুও আমাদের মনে হয় যে তার প্রধান স্বরটিই হোচ্ছে গতির স্বর, কবি তাঁর যৌবনের প্রান্তসীমা থেকে যা কিছু অনুভব কোরেছেন, স্মৃতি-বিস্মৃতির নানা বর্ণে যা হয়ে আছে রঞ্জিত, দুঃখ সুখের বাষ্প ঘনিমায় যা প্রাপ্ত হোয়েছে জড়িমা, ঝরে পড়া ফুলের ঘনগন্ধে স্বপ্ন মৌমাছির গুন্‌গুনানিতে যে অলক্ষ্য সৌরভ ছায়ার বেড়ায় বদ্ধ প্রাচীন দিনগুলির মধ্যে আবদ্ধ হোয়ে আছে, কবি সেগুলিকে টানতে চান সৃষ্টির মহাসাগরে; চলতে চান লক্ষ্যহীন পথে, চলন্ত দিন-রাত্রির কলরোলের মধ্যে আপনাকে মিলিয়ে নিতে চান্ শস্য-শেষ প্রান্তরের সুদূর বিস্তৃত বৈরাগ্যে। সহস্র বৎসরের নীরব সমাধিতে মগ্ন হোয়ে রয়েছে যে শালবৃক্ষ নিজের ধ্যানকে নিবিষ্ট কোরতে চান্ তার মধ্যে। এদিকে বাইরে চলেছে অস্তিত্বের ধারা। কাক ডাকছে তেঁতুলের ডালে। চিল মিলিয়ে যাচ্ছে দূর নীলিমায়, ডিঙি নিয়ে মাছ ধরছে জেলেরা, বাঁশের খোঁটায় স্তব্ধ হোয়ে বসে আছে মাছরাঙা। অতি পুরাতন প্রাণের নানা পণ্য নিয়ে চলেছে প্রাণের এই সহজ প্রবাহ। মানব-ইতিহাসে চলেছে ভাঙা গড়ার নানা লীলা। এই ধারার গভীরে কবি চান আকণ্ঠ ডুবে যেতে। তিনি চান—

এর কলধ্বনি বাজবে আমার বুকের কাছে
আমার রক্তে মৃদুতালের ছন্দে।

এর আলোছায়ার উপর দিয়ে
ভাস্‌তে ভাস্‌তে চলে যাবে আমার চেতনা
চিন্তাহীন, তর্কহীন, শাস্ত্রহীন
মৃত্যু মহাসাগর সঙ্গমে।

কত বৎসরের বর্ষার আনন্দ কবির মজ্জার মধ্যে রস-সম্পদ জুগিয়েছে একটু একটু কোরে, প্রতিবার লেগেছে জীবনের পটভূমিকায় নিবিড়তর হোয়ে রঙের প্রলেপ। শিল্পকারের অঙ্গুলিমুদ্রার ব্যাপ্ত সঙ্কেত অঙ্কিত হোয়েছে তাঁর অন্তর ফলকে, বিস্মৃত মুহূর্তের কত সঞ্চয় পুঞ্জিত হোয়ে ক্রমশঃ আঢ্যতর কোরে তুলেছে জীবনের গুপ্তধনের ভাণ্ডার, বহু-বিচিত্র কারুকলায় এমনি কোরে চিত্রিত হোয়েছে কবির সমগ্র সত্ত্বা, তাঁর সমস্ত সঞ্চয়ের পরিচয় কোন দিন হবে না অনাবৃত। অথচ তাঁর তপস্যার মধ্যে তিনি চেয়েছেন আপনাকে প্রকাশ কোরতে, তাই কবি বলছেন—

কবির প্রকাশ হবে পূর্ণ,
আপনি প্রত্যক্ষ হব আপনার আলোতে,
বধূ যেমন সত্য কোরে জানে আপনাকে,
সত্য কোরে জানায়।
যখন প্রাণে জাগে তার প্রেম,
যখন দুঃখকে পারে সে গলার হার কোরতে,
যখন দৈন্যকে দেয় সে মহিমা
যখন মৃত্যুতে ঘটে না তার অসমাপ্তি।

দিনের প্রান্তে গোধূলির ঘাটে পথে পথে যে পাত্র পূরণ করেছি নানা ভিক্ষায়; কঠিন দুঃখে যা করেছিলুম অর্জ্জন তার সার্থকতার কথা কখন মনে পড়েনি। অকারণে বেড়িয়েছি কুড়িয়ে; অন্ধ অভ্যাসে রুদ্ধ করেছিল দৃষ্টি, আজ যখন পথ এল ফুরিয়ে, দিনের আলো ডুবে গেল নিশীথের অন্ধকারে, জীবনের আলো গেল নিভে, সুর গেল থেমে। তবু এই জীবনকে যা একদিন

পূর্ণ করে রেখেছিল তাকে সত্য বলেই মানতে হবে। কোনদিন দৈবে কারুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল যে হয়ত জল ভরা ঘট নিয়ে চলে গিয়েছিল চকিত পদে এই সামান্য ছবিটুকুরও মূল্য আছে জীবনের প্রবাহের মধ্যে। তবু চাইনে আমরা পিছনে ফেলে যেতে দীর্ঘনিঃশ্বাসের একটা মলিন ছায়া, ধূলোর হাতে উজাড় করে দিই আমরা আমাদের সমস্ত দাবী তারপর আর পিছনে ফিরে অর্ঘ্য সংগ্রহের মায়ায় যেন আমাতে আমরা বদ্ধ না করি, যাকিছু যার দেবার আছে, তা দিতে হবে যেখানে জীবন-প্রবাহ চলেছে কালপ্রবাহের সঙ্গে তাল রেখে।

হাজার হাজার বছরের মরু যবনিকার অন্তরাল থেকে যখন আবিষ্কৃত হয় দিন তারিখ হারানো একটা প্রাচীন ইতিহাসের মহাকঙ্কাল তখন আমরা দেখতে পাই যে সেকালের সমস্ত বাণী গেছে স্তব্ধ হোয়ে, অঙ্কুরিত সমস্ত কবিগান গিয়েছে ধ্বংস হোয়ে ধোঁয়ার মধ্যে সব হোয়েছে বিলীন, যা বিকিয়েছিল যা বিকায়নি তার সমস্ত পেয়েছে এক মূল্য, অথচ কোথাও নেই তার ক্ষত, কোথাও বাজেনি তার ক্ষতি। কত কল্প কল্পান্তর ধরে নূতন নূতন বিশ্বের চলেছে ভাঙা-গড়া মহা আকাশের মধ্যে। মিশে গিয়েছে তারা আলোড়িত নক্ষত্রের ফেনপুঞ্জে, তেমনি করেই তারা বিলীন হোয়ে গেছে যেমন করে বিলীন হয় বর্ষণক্লান্ত মেঘ, তাই কবি বলছেন—

> মহাকাল, সন্ন্যাসী তুমি,
> তোমার অতলস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ শিখরে
> উচ্ছৃত হোয়ে উঠছে সৃষ্টি
> আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গতলে।
> প্রচণ্ড বেগে চলেছে ব্যক্ত অব্যক্তের চক্র নৃত্য,
> তারি নিস্তব্ধ কেন্দ্রস্থলে
> তুমি আছ অবিচলিত আনন্দে।
> হে নির্ম্মম, দাও আমাকে তোমার ঐ সন্ন্যাসের দীক্ষা
> জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে

যেখানে আছে অক্ষুব্ধ শান্তি
সেই সৃষ্টি-হোমাগ্নিশিখার অন্তরতম
স্তিমিত নিভৃতে
দাও আমাকে আশ্রয়।

কবি বলছেন যে প্রাণপ্রবাহের এই প্রবাহ-ধর্ম্মই একমাত্র সত্য, এর মধ্যে যা ফুটে ওঠে তা দিয়ে অমর করবার চেষ্টা মিথ্যা বাতুলতা মাত্র। অজন্তার গুহায় প্রস্তরের ভিত্তিতে ভিত্তিতে অজ্ঞাতনামা রূপকার বর্ণে বর্ণে চিত্রিত করে গেছে তার ছবি, রেখে যায়নি তার নাম, উপেক্ষা করেছে আপন পরিচয়কে, নাম দিয়েছে মুছে, নামের মায়া বন্ধন থেকে মুক্ত হোয়ে তারা পেয়েছে অনির্ব্বচনীয়ের স্বাদ, তাঁরা ছিলেন রূপের তাপস। তাঁদের নিঃশব্দ বাণী ঝঙ্কৃত হোচ্ছে গুহায় গুহায়। খ্যাতির কামনা, যশের কামনা, সে ত প্রেতের আহার, ওপারে যে চলে যাবে তার ত শক্তি নেই ভোগ করার। সেই ভাবীকালের পূজার অর্ঘ্য অন্নপূর্ণার যে অন্ন আজ আমরা সাদরে গ্রহণ করছি তা ফেলে ভোগশক্তিহীন নিরর্থক ভাবীকালের খ্যাতির দিকে লোলুপ হবার কি কোন অর্থ আছে। সামনে দেখি সজনে গাছের পাতা ঝরছে, কচি পাতায় উঠছে রোমাঞ্চ, মধ্যাহ্নের তপ্ত হাওয়া গাছে গাছে ফিরছে দোল খেয়ে। নানা পাখীর কলগান বাতাসে এঁকে দিচ্ছে অস্ফুট আলপনা। এই নিত্যবহমান স্রোতের মধ্যে চলেছে আত্মবিস্মৃত প্রাণের হিল্লোল, ঝলমল করে উঠছে সমস্ত দিক্ দিগন্ত, কৃষ্ণচূড়ার পুষ্পাবলীতে এইত আমাদের অন্নপূর্ণার দান; মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অঞ্জলি ভরে আমরা এই প্রাণপ্রবাহকে পাচ্ছি পান কোরতে; এর সত্যে ত কোন সংশয় নেই। মৃত্যুর পরের যে খ্যাতি তা ভোগ কোরবে কোন প্রেতের কঙ্কাল। এই পাতারই হিল্লোলের মত কবি যান তাঁর অন্তরে গান গেয়ে, রৌদ্রের ঝলকের মত তাঁর মধ্যে স্ফুট হোয়ে ওঠে প্রকাশের হর্ষ বেদনা, তার যেটুকু সত্য তা সেই মুহূর্ত্তেই পেয়েছে তার সমাপ্তি তার পূর্ণতা। ভবিষ্যতে নামের বোঝা চাপালে তার বৃদ্ধি হবে না এতটুকু, বৃদ্ধি

মৃত্যুর পর চলতে থাকে বেদনাহীন চেতনাহীন ছায়ামাত্র-সার একটা কবিখ্যাতি একটা নামের খ্যাতি, তবে—

ধিক্ থাক সেই কাঙাল কল্পনার মরীচিকায়।
জীবনের অল্প কয়দিনে
বিশ্বব্যাপী নামহীন আনন্দ
দিক্ আমাকে নিরহঙ্কার মুক্তি।
সেই অন্ধকারকে সাধনা করি
যার মধ্যে স্তব্ধ বসে আছেন
বিশ্বচিত্রের রূপকার, যিনি নামের অতীত,
প্রকাশিত যিনি আনন্দে।

ভেবে দেখলে দেখা যায় যে আমাদের নাম আমাদের কতটুকু পরিচয় দেয়। আমার সত্তা যেন একটি অগম্য গ্রহ। বাষ্প আবরণের মধ্যে সে রয়েছে ঢাকা। মাঝে মাঝে যেটুকু ফাঁক হয় তারি মধ্যে দিয়ে তার একটু পরিচয় পাওয়া যায় দূরবীণে; যাকে বলতে পারা যায় আমার সবটা। তার নক্সা এখনও শেষ হয়নি, তার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ কোন ব্যবহার নেই। এই অনাবিষ্কৃতের প্রান্ত থেকে যে টুকরোগুলো আমরা সংগ্রহ করি তাকেই জোড়া তাড়া দিয়ে দিই একটা নাম, চারিদিক থেকে নানা বেদনার রঙিন্ ছায়া নেমে আসে আমাদের চিত্তপটে, তার অন্তরে যে অদৃশ্য হয়ে রয়েছে সেত হয় না স্পষ্ট, ভাষার বাঁধুনিতে তাকে ধরা যায় না। জীবনের একপ্রান্ত রয়েছে কর্ম্ম-বৈচিত্র্যে বন্ধুর হোয়ে, তার অপর প্রান্ত রয়েছে অচরিতার্থ সাধনায় বাষ্পায়িত হোয়ে, তার ছবি আঁকা পড়ছে মরীচিকার মধ্যে, আমাদের জীবনে যেটুকু ব্যক্ত হোয়েছে জন্ম মৃত্যুর সঙ্গমস্থলে তার পিছনে রয়েছে পুঞ্জীভূত অপ্রত্যক্ষতা, রয়েছে আত্ম-বিস্মৃত শক্তি, মূল্য পায়নি এমন মহিমা; সেখানে হয়ত রয়েছে ভীরুর লজ্জা, প্রচ্ছন্ন আত্মাবমাননা, আত্মাভিমানের ছদ্মবেশে বহু উপকরণ—যেখানে রয়েছে ঘন কালিমা অপেক্ষা কোরছে তার মৃত্যুর সম্মার্জ্জনীর স্পর্শ। হয়ত রয়েছে সেখানে কত সূচনা কত

ব্যঞ্জনা যা প্রকাশ লাভ কোরতে পারেনি কর্ম্মের মধ্যে বা ভাষার মধ্যে, তার ধ্বংস হবে অকস্মাৎ নিরর্থকতার অতলে, নামের মধ্যে যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে তার অগোচরে কেন রয়েছে এই বিরাট সত্তা, কেন বিধাতা দিয়েছেন তার উপরে অপ্রকাশের পর্দ্দা টেনে, তাই কবি বলছেন—

অপ্রকাশের পর্দ্দা টেনেই কাজ করেন গুণী ;
ফুল থাকে কুঁড়ির অবগুণ্ঠনে,
শিল্পী আড়ালে রাখেন অসমাপ্ত শিল্পপ্রয়াসকে ;
কিছুকিছু আভাস পাওয়া যায়,
নিষেধ আছে সমস্তটা দেখতে পাওয়ার পরে।
আমাতে তাঁর ধ্যান সম্পূর্ণ হয়নি,
তাই আমাকে বেষ্টন কোরে এতখানি নিবিড় নিস্তব্ধতা।
তাই আমি অপ্রাপ্য, আমি অচেনা ;
অজানার ঘোরের মধ্যে এ সৃষ্টি রয়েছে তাঁরই হাতে,
কারও চোখের সামনে ধরবার সময় আসেনি,
সবাই রইল দূরে,—
যারা বল্‌লে 'জানি' তারা জান্‌লো না।

আর একটি কবিতায় কবি বলছেন যে সব মানুষই অজানা, তারা আপনার রহস্তে আপনারা একাকী। সংসারের ছাপমারা কাঠামো দিয়ে সংজ্ঞার বেড়া দিয়ে আমরা মানুষের সীমা রচনা করি কিন্তু যখন কারুকে ভালবাসা যায় তখন সেই ভালবাসায় সীমার আড়ালটা পড়ে খসে, তাকে আমরা আবিষ্কার করি নূতন কোরে, সে স্বয়ং স্বতন্ত্র অপূর্ব্ব অসাধারণ, তার জুড়ি কেউ নেই। গানের মধ্য দিয়ে ফুলের ভাষার ইঙ্গিতে করতে হয় তার অভ্যর্থনা—

চোখ বলে,
যা দেখলুম, তুমি আছ তাকে পেরিয়ে।

মন বলে
　চোখে-দেখা কানে-শোনার ওপারে যে রহস্য
　তুমি এসেছ সেই অগমের দূত,—
　　　　রাত্রি যেমন আসে
　পৃথিবীর সামনে নক্ষত্রলোক অবারিত ক'রে।
　তখন হঠাৎ দেখি আমার মধ্যেকার অচেনাকে,
　তখন আপন অনুভবের
　　তল খুঁজে পাইনে,
　সেই অনুভব
　　"তিলে তিলে নূতন হোয়।"

এই কথাটি কবি আর একটি কবিতায় বোলেছেন—

　"রাস্তায় চলতে চলতে বাউল এসে থামল
　　তোমার সদর দরজায়।
　গাইল, "অচিন্ পাখী উড়ে আসে খাঁচায় ;"
　দেখে অবুঝ মন বলে—
　　অধরাকে ধরেছি।
　তুমি তখন স্নানের পরে এলোচুলে
　　দাঁড়িয়েছিলে জানলায়,
　অধরা ছিল তোমার দূরে চাওয়া চোখের পল্লবে,
　অধরা ছিল তোমার কাঁকণ-পরা নিটোল হাতের মধুরিমায়,
　ওকে ভিক্ষে দিলে পাঠিয়ে,
　　ও গেল চলে ;
　জানলে না এই গানে তোমারই কথা।
　　তুমি রাগিণীর মত আস যাও
　　　একতারার তারে তারে।"

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে রূপ থেকে রূপের বাহিরে সীমাহীনের মধ্যে একটা ব্যাপ্তি। রূপকে নিয়ে থাকি আমরা মিলনের খাঁচায় কিন্তু বিরহ নিত্য থাকে পাখীর পাখায়, তার ঠিকানা নেই, তার অভিসার দিগন্তের পারে; সকল দুঃখের বিলীনতায়।

আর একটি কবিতাতে কবি বলেছেন যে এক মুহূর্তের নিবিড় ভালবাসার নিবিড় অনুভবের মধ্যে আমরা যে নিঃসীমতা পাই তারই মধ্যে আমাদের যথার্থ বেঁচে থাকা, তার বাইরে যাকিছু জীবন সে গৌণ।

আর একটি কবিতাতে কবি দেহ থেকে আপনাকে পৃথক কোরে অনুভব করবার চেষ্টা করেছেন। দেহ এসেছে কত লক্ষ পূর্ব্ব পুরুষের রক্তের প্রবাহ নিয়ে, কত যুগের ক্ষুধা, কত যুগের তৃষ্ণা ওর মধ্যে রয়েছে সঞ্চিত। ওর জরা দিয়ে ও আচ্ছন্ন করে জরাহীন আমার স্বরূপকে। ওর প্রতি আমার মমতা অসীম তাই ওকে যখন মরণে ধরে তখন আমার ভয় লাগে, মনে থাকে না যে আমি মৃত্যুহীন—

"মুক্ত আমি স্বচ্ছ আমি স্বতন্ত্র আমি
নিত্যকালের আলো আমি,
সৃষ্টি উৎসের আনন্দধারা আমি,
অকিঞ্চন আমি;
আমার কোন কিছুই নেই,
অহঙ্কারের প্রাচীরে ঘেরা।"

রবীন্দ্রনাথের চিত্তের মধ্যে আপনার সীমাকে এড়িয়ে একটি দূরদূরান্তকে লক্ষ্য করে ছোটবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। এই প্রবৃত্তি নানাদিক দিয়ে তাঁর নানাজাতীয় কাব্যানুভবের মধ্যে ধরা পড়েছে। ধরার মধ্যে যে একটা অধরা অন্বেষণ নিরন্তর চলেছে এবং অধরাই যে ধরার তত্ত্ব এবং ধরাই যে অধরার তত্ত্ব এই কথাটি তিনি নানা ব্যঞ্জনায়, নানা স্থানে প্রকাশ কোরতে চেষ্টা কোরেছেন। ধূর্জ্জটি প্রসাদকে

লিখিত একটী কবিতায় সঙ্গীত সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন যে মানুষের জ্ঞান নিজে মূক, তাই সে করেছে ভাষাকে সৃষ্টি, তারই মধ্যে দিয়েই করে সে আপনাকে প্রকাশ। সেখানে ইঙ্গিত আছে, ব্যাখ্যা নেই যেমন বোবা বিশ্বের আছে ভঙ্গী, আছে ছন্দ, আছে আকাশে আকাশে নৃত্য; আবার দেখি পরমাণুতে পরমাণুতে চলেছে একটা নাচের চক্র, ফুটে উঠছে তাতে অযুত লক্ষ রূপ। তারা খুঁজছে আপন ব্যঞ্জনা, ঘাসের ফুল থেকে আরম্ভ কোরে আকাশের তারা পর্য্যন্ত। মানুষের বুদ্ধি চলা ফেরা কোরতে চায় কথাকে বাহন কোরে, ভাষা যখন পারে না আপনাকে প্রকাশ কোরতে সে খোঁজে ভঙ্গী, সে খোঁজে ইসারা, অর্থকে উলটিয়ে দিয়ে আনে সুর, মানুষের বোধ যখন বাহন করে সুরকে তখন সে সুর সজ্যকে বাঁধতে চায় সীমায়, ভঙ্গীতে তোলে তাকে নাচিয়ে, সেই সীমায় বন্দী নাচন গানের মধ্যে পায় তার রূপ। যেখানে আমরা পরিচয় দিতে চাই আমাদের জানার, সেখানে পাই পাণ্ডিত্য, আর যার প্রাণ বলে আমি রস পাই, ব্যথা পাই, গান তারই জন্য। এখানে আমরা দেখতে পাই যে ভাষার সীমার মধ্য দিয়ে আমরা জগতের ছন্দ রূপটি উপলব্ধি কোরতে পারি না। সেই রূপটী রয়েছে ভাষার সীমার চেয়ে বহুদূরে, তাকে ইঙ্গিতে প্রকাশ করা যায় গানে।

শ্রীযুক্তা রাণীদেবীকে কবি লিখছেন,

"দূর আমার কাছেই এসেছে।
জানালার পাশেই বসে বসে ভাবি—
দূর ব'লে যে পদার্থ সে সুন্দর।
মনে ভাবি সুন্দরের মধ্যেই দূর।
পরিচয়ের সীমার মধ্যে থেকেও
সুন্দর যায় সব সীমাকে এড়িয়ে
প্রয়োজনের সঙ্গে লেগে থেকেও থাকে আলগা
প্রতিদিনের মাঝখানে থেকেও সে চিরদিনের।"

আর একটি কবিতায় তিনি বলছেন—

"ভালবাসায় সম্ভবের মধ্যে
নিয়তই অসম্ভব, জানার মধ্যে অজানা,
কথার মধ্যে রূপকথা।
ভুলেছি প্রিয়ার মধ্যে আছে সেই নারী,
যে থাকে সাত সমুদ্রের পারে,
সেই নারী আছে বুঝি মায়ার ঘুমে
যার জন্যে খুঁজতে হবে সোনার কাঠি।"

এই দূরের দিকের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে গুপ্ত হয়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব দৃষ্টির অনুভব। যে প্রবাহ চলেছে সমস্তের মধ্য দিয়ে, সমস্ত সীমার মধ্য দিয়ে সে রয়েছে সকল সীমাকে লঙ্ঘন করে; তাই প্রত্যেক সীমাবদ্ধ বোধ বা অনুভব সেই অসীমের দিকে তাকিয়ে আপনাকে সার্থক কোরতে চায়। কেবলই আমরা তাকিয়ে থাকি উৎসুক চোখে, আপনাকে দেখতে চাই আপনার বাহিরে, অভ্যস্ত পরিচয়ের পরপারে। যখন আমরা নগ্ন হোয়ে মগ্ন হোতে চাই সমস্তের মাঝে, তখনি আমরা অস্তিত্বের দিই পূর্ণ মূল্য। তাই কবি বলছেন—

"আমার এতকালের কাছের জগতে
আমি ভ্রমণ কোরতে বেরিয়েছি দূরের পথিক।
তার আধুনিকের ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে
দেখা দিয়েছে চিরকালের রহস্য।
সহমরণের বধূ বুঝি এমনি কোরেই দেখতে পায়
মৃত্যুর ছিন্নপর্দার ভিতর দিয়ে
নূতন চোখে
চিরজীবনের অম্লান স্বরূপ।"

এইটিই হোচ্ছে শেষ সপ্তকের একটি প্রধান সুর, একটা মহাস্রোত চলেছে কাল থেকে কালান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে, তারই মধ্যে বুদ্বুদের মত দেখা

দিয়েছে অস্তিত্বের দীপপুঞ্জ। যতক্ষণ আমরা সঙ্কীর্ণতার মধ্যে দেখি ততক্ষণ তার মূল্য বুঝতে পারি না, সঙ্কীর্ণতাকে উত্তীর্ণ হোয়ে দূর দূরান্তরের দৃষ্টিতে যখন তাকে আমরা দেখি তখন তার অর্থ হোয়ে আসে এই অনাদি প্রাণের মন্ত্র ভালোবাসার মন্ত্র। যুগযুগান্ত থেকে যেই প্রাণধারা নানাশাখায় ছুটে চলেছে সেটা এই প্রেমেরই ধারা।

কিন্তু শেষ সপ্তকে আমরা কেবল এই সুরটাই দেখতে পাই না। দেখতে পাই যে অনেক ছোট ছোট, খণ্ড খণ্ড ছবি এঁকে কবি সেই মুহূর্তের আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে কিম্বা তার দূর স্মৃতির মধ্যে তার যথার্থ মূল্য যাচাই কোরতে চেষ্টা কোরেছেন। বস্তুর সত্যতা তার বাহিরের অস্তিত্বে নয় তার যথার্থ সত্যতা হোচ্ছে আমাদের হৃদয়ের বেদনার মধ্যে, আমাদের অন্তরের সাক্ষ্যের মধ্যে। শুকতারা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

"কিন্তু এও সত্য তার চেয়েও সত্য
যেখানে তুমি আমাদেরই
আপন শুকতারা, সন্ধ্যাতারা,
যেখানে তুমি ছোট, তুমি সুন্দর,
যেখানে আমাদের
হেমন্তের শিশির বিন্দুর সঙ্গে তোমার তুলনা,
যেখানে শরতের শিউলি ফুলের উপমা তুমি।"

আর একটি কবিতায় তিনি বলছেন যে অনন্তকালের একটামাত্র দিন কেমন কোরে বাঁধা পড়ে গিয়েছে একটা ছন্দে, গানে ও ছবিতে। যুগের ভাসান খেলার স্রোতে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি, সে যেন ঠেকে গেছে একটা বাঁকের মুখে, এমনি কোরে আমরা দেখতে পাই যে কবি অনেক ছোট ছোট ছবি এঁকে গিয়েছেন, সেগুলিকে অতিক্রম কোরে তার কোন মূল্য দেওয়া যায় না। সেগুলির যেখানে আরম্ভ সেখানেই শেষ, তাই সমালোচনার তুলিতে তার সমন্বয়ের রেখা আঁকা যায় না। একটা কবিতায় বলছেন যে কোন তরুণীর সঙ্গে প্রথম বয়সে

হোল কবির দেখা। সে জিজ্ঞাসা কোরল যে তুমি কাকে খুঁজে বেড়াও। কবি তার জবাবে বললেন যে তিনি যেন বিশ্বকবির ছড়া থেকে ছিন্ন করা একটী পদ। তিনি খুঁজছেন অন্য পদটার সন্ধান যার সঙ্গে মিলিত হোলে তাঁর পদটী পাবে সার্থকতা। মেয়েটী আবার জিজ্ঞাসা কোরলে কেমন করে অসংখ্যের মধ্যে তোমার একটীকে খুঁজে পাবে? তার জবাবে কবি বললেন যে সেকথা তাঁর অন্তরের গোপন বেদনায় ধরা পড়বে। এই ছোট্ট একটী ছবি গাঁথা রয়েছে কবির বেদনায়। এমনি হয়ত কোন কবিতায় আভাস দিয়েছে হঠাৎ মনে পড়া একটা স্বপ্নের মত ভেসে আসা পূর্ব্ব জীবনের একটা কোমল সম্বন্ধ। আবার হয়ত বা কোথাও জমিয়ে তুলেছেন রোঘো ডাকাতের গল্প কিম্বা শিখ বালকের গল্প। আবার হয়ত কোনখানে যুগযুগান্তব্যাপী স্পন্দধারার মধ্যে ভাঙাগড়ার মধ্যে অনুভব কোরেছেন তাঁর হৃৎস্পন্দনের অসীমের শুদ্ধতা। হয়ত বা আকস্মিক চেতনার নিবিড়তায় চঞ্চল হয়ে কোন এমন কথা জানাতে চেয়েছেন যা দেহের অতীত। খাঁচার পাখীর কণ্ঠে যে বাণী ফুটে ওঠে তা যেমন শুধু খাঁচারই নয় তার মধ্যে গোপন হয়ে আছে অগোচরের অরণ্য-মর্ম্মর আর তার করুণ বিস্মৃতি। চোখের সামনে যে চক্রবাল রেখা দেখি তা যেমন ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয় কোন কল্পলোকের অদৃশ্য সঙ্কেত। মাটির তলায় যে বীজ থাকে সুপ্ত সে যেমন স্বপ্ন দেখে বাহিরের আকাশের আলোর এবং বাতাসের। আবার একটি কবিতায় কাজ ভোলা একটি দিনে তাঁর মন যেন চলেছে উধাও চলার মত, লীন হতে চেয়েছে নিঃসীম নীলিমায়, ঝাউ গাছের মর্ম্মর ধ্বনিতে মিশে মনের মধ্যে শুধু এই কথাটী বেজে উঠেছে "আমি আছি"। সংসারের যে দিকে তাকিয়েছেন সেইদিক থেকেই যেন বিশ্বমর্ম্মের নিত্যকালের সেই বাণী উঠেছে জাগ্রত হোয়ে—"আমি আছি।" আমের শাখায় মুকুলিত হোয়ে উঠেছে সেই বাণী—"আমি আছি।" প্রিয়ার মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি দিয়ে কবির গানের সুর দিয়ে জাগ্রত হোয়ে উঠেছে সেই বাণী "আমি আছি।" কোন কবিতায় হয়ত যক্ষের প্রেম বিরহের মধ্য দিয়ে কেমন কোরে ভাষা পেয়ে সার্থক হোয়েছে তারি এঁকেছেন ছবি।

আবার এক জায়গায় হয়ত মৃত্যুর বন্দনা গান গাইতে গিয়ে বলেছেন যে কবি তাঁর হৃৎস্পন্দনে, তাঁর রক্তের ছন্দের আনন্দপ্রবাহে শুন্‌তে পেয়েছেন মৃত্যুর বাণী "চল চল", মৃত্যু বলেছে "চল বোঝা ফেলতে ফেলতে", "চল মরতে মরতে নিমেষে নিমেষে"। চুপ কোরে দাঁড়ালেই দেখবে সব গেছে ম্লান হোয়ে। "থেমনা থেমনা, পিছন ফিরে তাকিয়ো না, পেরিয়ে যাও পুরোণো, জীর্ণকে, ক্লান্তকে, অচলকে"। মৃত্যুই নিয়ে গেছে জীবনের ধারাকে তার তীরের বাঁধন কাটিয়ে মহা সমুদ্রের দিকে। অনন্ত অচঞ্চল বর্ত্তমানের হাত থেকে মৃত্যুই সৃষ্টিকে দেয় পরিত্রাণ, অন্তহীন নব নব অনাগতে।

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে লিখিত একটি কবিতায় তিনি তাঁর সমস্ত জীবনের যুগ থেকে যুগান্তরের গতি ছায়া-চিত্রের ন্যায় চোখের সামনে ধরেছেন। এক জায়গায় তিনি বলেছেন—

"একতারা ফেলে দিয়ে
কখনো-বা নিতে হোলো ভেরী।
খর মধ্যাহ্নের তাপে
ছুটতে হোলো
জয় পরাজয়ের আবর্ত্তনের মধ্যে।
পায়ে বিঁধেছে কাঁটা,
ক্ষত বক্ষে পড়েছে রক্ত ধারা।
নির্ম্মম কঠোরতা মেরেছে ঢেউ
আমার নৌকার ডাইনে বাঁয়ে,
জীবনের পণ্য চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে
নিন্দার তলায়, পঙ্কের মধ্যে।
বিদ্বেষে অনুরাগে,
ঈর্ষ্যায় মৈত্রীতে,

সঙ্গীতে পরুষ কোলাহলে
আলোড়িত তপ্ত বাষ্প-নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে
আমার জগৎ গিয়েছে তা'র কক্ষপথে।
এই দুর্গমে, এই বিরোধ-সংক্ষোভের মধ্যে
পঁচিশে বৈশাখের প্রৌঢ় প্রহরে
তোমরা এসেছ আমার কাছে।

জেনেছ কি,
আমার প্রকাশে
অনেক আছে অসমাপ্ত
অনেক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন,
অনেক উপেক্ষিত ?
অন্তরে বাহিরে
সেই ভালো মন্দ,
স্পষ্ট অস্পষ্ট,
খ্যাত অখ্যাত,
ব্যর্থ চরিতার্থের জটিল সম্মিশ্রণের মধ্য থেকে
যে আমার মূর্ত্তি
তোমাদের শ্রদ্ধায়, তোমাদের ভালবাসায়,
তোমাদের ক্ষমায়
আজ প্রতিফলিত,
আজ যার সামনে এনেছ তোমাদের মালা,
তাকেই আমার পঁচিশে বৈশাখের
শেষবেলাকার পরিচয় বলে
নিলেম স্বীকার করে,

আর রেখে গেলাম তোমাদের জন্যে
আমার আশীর্ব্বাদ।"

এমনি কোরে নানাস্বরে একটী চিরন্তন সুরকে মূর্ত্তি দিয়েছেন কবি তাঁর শেষ সপ্তকে। শেষের কবিতাটীতে তিনি বলেছেন,—

"সৈন্যদলকে দেখে সেনাপতি,
দেখে না সৈনিককে ;—
দেখে আপন প্রয়োজন,
দেখে না সত্য,
দেখে না স্বতন্ত্র মানুষের
বিধাতাকৃত আশ্চর্য্যরূপ।
এতকাল তেমনি করে দেখেছি সৃষ্টিকে,
বন্দিদলের মত
প্রয়োজনের এক শিকলে বাঁধা,
তার সঙ্গে বাঁধা পড়েছি
সেই বন্ধনে নিজে।

আজ নেব মুক্তি।
সামনে দেখছি সমুদ্র পেরিয়ে
নূতন পার।
তাকে জড়াতে যাব না
এ পারের বোঝার সঙ্গে।
এ নৌকায় মাল নেব না কিছুই
যাব একলা
নতুন হোয়ে নতুনের কাছে।"

বীথিকা

ভাদ্র, ১৩৪২

পদের সঙ্গে পদ মিলে হয় বাক্য। বাক্যের সঙ্গে বাক্য মিলে হয় মহাবাক্য। পদমাত্রেরই সাধারণ একটা আভিধানিক অর্থ আছে। পদের সঙ্গে পদ মিলিয়ে যখন বাক্য হয় এবং বাক্যের সঙ্গে বাক্য মিলিয়ে যখন মহাবাক্য হয় তখন সেই আভিধানিক অর্থ একত্র হ'য়ে একটি অখণ্ড বাক্যার্থকে প্রকাশ করে। কবির শিল্পরচনার গুণে শব্দ ও অর্থ যখন তাদের সাধারণ আভিধানিক অর্থ বা তাৎপর্য্যকে অতিক্রম করে একটা নূতন রস আনন্দ বা আহ্লাদকে বিচ্ছুরিত করে তখনই তাকে বলা যায় সাহিত্য বা কাব্য। শব্দ যখন তাহার আভিধানিক অর্থকে অতিক্রম করে শব্দ সঞ্চয়ন ও শব্দ গ্রন্থনের আনুকূল্যে একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রসকে ব্যঞ্জিত বা ধ্বনিত করে তখনই তাকে কাব্য বলা যায়। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে নানা রসের মধ্য দিয়ে কবি কোন গভীর সত্যকে ধ্বনিত কোরে তোলেন। হয়ত বা রসের অভিব্যক্তির চেয়ে কবির বলবার কথাটি প্রধানভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই জাতীয় কাব্যকে বস্তুধ্বনিমূলক কাব্য বলে। যেখানে প্রধানতই রসধ্বনি হয় সেখানে সমালোচনার বড় অবসর থাকে না কারণ যে রসটিকে কবি ধ্বনিত করেন সেটিকে তাঁর বাক্যাবলী থেকেই পৃথক কোরে প্রকাশ করা যায় না। কবির শব্দ সঞ্চয়ন শব্দ গ্রন্থন ও অর্থের সঙ্গে শব্দের পারস্পরিক প্রতিস্পর্ধিতায় যে রসটি সমুন্নয়িত হয়ে ওঠে তা সমালোচকের বিশেষণের অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু যে সমস্ত কাব্যে বস্তুধ্বনি প্রধান হয়ে ওঠে সেইখানে সমালোচক তাঁর বিশ্লেষণের দ্বারা ও ব্যাখ্যার দ্বারা কবিব্যঞ্জিত তাৎপর্য্যকে সুস্পষ্ট কোরে তুলতে পারেন। সেইখানেই সমালোচক পান তাঁর সমালোচনার ক্ষেত্র।

বীথিকার অনেকগুলি কবিতা প্রধানতঃ রসধ্বনিমূলক সেখানে সমালোচনার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ।

অতীতের ছায়া কবিতাটিতে কবি ধ্যানে মহাতীতের স্পর্শ লাভ করবার চেষ্টা করেছেন। অতীতের শূন্যতা কবির চিত্তে তাঁর ধ্যান-লোকের মধ্যে অসংখ্য স্বপ্নের ভিতর দিয়ে প্রাচীন বস্তুহীন সৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ কোরতে চেষ্টা কোরেছেন। অতীত শান্ত, তার বর্ত্তিকা অন্ধকারের মধ্যে নির্ব্বাপিত, তবু সেই অতীতকে অবলম্বন কোরে স্মরণ ও বিস্মরণের নানা বর্ণের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় কত আখ্যায়িকা চিত্তপটে উদ্ভাসিত হোয়ে ওঠে। আমাদের জীবনের যে অংশ অতীত সেটি ছায়ার মতন ঘিরে রেখেছে আমাদের বর্ত্তমানকে। সেই অতীতের অনুভূতি থেকেই কবি করেন তাঁর সৃষ্টি। এই অতীতকে আমরা ব্যবহারে লাগাতে পারি না কিন্তু এই অতীতের স্মৃত ও বিস্মৃত উপাদানকে অবলম্বন করে আমরা আঁকতে পারি নানা রকমের ছবি। কাব্যের মধ্যে দিয়ে কবি পরিবেশন করেন রস। যতক্ষণ ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত সীমাকে অবলম্বন কোরে আমাদের সুখদুঃখ, ভয় ক্রোধ উৎপন্ন হয় ততক্ষণ তা একান্তই ব্যক্তিগত; ব্যক্তিগত বলেই তা সর্ব্বজনীন নয়। যা সর্ব্বজনীন নয় তা কাব্যের উপাদান হয় না সেইজন্য আমাদের বর্ত্তমানের সুখদুঃখ নিয়ে আমরা কাব্য লিখতে পারি নে। যে সমস্ত সুখদুঃখ, ভয় ক্রোধ হর্ষ বিষাদ এমন কোরে অতীত হোয়ে গেছে, যে তাদের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত আত্মীয়তা একান্ত বিচ্ছিন্ন হোয়ে গেছে, অতীতের গর্ভ থেকে সেই সমস্ত বর্ণের রেখা দিয়েই কবিকে আঁকতে হয় তার ছবি। সেখানে কবির কোন স্বার্থের বন্ধন নেই কাজেই সেখানে তার সৃষ্টি বন্ধহীন।

"ঘুচিল কর্ম্মের দায়,
ক্লান্ত হোলো লোকমুখে খ্যাতির আগ্রহ ;
দুঃখ যত সয়েছি দুঃসহ
তাপ তার করি অপগত
মূর্ত্তি তারে দিব নানামতো
আপনার মনে মনে।

কলকোলাহলে শান্ত জনশূন্য তোমার প্রাঙ্গণে
যেখানে মিটেছে দ্বন্দ্ব মন্দ ও ভালোয়,
তারার আলোয়
সেখানে তোমার পাশে আমার আসন পাতা,—
কর্ম্মহীন আমি সেথা বন্ধহীন সৃষ্টির বিধাতা।"

"মাটি" কবিতাটিতে কবি এই কথাই প্রধান ভাবে বলতে চেয়েছেন যে মাটির ওপরে কারো কোন চিরন্তনত্বের দাবী নেই। বর্ত্তমানে যাকে আমরা মাটি বলে জানি তারি অন্তরে শাল গাছ গিয়েছে তার শিকড় গেঁথে। কত যাত্রীর দল যুগযুগান্তরে গিয়েছে তার উপর দিয়ে। কত আর্য্য অনার্য্য, কত নামহীন জাতি তার ইতিহাসের ধারা বিলুপ্ত কোরে গিয়েছে এই মাটির উপর, কত ঋতুর পর্য্যায় কত রাত্রি আর দিন অন্তহীন ভাবে হোয়েছে আবর্ত্তিত। যেখানে আমরা বেড়া তুলি, যেখানকার তৃণকে করি উৎপাটিত, সেই তৃণই সেখানকার স্বাভাবিক অধিবাসী, অন্তহীন কাল ধোরে তারই জীবন হবে বারংবার সেখানে আবর্ত্তিত। আমার আমিত্বটুকু যাবে নিঃশব্দে বিলুপ্ত হোয়ে।

"দুজন" কবিতাটিতে কবিতার অপূর্ব্ব কাব্যশিল্পে এই কথাটি বলতে চেষ্টা করেছেন যে দুটি হৃদয়ের মধ্যে এক মুহূর্ত্তে যে মিলন যে ভালবাসার ছবিটি ফুটে ওঠে সেটি ক্ষণিক হোলেও যেন চিরন্তন। কালস্রোতে সে কোথায় হারিয়ে যায় তা'কে আমরা পাই না, তবু যেন মনে হয় জগতের সমস্ত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মধ্যে সেই মিলনক্ষণের অপূর্ব্ব ছটা ঝলমল কোরছে। তাই কোন মুহূর্ত্তের ক্ষণিক মিলনের মধ্যে আমরা সমস্ত অতীত মিলনোৎসবের স্পর্শটি গভীর ভাবে অনুভব কোরতে পারি।

"সে মুহূর্ত্ত উৎসের মতন,
একটি সঙ্কীর্ণ মহাক্ষণ
উচ্ছলিত দেয় ঢেলে আপনার সব কিছু দান!
সে-সম্পদ দেখা দেয় ল'য়ে নৃত্য, ল'য়ে গান,

ল'য়ে সূর্য্যালোকভরা হাসি,
ফেনিল কল্লোল রাশি রাশি।

সেথা আজ যাত্রী দুইজনে
শান্ত হোয়ে চেয়ে আছে সুদূর গগনে।
কিছুতে বুঝিতে নাহি পারে
কেন বারে বারে
দুই চক্ষু ভ'রে ওঠে জলে।
ভাবনার সুগভীর তলে
ভাবনার অতীত যে ভাষা
করিয়াছে বাসা,
অকথিত কোন্ কথা
কী বারতা
কাঁপাইছে বক্ষের পঞ্জরে।
বিশ্বের বৃহৎ বাণী লেখা আছে যে মায়া-অক্ষরে,
তার মধ্যে কতটুকু শ্লোকে
ওদের মিলন লিপি, চিহ্ন তার পড়েছে কি চোখে ?"

রাত্রির উপরে কবিতাটিতে কবি রাত্রির প্রসন্ন স্তব্ধতার স্পর্শ তার অপূর্ব্ব অনুভবে প্রকাশ কোরেছেন—

"তব প্রেমে
চিত্তে মোর যাক্ থেমে
অন্তহীন প্রয়াসের লক্ষ্যহীন চাঞ্চল্যের মোহ,
দুরাশার দুরন্ত বিদ্রোহ।

সপ্তর্ষির তপোবনে হোম-হুতাশন হোতে
আনো তব দীপ্ত শিখা, তাহারি আলোতে
নির্জ্জনের উৎসব-আলোক
পুণ্য হবে, সেই ক্ষণে আমাদের শুভদৃষ্টি হোক্।
অপ্রমত্ত মিলনের মন্ত্র সুগম্ভীর
মন্দ্রিত করুক আজি রজনীর তিমির মন্দির।"

"ধ্যান" কবিতাটিতে কবি দেখিয়েছেন যে ধ্যানের মধ্যে প্রেমের এমন একটি প্রকাশ হোতে পারে যাতে আমাদের সত্তার সমস্ত আন্দোলন একেবারে থেমে যায় এবং উভয়ের সত্তা একটি অখণ্ড সত্তায় পূর্ণ হোয়ে ওঠে—

"নাই সময়ের পদধ্বনি—
নিরস্ত মুহূর্ত্ত স্থির, দণ্ডপল কিছুই না গণি,
নাই আলো, নাই অন্ধকার—
আমি নাই, গ্রন্থি নাই তোমার আমার।
নাই সুখ দুঃখ ভয়, আকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত হোলো সব,
আকাশে নিস্তব্ধ এক শান্ত অনুভব,
তোমাতে সমস্ত লীন, তুমি আছ একা—
আমি-হীন চিত্তমাঝে একান্ত তোমারে শুধু দেখা"

আমাদের জীবনে প্রথম যখন আমরা প্রেমের পরিচয় পাই তখন সে আনন্দে আমরা বিভোর হই। তারপর জীবন যত চলে এগিয়ে নানা স্মৃতি বিস্মৃতির মধ্য দিয়ে প্রেমের আরও কত কত নূতন প্রকাশ আমাদের জীবনকে করে আন্দোলিত, কিন্তু সমস্ত প্রেমের মধ্য দিয়েই পুরুষের চিত্তে এমনি কোরেই অনাদি যুগের চির-মানবীর হিয়া আত্মপ্রকাশ করে।

"দেশের কালের অতীত যে মহাদূর,
তোমার কণ্ঠে শুনেছি তাহারি সুর—
বাক্য সেথায় নত হয় পরাভবে।

অসীমের দূতী, ভ'রে এনেছিলে ডালা
পরাতে আমারে নন্দন ফুলমালা
অপূর্ব্ব গৌরবে।"

সত্যরূপ কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ এই কথাটিই বলতে চেয়েছেন যে চারিদিকের নানা চঞ্চলতার মধ্যে প্রত্যহের জানাশোনার মধ্যে আমাদের সত্যরূপকে আমরা দেখতে পাইনা, কোন মূহূর্ত্তের বিশেষ অনুভবে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদেরই সত্তার মধ্যে বিশ্বের সৃষ্টিশক্তি তার আপন সীমা রচনা কোরেছে এবং এই সীমা রচনার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে একটা অনির্ব্বচনীয় অন্তহীন প্রেম।

কবি তাঁর ছন্দে, ভাবে নারীকে তার দেহাতীত সৌন্দর্য্যে ইন্দ্রধনুর নানারঙে আঁকতে চেষ্টা করেন। কামনাকে অবলম্বন কোরে যে কল্পনা আরম্ভ হয়, তার কামনাকে অতিক্রম করে এবং কবি তার ধ্যান প্রতিমাকে তাঁর স্বপ্ন রেখায় এমন করে আঁকেন যে তা বাস্তব নারীকে অতিক্রম কোরে অনেক দূরে চলে যায়। এমনি কোরে কবির অমরবাণীর রসধারায় নারী হোয়ে ওঠে অমৃত। কবির এই কল্পনাকে যখন তিনি এমনি কোরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন তখন সেই নারীর মহিমা অপূর্ব্ব সম্পদে মহীয়সী হোয়ে কবিকে অপূর্ব্ব আকর্ষণে আকৃষ্ট করে, কবির যে দানে কবি নারীকে মহীয়সী কোরে তোলেন নারী তার সেই কাল্পনিক মহত্ত্বে কবির সম্মুখে নিজেকে মহিমাময়ী কোরে কবিকে আনন্দে পূর্ণ করে। যে দান কবি দিয়েছিলেন নারীকে তাঁর কল্পনার মধ্য দিয়ে সেই সম্পদে নারী মহীয়সী হোয়ে তার আপন আকর্ষণের মহত্ত্বে কবিকে করেন পুরস্কৃত।

"যে দান পেয়েছে তার বেশি দান
ফিরে দিলে সে কবিরে।
গোপনে জাগালে সুরের বেদনা
বাজে বীণা যে গভীরে।

প্রিয়-হাত হতে পরো পুষ্পের হার,
দয়িতের গলে করো তুমি আরবার
দানের মাল্যদান।
নিজেরে স'পিলে প্রিয়ের মূল্যে
করিয়া মূল্যবান ॥"

আদিতম কবিতাটিতে আমরা রবীন্দ্রনাথের চিরপরিচিত সুরটি আবার নূতন করে শুনতে পাই। প্রাণের যে প্রথমতম কম্পন বনস্পতির মজ্জায় মজ্জায় তুলছে শিহরণ তাই জেগে ওঠে আমাদের শিরা তন্ত্রীতে এবং আমরা আমাদের সুগভীর চেতনার মধ্যে তার স্পর্শ পাই।

"ঐ তরু ঐ লতা ওরা সবে
মুখরিত কুসুমে ও পল্লবে—
সেই মহাবাণীময় গহন মৌনতলে
নির্ব্বাক স্থলে জলে
শুনি মূক গুঞ্জন অগোচর চেতনার।
ধরণীর ধূলি হোতে তারার সীমার কাছে
কথা হারা যে ভুবন ব্যাপিয়াছে
তার মাঝে নিই স্থান
চেয়ে থাকা দুই চোখে বাজে ধ্বনিহীন গান।"

কবিকে আমরা জানিনা তথাপি তাঁর বাণী আমাদের মনে নানারকমের নূতন ছবি এঁকে দেয়, বিষাদ করুণ কোরে কবি বর্ণনা করেন বাদলার দিনকে, তাই—

"বাদলছায়া হায়গো মরি
বেদনা দিয়ে তুলেছ ভ'রি
নয়ন মম করিছে ছলো-ছলো,
হিয়ার মাঝে কি কথা তুমি বল।"

এমনি কোরে কবির হৃদয়ের নানা কল্পনা, নানা বেদনা তাঁর পাঠকদের চিত্তে স্বপ্নের মতন ক'রে নূতন নূতন অনুভবকে ঘনিয়ে আনে, এই কথাটি পাঠিকা কবিতায় অতি সুন্দরভাবে স্পষ্ট হোয়েছে।

প্রাত্যহিক জীবনে নানা অনুভূতি নানা স্পর্শ যে মনের মধ্যে ঢেউ খেলিয়ে যায় তাদের উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যে যে একটা নিরুদ্দিষ্ট সৌন্দর্য্য আছে একটা মাধুর্য্য আছে সেটি কবি তাঁর "ছুটির লেখা" কবিতায় সুন্দর কোরে এঁকে দিতে চেষ্টা করেছেন—

"সবুজ সোনা নীলের মায়া ঘিরল তাকে,
শুকনো ঘাসের গন্ধ আসে জানলা ঘুরে,
পাতার শব্দে, জলের শব্দে, পাখীর ডাকে
প্রহরটি তার আঁকা-জোকা নানান সুরে
সব নিয়ে যে দেখল তারে পায় সে দেখা,
বিশ্বমাঝে ধূলার প'রে অলজ্জিত,
নইলে সে তো মেঠো পথে নীরব একা
শিথিল বেশে অনাদরে অসজ্জিত।"

আবার আমাদের জীবনের রঙ্গমঞ্চে যে সমস্ত ঘটনাবলী ছায়া-নাট্যের ন্যায় তাদের রং ফেলে যায় তারা কোন অজ্ঞাত থেকে বর্ত্তমানের মধ্য দিয়ে কোন অতীতের দিকে ভেসে যায়। তাদের স্মৃতিটুকু আমরা শুধু ধরে রাখতে পারি আমাদের কাব্যে, আমাদের চিত্রে। চৈত্র শেষে অরণ্যের মাধবীর সুগন্ধের মত কত সুখ কত আনন্দ এমনি কোরে আমাদের হৃদয়কে করেছিল মুগ্ধ, সেদিন এ পৃথিবীতে তাই ছিল সব চেয়ে সত্যি। তার অনুভবের আনন্দ ও বিষাদের সুরে সমস্ত বিশ্বের যত যন্ত্রণা বাঁধা—

"সেই সুখ দুঃখ তার
জোনাকির খেলা মাত্র, যারা সীমাহীন অন্ধকার

পূর্ণ করে চুমকির কাজে, বিঁধে আলোকের সূচি ;
সে-রাত্রি অক্ষত থাকে, বিনা চিহ্নে আলো যায় ঘুচি
সে ভাঙা যুগের পরে কবিতার অরণ্যলতায়
ফুটিছে ছন্দের ফুল, দোলে তারা গানের কথায়।
সেদিন আজিকে ছবি হৃদয়ের অজন্তা গুহাতে
অন্ধকার ভিত্তিপটে, ঐক্য তার বিশ্ব-শিল্প সাথে ॥"

শ্যামলা কবিতাটিতে কবি এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে আমরা যখন নিঃস্তব্ধ প্রকৃতির দিকে তাকাই তখন তার মধ্য থেকে নানা সুরের নানা ভাব যেন ক্রমশঃ উদ্বুদ্ধ হোয়ে ওঠে, কোন অগীত সঙ্গীত যেন হিমালয়ের তপস্যাকে, নির্ঝরের বাণীহীন ধ্যানকে পুরাতন কত বিরহ স্মৃতিকে, পূর্ণ কোরে নিয়ে আসে প্রকৃতি তাঁর পর্ণপুটে—

"অতল গাম্ভীর্য নিয়ে তোমার মাঝারে হেরি যেন।
শ্রাবণে অপরাজিতা, চেয়ে দেখি তারে
আঁখি ডুবে যায় একেবারে—
ছোট পত্রপুটে তার নীলিমা করেছে ভরপুর,
দিগন্তের শৈলতটে অরণ্যের সুর
বাজে তাহে, সেই দূর আকাশের বাণী
এনেছে আমার চিত্তে তোমার নির্ব্বাক মুখখানি ॥"

প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তিপুঞ্জ মৌন হয়ে রয়েছে হৃদয়ের গভীর পরিপূর্ণতায় আমরা তার আভাস পেতে পারি। নির্লিপ্ত বাক্যহীন অদূরতার বিশাল আকাশ যেন নিরন্তর আমাদের আকৃষ্ট করে। এই না-কওয়া, না-চাওয়ার সাধনাতেই আমাদের শান্তির সার্থকতা।

আর একটি কবিতায় কবি তাঁর মনের আশা ও উদ্যমকে ওজস্বীভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে বীর্য্যের ঘোষণা করেছেন। বলেছেন যে, যে দুর্লভকে পাওয়া যাবে

না তার জন্য ব্যর্থ দুরাশায় তিনি নিজেকে প্রলুব্ধ কোরবেন না। ভিক্ষুকের মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত কোরবেন।

"জানিব মানিব নিঃসংশয়
দুর্লভেরে মিলিবে না ; কবির কঠোর বীর্য্যে জয়
ব্যর্থ দুরাশারে মোর। চির জন্ম দিব অভিশাপ
দয়ারিক্ত দুর্গমেরে। আশাহারা বিচ্ছেদের তাপ
দুঃসহ দাহনে তার দীপ্ত করি' হানিব বিদ্রোহ
অকিঞ্চন অদৃষ্টেরে, পুষিব না ভিক্ষুকের মোহ।"

বুদ্ধিতে যাহা আমরা বুঝিনা, প্রত্যক্ষে যাহা পাইনা, তাহারই স্পর্শ আমরা কাব্যে পাই। চৈতন্যকে বা চেতনাকে বাধাহীন, বন্ধহীন কোরে সমস্ত প্রাণের রহস্যলোক বিদ্যুতের ছায়ায় নানারূপের খেলার মধ্যে ঝলমল করে উঠে সেই প্রাণলোকের মানসী আকৃতিটি এঁকে দেয়—

"পাশ দেয় মুক্ত করি, বাধাহীন চৈতন্য এ মম
নিঃশব্দে প্রবেশ করে নিখিলের সে অন্তরতম
প্রাণের রহস্যলোকে, যেখানে বিদ্যুৎ সূক্ষ্মছায়া
করিছে রূপের খেলা, পরিতেছে ক্ষণিকের কায়া,
আবার ত্যজিয়া দেহ ধরিতেছে মানসী আকৃতি,
সেই তো কবির কাব্য সেই তো তোমার কণ্ঠে গীতি॥"

প্রকৃতির প্রতি গভীর ভালবাসা প্রকাশ কোরতে গিয়ে কবি বলছেন,—

"বেসেছি ভালো এই ধরারে
মুগ্ধ চোখে দেখেছি তারে
ফুলের দিনে দিয়েছি রচি' গান।

সে গানে মোর জড়ানো প্রীতি
সে গানে মোর রহুক স্মৃতি
আর যা আছে হউক অবসান
রোদের বেলা ছায়ার বেলা
করেছি সুখদুখের খেলা
সে খেলাঘর মিলাবে মায়াসম ;
অনেক তৃষা অনেক ক্ষুধা
তাহারি মাঝে খেয়েছি সুধা,
উদয়গিরি প্রণাম লহ তুমি।"

প্রকৃতির দানের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি বলছেন যে প্রকৃতি আপনার মধ্যে আত্মবিকাশ লাভ কোরছে তার ঐশ্বর্য সম্ভারে যে সে পূর্ণ হোয়ে উঠছে সেইটিই তার ধন সেইটিই তার গান—

"তোমার সামীপ্য, সেই
নিত্য চারিদিকে আকাশেই
প্রকাশিত আত্মমহিমায়
প্রশান্ত প্রভায়।
তুমি আছ কাছে
সে আত্মবিস্মিত কৃপা—চিত্ত তাহে পরিতৃপ্ত আছে
ঐশ্বর্য্য রহস্যে যাহা তোমাতে বিরাজে
একই কালে ধন সেই, দান সেই, ভেদ নেই মাঝে।"

আর একটি কবিতায় তিনি বলছেন যে, প্রকৃতির দান আমরা যতই সঞ্চয় কোরতে চাই ততই দেখি যে তা সঞ্চয় কোরে রাখার ধন নয়,—

"যত মনে ভাবি, রাখি তারে সঞ্চিয়া,
ছিঁড়িয়া কাড়িয়া লয় মোরে বঞ্চিয়া,
প্রলয় প্রবাহে ঝরে পড়া যত পাতা।

বিস্ময় লাগে আশাতীত সেই দানে,
ক্ষীণ সৌরভে ক্ষণ-গৌরব আনে।
বরণমাল্য হয় না তাহাতে গাঁথা।"

এই ভাবটিই আরও স্পষ্ট কোরে কবি বলেছেন তাঁর ক্ষণিক কবিতাটিতে। প্রকৃতির ধারা চলেছে অজস্রভাবে স্রোতের প্রবাহে। আমরা কেবলমাত্র তার থেকে দু-এক অঞ্জলি গ্রহণ কোরতে পারি—

"বিস্মৃতি-পটে চিরবিচিত্র ছবি
লিখিয়া চলেছে ছায়া-আলোকের কবি।
হাসি-কান্নার নিত্য ভাসান-খেলা
বহিয়া চলেছে বিধাতার অবহেলা।
নহে সে কৃপণ, রাখিতে যতন নাই,
খেলাপথে তার বিঘ্ন জমে না তাই।
মানো সেই লীলা, যাহা যায় যাহা আসে
পথ ছাড়ো তা'রে অকাতরে অনায়াসে,
আছে তবু নাই, তাই নাহি তা'র ভার,
ছেড়ে যেতে হবে, তাই তো মূল্য তার।
স্বর্গ হইতে যে সুধা নিত্য ঝরে
সে শুধু পথের, নহে সে ঘরের তরে।
তুমি ভরি লবে ক্ষণিকের অঞ্জলি,
স্রোতের প্রবাহ চিরদিন যাবে চলি॥"

রূপকার কবিতাটীতে কবি বলছেন যে আমাদের অন্তরের মধ্যের অন্তর্য্যামী শিল্পী নানা দুঃখ ও দাবদাহনের মধ্য দিয়ে আমাদের যে অন্তরের স্বরূপটি গড়ে তুলছেন তার পরিচয় কেহই জানে না, সে গড়ার কাজ চলে তার আপন প্রয়োজনে, আপন মহিমায়, তার কোন বাইরের উদ্দেশ্য নেই। সেই রূপকারের সৃষ্ট আমাদের অন্তরের রূপ বাহিরের জগতে আপনার প্রতিচ্ছবি দেখে থাকে—

"হায় গো রূপকার,
ভরিয়া দিয়ো জীবন-উপহার ;
চুকিয়া দিয়ো তোমার দেয়,
রিক্ত হাতে চলিয়া যেয়ো,
কোরো না দাবী ফলের অধিকার।
জানিয়ো মনে চিরজীবন সহায়হীন কাজে
একটি সাথী আছেন হিয়া মাঝে,
তাপস তিনি, তিনিও সদা একা,
তাঁহার কাজ ধ্যানের রূপ বাহিরে মেলে' দেখা ॥"

"প্রাণের ডাক" কবিতাটিতে কবি কালপ্রবাহী প্রাণের সর্ব্বব্যাপী ছন্দের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে এই প্রাণপ্রবাহের মধ্যে আমাদের অস্তিত্বের আনন্দ ও ব্যথা নিরন্তর ফেনায় ফেনায় ফেনিয়ে উঠছে। ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায় যেন কি মদিরা মাতাল কোরে তুলেছে ধরণীকে। এই প্রবাহের মধ্যে আমাদের ছেড়ে দিলেই আমাদের যথার্থ সার্থকতা আমরা লাভ কোরতে পারি—

"নিভৃতে পৃথক কোরো নাকো
তুমি আপনারে,
ভাবনার বেড়া বেঁধে রাখো
কেন চারি ধারে ?
প্রাণের উল্লাস অহেতুক
রক্তে তব হোক না উৎসুক,
খুলে রাখো অনিমেষ চোখ ;
ফেলো জাল চারিদিক ঘিরে'
যাহা পাও ঠেলে লও তীরে,
ঝিনুক শামুক যা-ই হোক্।"

বিরোধ কবিতাটিতে কবি বলছেন যে মন্দ ও ভালোর দ্বন্দ্ব সংসারে চিরকালই রয়েছে এবং সেই দ্বন্দ্ব আছে বলেই শ্রেষ্ঠের জয়ভেরী বেজে উঠতে পারে। এ জীবনে যাকিছু দুর্মূল্য যা অমর্ত্ত তা আমরা মৃত্যুর মূল্যেই ক্রয় কোরতে পারি এই জন্যে একথা বলা যায় যে পৃথিবীর অপরাধ সম্বন্ধে যখন আমরা উচ্চ কণ্ঠে আমাদের ক্রোধ জ্ঞাপন করি তখন আমাদের অহঙ্কারকেই আমরা বাড়িয়ে তুলি—

"এ সংসারে আছে বহু অপরাধ,
হেন অপবাদ
যখন ঘোষণা করো উচ্চ হতে উষ্ণ উচ্চারণে
ভাবি মনে মনে
ক্রোধের উত্তাপ তার
তোমার আপন অহঙ্কার।
মন্দ ও ভালোর দ্বন্দ্ব, কে না জানে চিরকাল আছে
সৃষ্টির মর্ম্মের কাছে।
না যদি সে রহে বিশ্ব ঘেরি'
নিরুদ্ধ নির্ঘাতবেগে বাজে না শ্রেষ্ঠের জয়ভেরী।

বিধাতার 'পরে মিথ্যা আনিয়ো না অভিযোগ
মৃত্যুদুঃখ করো যবে ভোগ
মনে জেনো, মৃত্যুর মূল্যেই করি ক্রয়
এ জীবনে দুর্ম্মূল্য যা অমর্ত্ত্য যা, যাকিছু অক্ষয়।"

নব পরিচয় কবিতাটিতে কবি বলছেন যে আমাদের নিজের পরিচয় আমরা জানি না। প্রকৃতির নব নবরূপে যে আনন্দদীপগুলি জ্বলে ওঠে তারি মহিমায় আমাদের নব পরিচয় আমরা লাভ করি এবং বুঝতে পারি যে আমাদের সমস্ত জানা শোনা, সমস্ত অতীত অনাগতকে অতিক্রম কোরে আমাদের মধ্যে রয়েছে

একটি মরণ জয়ী পথিক। সংসারের সমস্ত আলোড়ন বিলোড়নে তিনি সর্ব্বদা থাকেন অনাসক্ত—

"এ সংসারে সব সীমা
ছাড়ায়ে গেছে যে মহিমা
ব্যাপিয়া আছে অতীতে অনাগতে,
মরণ করি' অভিনব
আছেন চির যে-মানব
নিজেরে দেখি সে-পথিকের পথে।
সংসারের ঢেউ খেলা
সহজে করি অবহেলা
রাজহংস চলেছে যেন ভেসে—
সিক্ত নাহি করে তারে
মুক্ত রাখে পাখাটারে—
ঊর্দ্ধশিরে পড়েছে আলো এসে।"

মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই নিত্য নব নব রূপ গড়ে পঠে। এই কথাটিই "মরণ মাতা" কবিতাটির বিষয়—

"তাহাই লয়ে' মন্ত্র পড়ি'
নূতন যুগ তোলে গড়ি'
নূতন ভালো মন্দ কত, নূতন উঁচুনিচু।
রোধিয়া পথ আমি না রব থামি'
প্রাণের স্রোত অবাধে চলে তোমারই অনুগামী।
নিখিল-ধারা সে স্রোত বাহি
ভাঙিয়া সীমা চলিতে চাহি
অচল রূপে র'ব না বাঁধা অবিচলিত আমি।

সহজে আমি মানিব অবসান,
ভাবী শিশুর জনম মাঝে নিজেরে দিব দান।"

অনেকগুলি ছোট ছোট কবিতায় কবি ছোট ছোট কতগুলি impression বা ভাব অতি সুন্দরভাবে এঁকেছেন। "অন্তরতম" কবিতাটিতে তিনি এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে অতি সামান্য বিষয় অবলম্বন কোরে আমাদের মনে যে আকাঙ্ক্ষা জন্মে তারও একটা গভীর স্থান আছে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে, অথচ সে আকাঙ্ক্ষাকে কাব্যের স্বপ্নছাড়া অন্যভাবে ব্যক্ত করা যায় না—

"যে পাওয়া শুধু রক্তে নাচে, স্বপ্নে যাহা গাঁথা,
ছন্দে যার হোল আসন পাতা
খ্যাতি-স্মৃতির পাষাণপটে রাখে না যাহা রেখা
ফাল্গুনের সাঁজতারায় কাহিনী যার লেখা,
সে ভাষা মোর বাঁশিই শুধু জানে,—
এই যা দান গিয়েছে মিশে গভীরতর প্রাণে,
করিনি তার আশা,
যাহার লাগি বাঁধিনি কোন বাসা,
বাহিরে যার নাইকো ভার যায়না দেখা যারে
বেদনা তারি ব্যাপিয়া মোর নিখিল আপনারে।"

বনস্পতি সম্বন্ধে যে দুটি কবিতা বীথিকায় পাওয়া যায় তা বনবাণীরই প্রতিধ্বনি। সন্ন্যাসী কবিতাটিতে নানা বিক্ষোভের মধ্যে নানা চঞ্চলতার মধ্যে প্রকৃতির যে একটা অনাসক্ত রূপ আছে, সেইটিকে কবি আমাদের চোখের সামনে ধরতে চেষ্টা করেছেন—

"এদের প্রশ্রয় দিলে, তাই যত দুর্দ্দামের দল
চরাচর ঘেরি' ঘেরি করিছে উন্মত্ত কোলাহল
সমুদ্রতরঙ্গ তালে, অরণ্যের দোলে,
যৌবনের উদ্বেল কল্লোলে।

আনে চাঞ্চল্যের অর্ঘ্য নিরন্তর তব শান্তি নাশি'

এই তো তোমার পূজা, জানো তাহা হে ধীর সন্ন্যাসী ॥"

হরিণী কবিতাটিতে অজ্ঞাত ও অদৃশ্যের জন্য যে আমাদের চিত্তে একটি অন্বেষণের ক্ষুধা সদা জাগ্রত আছে তারি একটি সুন্দর ছবি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। "বাধা" কবিতাটিতে কবি এই কথাই বলেছেন যে আমরা আমাদের প্রিয়জনকে কি শ্রীভগবানকে আমাদের সম্পূর্ণ সত্তা নিবেদন করতে চাইলেও আমাদের অন্তরের বাধায় আমরা আমাদের মুক্ত করে দিতে পারি না।

"লও, লও, যত বলে, খোলে না যে তাঁ'র
হৃদয়ের দ্বার।
সারাদিন মন্দিরা বাজায়ে করে গান,—
লও, তুমি লও, ভগবান।"

আমাদের চিত্তের মধ্যে একটা দোটানা সুর আছে। একটা টানে বাহিরের দিকে মুক্তির দিকে, আর একটা টানে ঘরের দিকে বাঁধনের দিকে। যতদূরে যেতে চাই বাঁধনেরই ডাক শুনি, যত সম্মুখে যেতে চাই ততই কে যেন পিছনে টানে—

"বাঁধনে বাঁধনে টানি' রচিলে আসন খানি
দেখিনু তোমার আপন সৃষ্টি তাই।
শূন্যতা ছাড়ি' সুন্দরে তব আমার মুক্তি চাই।"

"কলুষিত" কবিতাটিতে কবি দেখিয়েছেন যে, নগরী তার কঠিন পাষাণের আবরণের মধ্যে থেকে প্রকৃতির আশীর্ব্বাদ পায় না এবং মলিন অশুচিতায় আপনাকে খিন্ন করে। অপরদিকে নগরের মধ্যে আমরা দেখতে পাই দ্বেষ, ঈর্ষা ও কুৎসার কালুষ্য—

"দ্বেষ ঈর্ষা কুৎসার কলুষে
আলোহীন অন্তরের গুহাতলে হেথা রাখে পুষে'
ইতরের অহঙ্কার;
গোপন দংশন তার।

অশ্লীল তাহার ক্লিন্ন ভাষা
সৌজন্য-সংযম-নাশা।
দুর্গন্ধ পঙ্কে দিয়ে দাগা
মুখোশের অন্তরালে করে শ্লাঘা;
সুড়ঙ্গ খনন করে,
ব্যাপি' দেয় নিন্দা ক্ষতি প্রতিবেশীদের ঘরে;
এই নিয়ে হাটে বাটে বাঁকা কটাক্ষের
ব্যঙ্গ ভঙ্গী, চতুর বাক্যের
কুটিল উল্লাস,
ক্রূর পরিহাস।"

এমনি কোরে অনেকগুলি ছোট ছোট কবিতার মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবের কণাকে কল্পনার জ্যোতিতে, ছন্দের নৃত্যে চঞ্চল কোরে কবি যে সৌন্দর্য্য বীথিকা রচনা কোরেছেন কোন সমালোচনায় তার আস্বাদ দেওয়া যায় না। তা কেবলমাত্র আস্বাদের দ্বারাই উপভোগ্য, তাই ব্যর্থ সমালোচনার মিথ্যা প্রয়াস আর করা উচিত নয়।

পত্রপুট

২৫এ বৈশাখ, ১৩৪৩

এই গ্রন্থখানি প্রধানতঃ গদ্যছন্দে লেখা। কোন নির্দ্দিষ্ট ভাব নিয়ে লেখা নয়, নানা রঙের বিচিত্র অঙ্কন এতে স্থান পেয়েছে। পুরোণো সুরের অনেক গান এতে ধ্বনিত হোয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাতেই এই ভাবটিকে তিনি রূপ দিয়েছেন যে কোন একটি বিশেষ মুহূর্ত্তের একটি অনুভব এমন পূর্ণ হোয়ে উঠতে পারে যে তা যেন সমস্ত জীবনকে ধন্য কোরে দেয়। একদিন তিনি হিমালয়ে ভ্রমণ কোরছিলেন, দেখতে পেলেন সামনে পূর্ণচন্দ্র যেন বন্ধুর অকস্মাৎ হাস্যধ্বনি; যেন সুর-লোকের সভাকবির সদ্যোবিরচিত কাব্য-

প্রহেলিকা রহস্যে রসময়। সেই সুরে তাঁর মনে এমন একটা মিল হোল যা আর কোন দিন হয়নি—

"সে দিন বেজে উঠল যে রাগিণী
সে দিনের সঙ্গেই সে মগ্ন হোল
অসীম নীরবে,
গুণী বুঝি বীণা ফেললেন ভেঙে।
অপূর্ব্ব সুর যেদিন বেজেছিল
ঠিক সেই দিন আমি ছিলাম জগতে
বলতে পেরেছিলাম
আশ্চর্য্য।"

পত্রপুটের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ কবিতাটি হচ্ছে তার তৃতীয় কবিতা, "আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী," প্রকৃতির মধ্যে যে একটি বিরোধ আছে, দ্বন্দ্ব আছে তাই নিয়ে কবিতার আরম্ভ

"বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে,

* * * *

শ্রেয়কে করো দুর্ম্মূল্য,
কৃপা করোনা কৃপামাত্রকে।
তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছে প্রতি মুহূর্ত্তের সংগ্রাম,
ফলে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক।

* * * * *

তোমার নির্দ্দয়তার ভিত্তিতে উঠেছে সভ্যতার জয় তোরণ,
ত্রুটি ঘটলে তার পূর্ণমূল্য শোধ হয় বিনাশে।
তোমার ইতিহাসের আদি পর্ব্বে দানবের প্রতাপ ছিল দুর্জ্জয়,
সে পরুষ, সে বর্ব্বর, সে মূঢ়।

তারপর কবি নেমে এলেন দ্বিতীয় যুগে। তখন জড়ের ঔদ্ধত্য হোয়ে এল অভিভূত; জীব ধাত্রী বসলেন শ্যামল আস্তরণ পেতে; কিন্তু তবু সেই আদিম বর্ব্বর রইল পৃথিবীকে আঁকড়ে। তার তাড়নায় পৃথিবী আপন জীবনকে কোরছে আঘাত, ছারখার কোরছে আপন সৃষ্টিকে; শুভ-অশুভের চললো সংগ্রাম; বিরাট প্রাণের সঙ্গে এল বিরাট মৃত্যু। একদিকে পৃথিবী সুন্দরী অপর দিকে তিনি ভয়ঙ্করা—

"অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরি শৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যানমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।
একদিকে অপক্ক ধানভার নম্র তোমার শস্য ক্ষেত্র,
সেখানে প্রসন্ন প্রভাত সূর্য্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
কিরণ উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে।
অস্তগামী সূর্য্য শ্যামশস্যহিল্লোলে রেখে যায় অকথিত এই বাণী—
'আমি আনন্দিত।'
অন্যদিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্ক পাণ্ডুর মরু ক্ষেত্রে
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।
বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেন পাখির মতো তোমার ঝড়,
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠলো যেন কেশর-ফোলা সিংহ।"

আবার ফাল্গুনে আতপ্ত দক্ষিণ বায়ুতে আম্র মুকুলের গন্ধে তিনি দেখেছেন প্রকৃতির কোমল রূপ। তাই তিনি পৃথিবীকে বলছেন—

"স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী, তুমি নিত্য নবীনা,
অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞ হুতাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে
সংখ্যা গণনার অতীত প্রত্যূষে,

তোমার চক্রতীর্থের পথে পথে ছড়িয়ে এসেছ
শত শত ভাঙা ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ
বিনা বেদনায় বিছিয়ে এসেছ তোমার বর্জ্জিত সৃষ্টি
অগণ্য বিস্মৃতির স্তরে স্তরে।"

চতুর্থ কবিতাটিতে কবি আষাঢ় মাস থেকে আরম্ভ কোরে কয়েকটি ঋতুর পদচিহ্ন এঁকে গিয়েছেন। সমস্ত ঋতুর মধ্যে নূতন নূতন সুন্দরের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে যে একটি অবিচ্ছিন্ন গতি চলেছে সেইটিই এই কবিতাটিতে বিশেষ কোরে ধ্বনিত হোয়েছে। পঞ্চম কবিতাটিতে কতকগুলি প্রাত্যহিক দৃশ্যের সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকে গিয়েছেন। সমস্ত ক্ষুদ্র খণ্ডের মধ্য দিয়ে যে একটা লোকাতীতের স্পর্শ পাওয়া যায় সেকথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

সংসারের নানা পরিচয়ের মধ্য দিয়ে আমরা নিরন্তর যাতায়াত করি তথাপি আমাদের নিজেদের আমরা চিনতে পারি না, পর্দ্দায় ঢাকা থাকে আমাদের আমি আমাদের কাছ থেকে—

"আপনাকে চেনার সময় পায়নি সে,
ঢাকা ছিল মোটা মাটির পর্দ্দায়;
পর্দ্দা খুলে দেখিয়ে দাও যে, সে আলো, সে আনন্দ,
তোমারি সঙ্গে তার রূপের মিল,
তোমার যজ্ঞের হোমাগ্নিতে
তার জীবনের সুখ দুঃখ আহুতি দাও,
জ্ব'লে উঠুক তেজের শিখায়,
ছাই হোক যা ছাই হবার।"

সপ্তম কবিতাতে কবি এই কথাই প্রকাশ কোরতে চেয়েছেন যে প্রকৃতির বাহিরের রূপ যেমন নানা দিকে বিস্তৃত ও বিচিত্র আমাদের অন্তরের প্রকাশের দিকও তেমনি ভাবে বিচিত্রিত। বাহিরের শোভাকে যখন আমরা অন্তরে গ্রহণ

করি তখন আমাদের চেতনার মধ্যে যে সমস্ত ছবি ফুটে ওঠে তা বিশ্বছবিরই অন্তর্গত, চেতনার মধ্যে আমরা বাহিরের যে রূপ গ্রহণ করি চেতনার বিচিত্রতার মধ্যে আমরা সেই রূপ আবার দিই বিশ্বকে ফিরিয়ে। এমনি ভিতর ও বাহিরের দুই দিকের ছবি নিয়েই বিশ্বের ছবি—

"গ্রহণ করাও ফিরিয়ে দেওয়ার রূপান্তর,
সৃষ্টির ঝরণা বেয়ে যে রস নামছে
আকাশে আকাশে
তাকে মেনে নিয়েছি আমার দেহে মনে।

সেই রঙিন ধারায় আমার জীবনে রং লেগেছে
যেমন লেগেছে ধানের ক্ষেতে,
যেমন লেগেছে বনের পাতায়,
যেমন লেগেছে শরতে বিবাগী মেঘের উত্তরীয়ে,
এরা সবাই মিলে পূর্ণ করেছে আজকে দিনের বিশ্বছবি।

যে গভীর অনুভূতিতে নিবিড় হোলো চিত্ত
সমস্ত সৃষ্টির অন্তরে তাকে দিয়েছি বিস্তীর্ণ ক'রে।
ঐ চাঁদ ঐ তারা ঐ তমঃপুঞ্জী গাছগুলি
এক হোলো, বিরাট হোলো, সম্পূর্ণ হোলো
আমার চেতনায়।"

অষ্টম কবিতাটিতে কবি বলছেন যে প্রতি নিমেষে পৃথিবীর বৃহৎ ইতিহাস যে ক্রমশঃ চলেছে উদ্‌ঘাটিত হোয়ে তার এক পৃষ্ঠা থেকে অন্য পৃষ্ঠায় দৃষ্টি চলে না, বিলম্বিত তানের তরঙ্গের মত শতাব্দীর পর শতাব্দী চলেছে স্রোতে ভেসে। সে ধারায় কত শৈলশ্রেণী উঠেছে নেমেছে। সাগরে মরুতে কত বেশ পরিবর্ত্তন হোয়েছে, সেই নিরবধি কালেরই দীর্ঘ প্রবাহে এগিয়ে এসেছে একটি ছোট ফুলের আদিম সঙ্কল্প, সৃষ্টির ঘাত-প্রতিঘাতে।

"লক্ষ লক্ষ বৎসর এই ফুলের ফোটা ঝরার পথে
সেই পুরাতন সঙ্কল্প রয়েছে নূতন, রয়েছে সজীব সচল,
ওর শেষ সমাপ্ত ছবি আজও দেয়নি দেখা,
এই দেহহীন সংকল্প, সেই রেখাহীন ছবি
নিত্য হোয়ে আছে কোন্ অদৃষ্টের ধ্যানে।
যে অদৃষ্টের অন্তহীন কল্পনায় আমি আছি,
যে অদৃশ্য বিধৃত সকল মানুষের ইতিহাস
অতীতে ভবিষ্যতে॥"

দশম কবিতাটিতে কবি বলছেন যে আমাদের এই দেহটা দীর্ঘকাল ধরে রাগ দ্বেষ, ভয় ভাবনা ও কামনা প্রভৃতির আবর্জনারাশি বহন কোরে আনছে। এর পঙ্কিল আবরণে আমাদের আত্মার মুক্ত রূপ আবৃত হয়। সত্যের মুখোস পরে এই সত্যকে আড়াল কোরে রাখা, মৃত্যুর কাদামাটি দিয়ে গড়ে আপনার পুতুল; স্তুতিনিন্দার বাষ্প বুদ্বুদে পাক খেয়ে ফেরে হাসি কান্নার আবর্ত্তে। কিন্তু যদি কখনো আমরা দেহটাকে মনের থেকে সরিয়ে ফেলে প্রভাতসূর্য্যের সামনে দাঁড়াই তবে যেন মনে হয় আমাদের অন্তরতম সত্য আমাদের কল্যাণতম রূপ আমাদের কাছে স্ফূর্ত্ত হয়।

আমাদের নানা ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা প্রতিক্ষণে আমাদের চারিদিকের বিশ্বের নানা রস গ্রহণ করে থাকি, যেমন গ্রহণ করে বনস্পতিরা তাদের পল্লব স্তবকে আলোর ধারা, নানা ঘাতে প্রতিঘাতে সংক্ষুব্ধ হয় আমাদের হৃদয়; আমাদের সমস্ত চিত্তকে তা দেয় নাড়া, বিশ্বভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে আমাদের এই মনোবৃক্ষের ছড়িয়ে পড়া রসলোলুপ পাতাগুলির সংবেদনে ঘনিষ্ঠ হোয়ে ওঠে আমাদের যোগ।—

"যে রূপের দ্বিতীয় নেই কোনোখানে কোনোকালে,
তাকে রেখে দিয়ে যাব কোন্ গুণীর কোন্
রসজ্ঞের দৃষ্টির সম্মুখে,

কার দক্ষিণ করতলের ছায়ায়,
অগণ্যের মধ্যে কে তাকে নেবে স্বীকার ক'রে।"

পঞ্চদশ কবিতাটিতে কবি বলছেন—

"আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য,—ভালবাসার অমৃত।
আমি ব্রাত্য আমি মন্ত্রহীন
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজো আজ সমাপ্ত হোলো
দেবলোক থেকে
মানব লোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।"

শেষ কবিতাটিতে কবি বলছেন—

"………তোমার বীণার শত তারে
মত্তভার নৃত্য ছিল এতক্ষণ ঝংকারে ঝংকারে
বিরাম বিশ্রাম হীন,—প্রত্যক্ষের জনতা তেয়াগি'
নেপথ্যে যাক সে চ'লে স্মরণের নির্জনের লাগি'
লয়ে তার গীত অবশেষ, কথিত বাণীর ধারা
অসীমের অকথিত বাণীর সমুদ্রে হোক সারা।"

আকাশ-প্রদীপ

বৈশাখ, ১৩৪৫

আমাদের সংসারে, আমাদের চারিদিকে দূর দূরান্তের গ্রহলোক পর্য্যন্ত সমস্তই আমাদের চারিদিকে তাদের আপন স্রোতে নৃত্য কোরে ফিরছে। কিন্তু কেবলমাত্র আমাদের অন্তরের আলোটী দিয়ে আমরা এই বিরাট অনুভূতি স্রোতের অর্থ খুঁজে নিতে পারি, সেগুলিকে প্রকাশ কোরে আমাদের অন্তরের মধ্যে। আমাদের ছোট অন্তরটুকু দিয়ে বিরাটকে বোঝবার চেষ্টা করা যেন আকাশ-প্রদীপ দিয়ে নক্ষত্র-লোককে বোঝবার চেষ্টা করা। তথাপি সমস্ত বহিঃপ্রকৃতিকে বোঝবার জন্য আমাদের কাছে ওই একটীমাত্রই প্রদীপ আছে সেটি আমাদের অন্তরের আলো। এই অন্তরের আলোকটিও বহিঃ-প্রকৃতি থেকে ভিন্ন নয়। বহির্লোকে যেমন নানা ছবির খেলা চলেছে, অন্তর্লোকেও তেমনি চলেছে প্রকাশের নানা লীলা। বহির্লোক আমাদের যা দেয় বর্ণে গন্ধে গীতে তাই আমরা বিচিত্র করে ফিরিয়ে দিই আমাদের অন্তর্লোকের প্রকাশের নানা ভঙ্গীতে। এই উভয়েই বিশ্ব-প্রকৃতির সম্পদ। এইটিই আকাশ-প্রদীপের মুখ্য কথা।

"ভূমিকা" কবিতাটিতে কবি বলছেন যে বাহিরের ক্ষণচঞ্চল সমস্ত চিত্রচ্ছায়াকে যখন আমরা স্মৃতির আকারের মধ্যে গ্রহণ করে ভাষার মধ্যে তাকে বাঁধবার চেষ্টা করি তখনই আমাদের মনে হয় যে সমস্ত ক্ষণভঙ্গুর বস্তুকে আমরা একটা অমর লোকের আভাস দিয়ে রেখে গেলুম। কাল-স্রোতে যা ভেঙে ভেঙে পড়ে তাই ছায়া দিয়ে গড়ে আমাদের প্রাণ। সে প্রাণ কাল-স্রোতেরই একটা দ্বিতীয় রূপ—

"মরণেরে বঞ্চিবার ভাণ ক'রে খুশি,
বাঁচা-মরা খেলাটাতে জিতিবার সখ,
তাই মন্ত্র পড়ে আনে কল্পনার বিচিত্র কুহক।

কাল-স্রোতে বস্তুমূর্ত্তি ভেঙে ভেঙে পড়ে,
আপন দ্বিতীয় রূপ প্রাণ তাই ছায়া দিয়ে গড়ে।
"রহিল" বলিয়া, যাব অদৃষ্টের পানে ;
মৃত্যু যদি করে তার প্রতিবাদ, নাহি আসে কানে।"

যাত্রাপথ কবিতাটিতে কবি বলছেন যে ছেলেবেলা থেকে আমরা নানা জিনিষ জানতে সুরু করি কোনটাই সম্পূর্ণ করে বোঝা হয়না। তবু সবই যে অবোঝা থাকে তাও নয়। এই বোঝা-না-বোঝা নিয়েই চলেছে জীবন ; কোথাও বা ঠেকে যাই কোথাও বা পথ পাই। এই জানা-না-জানার মধ্য দিয়ে একটা অদৃষ্টের উদ্দেশে আমরা নিরন্তর চলেছি আমাদের আবিষ্কার কোরতে কোরতে। তাই প্রত্যেক জানার মধ্যে রয়েছে একটা নিরুদ্দেশের কুহক যেন রূপকথায় রাজ-পুত্রের নিরুদ্দেশ পথে ঘোড়া ছোটান—

"মনে পড়ে, ছেলেবেলায় যে বই পেতুম হাতে
ঝুঁকে প'ড়ে যেতুম প'ড়ে তাহার পাতে পাতে।
কিছু বুঝি, নাই বা কিছু বুঝি,
কিছু না হোক পুঁজি,
হিসাব কিছু না থাক্ নিয়ে লাভ অথবা ক্ষতি,
অল্প তাহার অর্থ ছিল, বাকি তাহার গতি।
মনের উপর ঝরণা যেন চলেছে পথ খুঁজি,'
কতক জলের ধারা, আবার কতক পাথর নুড়ি।
সব জড়িয়ে ক্রমে ক্রমে আপন চলার বেগে
পূর্ণ হোয়ে নদী ওঠে জেগে।"

স্কুল-পালানো কবিতাটিতে কবি তাঁর নিজের গত জীবনের একটা ছবি দিতে চেষ্টা করেছেন। স্কুল-পালানো ছেলের মন কেমন কোরে নিজের বাড়ীর চারিদিকের প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যে তাদেরই সঙ্গে ভালবাসায় নিমগ্ন

হোয়ে যেত, সেই ছবিটি অতি সুন্দর কোরে আঁকা হোয়েছে স্কুল-পালানো কবিতাটির মধ্যে—

"পিঠ রাখি কুঞ্চিত বল্কলে
যে পরশ লভিতাম
জানিনা তাহার কোন নাম ;
হয়তো সে আদিম প্রাণের
আতিথ্য দানের
নিঃশব্দ আহ্বান,
যে প্রথম প্রাণ
একই বেগ জাগাইছে গোপন সঞ্চারে
রস রক্তধারে
মানব-শিরায় আর তরুর তন্তুতে,
একই স্পন্দনের ছন্দ উভয়ের অণুতে অণুতে,
সেই মৌনী বনস্পতি
সুবৃহৎ আলস্যের ছদ্মবেশে অলক্ষিত গতি
সূক্ষ্ম সম্বন্ধের জাল প্রসারিছে নিত্যই আকাশে,
মাটিতে বাতাসে,
লক্ষ লক্ষ পল্লবের পাত্র লয়ে
তেজের ভোজের পানালয়ে।"

"ধ্বনি" কবিতাটিতে কবি আবার ফিরে গেছেন তাঁর বাল্যে। নির্জন দুপুরে চিলের সুতীক্ষ্ণ স্বরে, কুকুরের কলকোলাহলে, ফেরিওয়ালাদের ডাকে, উড়ে যাওয়া হাঁসের শব্দে, ইস্কুলের ঘণ্টায়, ষ্টীমারের শিঙা শব্দে, কবির চিত্তের মধ্যে একটা নূতন স্পর্শ দিয়ে অস্পষ্ট চিন্তাকে তুলত জাগিয়ে, নিয়ে যেত যেন সৃষ্টির আদিম ভূমিকায়। চোখে দেখা এই পৃথিবীর অদৃশ্য অন্তঃপুরে যেন কোন রেখা-যাদুকর ইন্দ্রজালে ছবি আঁকছেন। কিই যে কেন আঁকেন সে প্রশ্নের কোন

উত্তর নেই কিন্তু সমস্ত মিলিয়ে আমাদের চিত্তকে যেন একটা অস্পষ্ট বাষ্পলোকের মধ্যে উদ্বুদ্ধ করে, বুদ্ধিতে তাকে ধরা যায় না—

"চোখে-দেখা এ বিশ্বের গভীর সুদূরে
রূপের অদৃশ্য অন্তঃপুরে
ছন্দের মন্দিরে বসি' রেখা-জাদুকর কাল
আকাশে আকাশে নিত্য প্রসারে বস্তুর ইন্দ্রজাল,
যুক্তি নয়, বুদ্ধি নয়
শুধু যেথা কত কী যে হয়,
কেন হয় কিসে হয় সে প্রশ্নের কোনো
নাহি মেলে উত্তর কখনো।

যেথা আদি পিতামহী পড়ে বিশ্ব-পাঁচালির ছড়া
ইঙ্গিতের অনুপ্রাসে গড়া,
কেবল ধ্বনির ঘাতে বক্ষস্পন্দে দোলন দুলায়ে
মনেরে ভুলায়ে
নিয়ে যায় অস্তিত্বের ইন্দ্রজাল সেই কেন্দ্রস্থলে,
বোধের প্রত্যুষে যেথা বুদ্ধির প্রদীপ নাহি জ্বলে।"

"বধূ" কবিতাটিতে কবির মনে পড়ছে ঠাকুরমার ছড়া,—

"বউ আসে চতুর্দ্দোলা চ'ড়ে
আম কাঁঠালের ছায়ে
গলায় মোতির মালা সোণার চরণ-চক্র পায়ে।"

বালকের প্রাণে নারীমন্ত্রের আগমনী গানে আলোয় আঁধারে ঝাপসা-করা একটা কল্পনার শিহর এনে দিয়েছিল। তারপর অশোকের কচি রাঙা পাতায় বর্ষণঘন শ্রাবণের বিনিদ্র নিশীথে যেন মনে জেগে উঠেছিল কোন্ অনাগত চরণের অলক্ত রেখা; কানে কানে গিয়েছিল যেন কথা কয়ে। একদিন যখন প্রিয়তমার

স্পর্শ পেলেন কবি তখন বুঝতে পারলেন যে প্রত্যূষে আলোতে যে চিরন্তনী নারী অন্তরে রেখে গিয়েছিলো তার দোলা সেইই এসেছে সমস্ত জীবনকে ব্যাপ্ত কোরে এবং একটা নূতন পরিচয় লাভ করেছে প্রিয়ার বাস্তব স্পর্শে—

"অকস্মাৎ একদিন কাহার পরশ
রহস্যের তীব্রতায় দেহে মনে জাগাল হরষ,
তাহারে শুধায়েছিনু অভিভূত মুহূর্তেই,
'তুমিই কি সেই,
আঁধারের কোন্ ঘাট হতে
এসেছ আলোতে।'

উত্তরে সে হেনেছিল চকিত বিদ্যুৎ,
ইঙ্গিতে জানায়েছিল, 'আমি তারি দূত'
সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে,
নিত্যকাল সে শুধু আসিছে।"

কবির অনেক লেখার মধ্যেই এই অনুভূতিটী স্পষ্ট হোয়ে ওঠে যে প্রাত্যহিক পরিচয়ের মধ্যে আমরা যা খণ্ড ও ক্ষুদ্র বলে দেখি, যার সীমা অল্পেই যায় ফুরিয়ে তারও পিছনে অলক্ষ্যে থাকে তাকে অতিক্রম কোরে তার একটা নূতন পরিচয় যা অসীমের দিক্ পর্য্যন্ত গিয়েছে ঝাপসা হোয়ে। জল কবিতাটিতে পুকুরের বাঁধাপাড়ের জলের ছবিটি দিতে গিয়ে কবির মন যখন সীমাবদ্ধ, পুকুরের জলে পথ না পেয়ে ফিরে এসেছে, তখনই তিনি অনুভব কোরেছেন যে এই বাঁধাপাড়কে অতিক্রম কোরে পুকুরের মধ্যেও একটা অসীমতার দিক আছে সেটা হচ্ছে তার গভীরের মধ্যে। তেমনি "শ্যামা" কবিতাটিতে কবি জানিয়েছেন কেমন কোরে একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নিবিড় হোয়ে ওঠে কিন্তু তারি সঙ্গে তাঁর অনুভব হোয়েছে যে এই পরিচয়ের সীমা পাওয়া যায় না। তার মধ্যে নিরন্তর রয়েছে একটা অসীমের দিক্ যা পরিচয়ের মধ্যে ফুরিয়ে যায় না,—

"তবু ঘুচিল না
অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা।
সুন্দরের দূরত্বের কখনো হয় না ক্ষয়,
কাছে পেয়ে না পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়।

পুলকে বিষাদে মেশা দিন পরে দিন
পশ্চিম দিগন্তে হয় লীন।
চৈত্রের আকাশতলে নীলিমার লাবণ্য ঘনালো,
আশ্বিনের আলো
বাজালো সোনার ধানে ছুটির সানাই।
চলেছে মন্থর তরী নিরুদ্দেশে স্বপ্নেতে বোঝাই।"

"পঞ্চমী" কবিতাটিতে গত জীবনের একটি প্রেম-নিষিক্ত ছবি দিয়ে কবি বলেছেন যে বর্ত্তমান কালে যখন দীর্ঘ পথ এসেছেন তিনি অতিক্রম কোরে তখন পুরানো দিনগুলির যেন কোন আর অর্থ নেই,

"দিনগুলি যেন পশুদলে চলে
ঘণ্টা বাজায়ে গলে,
কেবল ভিন্ন ভিন্ন
সাদা কালো যত চিহ্ন।"

"জানা অজানা" কবিতাটিতে কবি বলছেন যে-সমস্ত অনুভব পূর্ব্বের জীবনে একটা অর্থ ও সংগতি নিয়ে আসত আজকের জীবনে তাদের সে অর্থ ও সঙ্গতি নেই। একটা ঘরের মধ্যে যেমন নানা উপাদান নানা বস্তু পরস্পর ঠেসাঠেসি করে থাকে আমাদের মনের মধ্যেও তেমনি যেন পুরানো অনুভবগুলি আসবাব-পত্রের মত ছড়িয়ে রয়েছে। সামনে রয়েছে কিছু, কিছু বা লুকিয়ে আছে কোণে, যা ফেলবার তা ফেলে দিতে মনে নেই; তার সমস্ত অর্থ হয়ে আসে ক্রমশঃ ম্লান—

"স্পষ্ট আর অস্পষ্টের উপাদানে ঠাসা
ঘরের মতন ; ঝাপসা পুরানো ছেঁড়া ভাষা
আসবাবগুলো যেন আছে অন্য মনে,
সামনে রয়েছে কিছু, কিছু লুকিয়েছে কোণে কোণে।

যাহা ফেলিবার
ফেলে দিতে মনে নেই, ক্ষয় হ'য়ে আসে অর্থ তার
যাহা আছে জমে,
ক্রমে ক্রমে
অতীতের দিনগুলি
মুছে ফেলে অস্তিত্বের অধিকার। ছায়া তারা
নূতনের মাঝে পথহারা,
যে অক্ষরে লিপি তারা লিখিয়া পাঠায় বর্তমানে
সে কেহ পড়িতে নাহি জানে ॥"

পাখীর ভোজ কবিতাটিতে দেখতে পাই নানারকম পাখী তাদের নানারকম অঙ্গভঙ্গীতে খাবার কুড়িয়ে খাচ্ছে। কবি তাদের প্রাণস্রোতের এই বিচিত্র প্রবাহ দেখে বলছেন—

"সেই প্রাণেরে বাহন করি আনন্দের এই তত্ত্ব অন্তহারা
দিকে দিকে পাচ্ছে পরকাশ।
পদে পদে ছেদ আছে তার নাই তবু তার নাশ।

আলোক যেমন অলক্ষ্য কোন সুদূর কেন্দ্র হোতে
অবিশ্রান্ত স্রোতে
নানারূপের বিচিত্র সীমায়
ব্যক্ত হোতে থাকে নিত্য নানা ভঙ্গে নানা রঙ্গিমায়।

তেমনি যে এই সত্তার উচ্ছ্বাস
চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে ফেলে নিবিড় উল্লাস—
যুগের পরে যুগে তবু হয় না গতি-হারা,
হয়না ক্লান্ত অনাদি সেই ধারা।
সেই পুরাতন অনির্ব্বচনীয়
সকালবেলায় রোজ দেখা দেয় কি ও
আমার চোখের কাছে
ভিড় করা ঐ শালিখগুলির নাচে।"

নামকরণ কবিতাটিতে তিনি বলছেন—

"পুরুষ যে রূপকার,
আপনার সৃষ্টি দিয়ে নিজেরে উদ্‌ভ্রান্ত করিবার
অপূর্ব্ব উপকরণ
বিশ্বের রহস্য-লোকে করে অন্বেষণ
সেই রহস্যই নারী।
নাম দিয়ে ভাব দিয়ে মনগড়া মূর্ত্তি রচে তারি
যাহা পায় তার সাথে যাহা নাহি পায়
তাহারে মিলায়।
উপমা তুলনা যত ভীড় কোরে আসে
ছন্দের কেন্দ্রের চারিপাশে,
কুমারের ঘুর-খাওয়া চাকার সংবেগে
যেমন বিচিত্ররূপ উঠে জেগে জেগে।"

পুরুষের চিত্তের ডাকে এই যে রহস্য-মূর্ত্তি ফুটে ওঠে তার সত্য মিথ্যা কে জানে, আমাদের রক্তস্রোতের আন্দোলনে নামের মন্ত্র অর্থহীন বেগে ধ্বনিত হোয়ে ওঠে,—

"এই যারে মায়ারথে পুরুষের চিত্ত ডেকে আনে
সে কি নিজে সত্য করে জানে
সত্য মিথ্যা আপনার,
কোথা হতে আসে মন্ত্র এই সাধনার।
রক্ত-স্রোত আন্দোলনে জেগে
ধ্বনি উচ্ছ্বসিয়া উঠে অর্থহীন বেগে;
প্রচ্ছন্ন নিকুঞ্জ হতে অকস্মাৎ ঝঞ্ঝায় আহত
ছিন্ন মঞ্জরীর মতো
নাম এল ঘুর্ণি বায়ে ঘুরি' ঘুরি'
চাঁপার গন্ধের সাথে অন্তরেতে ছড়াল মাধুরী॥"

এমনি আরও কয়েকটি সুন্দর সুন্দর ছবিতে আকাশ-প্রদীপের শিখা উজ্জ্বল হোয়ে উঠেছে।

নবজাতক

বৈশাখ, ১৩৪৭

প্রথম কবিতাটিতে কবি নূতন যুগের বন্দনা করেছেন—

"রক্তপ্লাবনে পঙ্কিল পথে
বিদ্বেষে বিচ্ছেদে
হয়তো রচিবে মিলনতীর্থ
শান্তির বাঁধ বেঁধে।
কে বলিতে পারে তোমার ললাটে লিখা
কোন্ সাধনার অদৃশ্য জয়টিকা।

আজিকে তোমার অলিখিত নাম
আমরা বেড়াই খুঁজি'
আগামী প্রাতের শুকতারা সম
নেপথ্যে আছে বুঝি।
মানবের শিশু বারে বারে আনে
চির আশ্বাসবাণী
নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো
বুঝিবা দিতেছে আনি ॥"

শেষ দৃষ্টি কবিতাটিতে কবি বলছেন যে এক সময়ে জীবনে যে সুখ ধারা জগৎকে প্রিয় কোরে তুলেছিল আজ বার্দ্ধক্যে তা হয়ে এসেছে কুণ্ঠিত কিন্তু তার স্পষ্ট রূপটি চোখের সামনে থেকে সরে গেলেও তার অস্পষ্ট স্বরূপটি যেন নূতন দৃষ্টি খুলে দেয় এবং তাতে জগতের অনির্ব্বচনীয় রূপটির একটি নূতন আভাস পাওয়া যায়—

"একদা জীবনে সুখের শিহর
নিখিল করেছে প্রিয়।
মরণ পরশে আজি কুণ্ঠিত,
অন্তরালে সে অবগুণ্ঠিত
অদেখা আলোকে তাকে দেখা যায়
কী অনির্ব্বচনীয় ॥
যা গিয়েছে তার অধরারূপের
অলখ পরশখানি
যা রয়েছে তারি তারে বাঁধে সুর;
দিক্‌সীমানার পারের সুদূর
কালের অতীত ভাষার অতীত
শুনায় দৈববাণী ॥

"প্রায়শ্চিত্ত" কবিতাটিতে বর্ত্তমান সভ্যজাতির দম্ভ ও লোভ, ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে তাদের যে নূতন প্রায়শ্চিত্ত কোরছে এই কথাটি সূচিত হয়েছে। "বুদ্ধভক্তি" কবিতাটিতে জাপানীরা যে বুদ্ধের পূজারী হয়েও চীনের প্রতি অকারণে হিংসা ও অত্যাচার কোরছে এই মর্ম্মটিকে অবলম্বন কোরে তাদের ধিক্কার দিয়েছেন। "কেন" এই কবিতাটিতে সূর্য্য থেকে কেমন কোরে গ্রহ তারার সৃষ্টি হোয়েছে, পৃথিবীর সৃষ্টি হোয়েছে, কেমন কোরে লক্ষ লক্ষ প্রাণ-স্রোতের মৃত্যু-গহ্বর থেকে নূতন নূতন প্রাণ-স্রোত বেরিয়ে এসেছে এবং মানুষের চৈতন্য স্পন্দিত হোয়ে উঠে নূতন প্রকাশে নূতন বেদনায়, নূতন সৃষ্টি করেছে তারই বর্ণনা করেছেন। আবার সন্দেহ করেছেন যে এই যে রূপরাশি উৎপন্ন হয়েছে, এই যে প্রাণ-প্রবাহের নূতন পর্য্যায় ছুটে চলেছে, এরও কি একদিন আবার লয় হবে, এমনি কোরেই কি ভাঙ্গাগড়া চলতে থাকবে? কেনই বা এ ভাঙ্গাগড়া নিরন্তর চলছে? এই সৃষ্টির মূলে কি এমন রহস্য-বাণী আছে যা আপনাকে পূর্ণ কোরে তুলছে প্রতিক্ষণে এই বিশ্বের নানা সৌন্দর্য্য ধারায় এবং মানুষের চৈতন্যের মধ্যে।

"শুধায়েছি এ বিশ্বের কোন্ কেন্দ্রস্থলে
মিলিতেছে প্রতি দণ্ডে পলে
অরণ্যের পর্ব্বতের সমুদ্রের উল্লোল গর্জ্জন
ঝটিকার মন্দ্রস্বন,
দিবস নিশার
বেদনা-বীণার তারে চেতনার মিশ্রিত ঝংকার;
পূর্ণ করি ঋতুর উৎসব
জীবনের মরণের নিত্য কলরব,
আলোকের নিঃশব্দ চরণপাত
নিয়ত স্পন্দিত করি' দ্যুলোকের অন্তহীন রাত।
কল্পনায় দেখেছিনু প্রতিধ্বনিমণ্ডল বিরাজে
ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর কন্দর-মাঝে।

সেথা বাঁধে বাসা
চতুর্দ্দিক হতে আসি' জগতের পাখা-মেলা ভাষা।
সেথা হোতে পুরানো স্মৃতিরে দীর্ণ করি'
সৃষ্টির আরম্ভ বীজ লয় ভরি' ভরি'
আপনার পক্ষপুটে ফিরে চলা যত প্রতিধ্বনি।
অনুভব করেছি তখনি
বহু যুগ-যুগান্তের কোন এক বাণীধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি পথহারা
সংহত হয়েছে অবশেষে
মোর মাঝে এসে।"

"অস্পষ্ট" কবিতাটিতে কবি বলছেন যে, 'যে-সমস্ত অস্পষ্ট বেদনা স্পষ্ট বোধের বাহিরে থাকে এবং ভাবনা-প্রবাহে যাদের পরিচয় পাওয়া যায় না তা আমাদের প্রাণের তন্তুতে রেখায় রেখায় যে রঙ ফেলে যায় তাই আমাদের চিত্তকে পূর্ণ করে তোলে এবং তারই মায়া আমাদের জাগ্রত বুদ্ধিকে প্রণোদিত করে—

"চেতনার জালে এ মহা গহনে
বস্তু যা-কিছু টিঁকিবে,
সৃষ্টি তারেই স্বীকার করিয়া
স্বাক্ষর তাহে লিখিবে।

তবু কিছু মোহ, কিছু কিছু ভুল
জাগ্রত সেই প্রাপনার
প্রাণতন্তুতে রেখায় রেখায়
রং রেখে যাবে আপনার।

এ জীবনে তাই রাত্রির দান
দিনের রচনা জড়ায়ে

চিন্তা কাজের ফাঁকে ফাঁকে সব
রয়েছে ছড়ায়ে ছড়ায়ে।
বুদ্ধি যাহারে মিছে বলে হাসে
সে যে সত্যের মূলে
আপন গোপন রস সঞ্চারে
ভরিছে ফসলে ফুলে।
অর্থ পেরিয়ে নিরর্থ এসে
ফেলিছে রঙিন ছায়া,
বাস্তব যত শিকল গড়িছে,
খেলেনা গড়িছে মায়া॥"

"এপারে ওপারে" কবিতাটির প্রধান বলবার কথা এই—

"ওইখানে ঘনীভূত জনতার বিচিত্র তুচ্ছতা
এলোমেলো আঘাতে সংঘাতে
নানা শব্দ নানা রূপ জাগিয়ে তুলিছে দিনে রাতে।
কিছু তার টেঁকে নাকো দীর্ঘকাল,
মাটিগড়া মৃদঙ্গের তাল
ছন্দটারে তার
বদল করিছে বারংবার।
তারি ধাক্কা পেয়ে মনে
ক্ষণে ক্ষণে
ব্যগ্র হোয়ে ওঠে জাগি
সর্ব্বব্যাপী সামান্যের সচল স্পর্শের লাগি।
আপনার উচ্চতট হতে
নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে।"

"ইষ্টিশান" কবিতাটিতে কবি বলছেন—

"চিত্রকরের বিশ্ব-ভুবনখানি—
এই কথাটাই নিলাম মনে মানি।
কর্ম্মকারের নয় এ গড়া পেটা,
আঁকড়ে ধরার জিনিষ এ নয়
দেখার জিনিষ এটা।
কালের পরে যায় চলে কাল
হয় না কভু হারা
ছবির বাহন চলাফেরার ধারা।
ছবেলা সেই এ সংসারের
চলতি ছবি দেখা
এই নিয়ে রই যাওয়া-আসার
ইষ্টিশানে একা॥"

"প্রশ্ন" কবিতাটিতে কবি বলছেন যে এক সময় শূন্যাকাশে যে বহ্নি-বাষ্প উঠেছিল তারই নানা আবর্ত্তনে সহস্র সহস্র বৎসরের নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে আমার আমি রূপে এই চেতন লোকটি সুখ দুঃখ ভালো মন্দ নিয়ে তার নিজের সত্তায় গড়ে উঠেছে। এর যথার্থ অর্থ কি তা বলা যায় না। বুদ্‌বুদের মত ফুটে উঠে আবার বুদ্‌বুদের মতই যাবে নিবে—

"এরা সত্য কি যে
বুঝি নাই নিজে।
বলি তারে মায়া,
যাই বলি শব্দে সেটা, অব্যক্ত অর্থের উপচ্ছায়া।
তার পরে ভাবি,
এ অজ্ঞেয় সৃষ্টি "আমি" অজ্ঞেয় অদৃষ্টে যাবে নাবি।

অসীম রহস্য নিয়ে মুহূর্তের নিরর্থকতায়
লুপ্ত হবে নানা রঙা জলবিম্ব প্রায়,
অসমাপ্ত রেখে যাবে তার শেষ কথা
আত্মার বারতা
তখনো সুদূরে ঐ নক্ষত্রের দূত
ছুটাবে অসংখ্য তার দীপ্ত পরমাণুর বিদ্যুৎ
অপার আকাশ মাঝে,
কিছুই জানি না কোন্ কাজে।
বাজিতে থাকিবে শূন্যে প্রশ্নের সুতীব্র আর্তস্বর,
ধ্বনিবে না কোনই উত্তর।"

"প্রজাপতি" কবিতাটিতে কবি বলছেন যে এই বিচিত্র ভুবনে একই সত্য নানা ইন্দ্রিয় দিয়ে নানা প্রাণী গ্রহণ কোরে থাকে। যে যেটি গ্রহণ কোরতে পারে সে তারই খবর রাখে, অন্য কিছুর নয়। প্রজাপতি একখানা কাব্য-পুঁথির উপরে বসে তাকে স্পর্শে পায়, চোখে দেখে। তার বেশী তার যা সত্য তা তার কাছে একেবারে অসত্য। আমরা সকলেই যার যার জানাটুকুর মধ্যে আবদ্ধ—

"আমি যেথা আছি
মন যে আপন টানে তাহা হোতে সত্য লয় বাছি।
যাহা নিতে নাহি পারে
তাই শূন্যময় হয়ে নিত্য ব্যাপ্ত তার চারিধারে।
কী আছে বা নাই কি এ,
সে শুধু তাহার জানা নিয়ে।
জানে না যা, যার কাছে স্পষ্ট তাহা, হয় তো বা কাছে
এখনি সে এখানেই আছে,
আমার চৈতন্য সীমা অতিক্রম করি বহুদূরে
রূপের অন্তরদেশে অপরূপ-পুরে।

সে আলোকে তার ঘর
যে আলো আমার অগোচর ॥"

সানাই

আষাঢ়, ১৩৪৭

রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাতেই একটি অজ্ঞাত সুদূরের জন্য আর্তি দেখা যায়। সে আর্তিটি নানাভাবে নানা স্থানে প্রকাশ পেয়েছে। সে যেন অসীমার জন্য সীমার বেদনা—

"সুদূরের পানে চাওয়া উৎকণ্ঠিত আমি
মন সেই আঘাটায় তীর্থপথগামী
যেথায় হঠাৎ নামা প্লাবনের জলে
তটপ্লাবী কোলাহলে
ওপারের আনে আহ্বান,
নিরুদ্দেশ পথিকের গান।"

আবার শেষের দিকে কবি বলছেন—

"কুসুমিত অরণ্যের গভীর রহস্যখানি
তোমার সর্ব্বাঙ্গে মনে দিবে আনি
সৃষ্টির প্রথম গূঢ় বাণী।
যেই বাণী অনাদির সুচিরবাহিত,
তারায় তারায় শূন্যে হোল রোমাঞ্চিত,
রূপেরে আনিল ডাকি
অরূপের অসীমেতে জ্যোতিঃ-সীমা আঁকি।"

কর্ণধার কবিতাটিতেও কবি অনুভব কোরছেন যে তাঁর অন্তর্য্যামী পুরুষ তাঁর জীবন-তরীকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কোন সুদূরলোকে নিয়ে যাবে।—

"বক্ষে যবে বাজে মরণ ভেরী
ঘুচিয়ে ত্বরা ঘুচিয়ে সকল দেরি
প্রাণের সীমা মৃত্যু-সীমায়
সূক্ষ্ম হয়ে মিলায়ে যায়,,
উর্দ্ধে তখন পাল তুলে দাও
অন্তিম যাত্রার।
ব্যক্ত করো, হে মোর কর্ণধার
আঁধারহীন অচিন্ত্য সে
অসীম অন্ধকার॥"

"জ্যোতির্বাষ্প" কবিতাটিতেও খানিকটা এই ভাবই প্রকাশ পেয়েছে। স্পষ্ট ভাবে আমরা জীবনে যা পাই তার চেয়েও বড় হোয়ে আমাদের মধ্যে কা[illegible] কোরছে আমাদের যে ভাগ রয়েছে আমাদের মধ্যে অস্পষ্ট হোয়ে। শিল্পীর একটা সঙ্কেত যেন আমাদের গোপন মনের মধ্যে রয়েছে; তাকে সহজে জানা যায় না সে যেন আমাদের দূরে সরিয়ে রাখে—

"অনন্তের সমুদ্র মন্থনে
গভীর রহস্য হোতে তুমি এলে আমার জীবনে।
উঠিয়াছ অতলের অস্পষ্টতা খানি
আপনার চারিদিকে টানি।
নীহারিকা বহে যথা কেন্দ্রে তার নক্ষত্ররে ঘেরি,
জ্যোতির্ময় বাষ্পমাঝে দূর বিন্দু তারাটিরে হেরি।
তোমা মাঝে শিল্পী তার রেখে গেছে তর্জ্জনীর মানা
সব নহে জানা।

সৌন্দর্য্যের যে পাহারা জাগিয়া রয়েছে অন্তঃপুরে
সে আমারে নিত্য রাখে দূরে ॥"

"জানালায়" কবিতাটিতেও ওই একই সুর দেখা যায়—

"ঘরের ভিতরে যে প্রাণের ধারা চলে
সে যেন অতীত কাহিনীর কথা বলে।

যারা আসে যায় তাদের ছায়ায়
প্রবাসের ব্যথা কাঁপে।"

কবি যেন প্রাত্যহিক কর্ম্মস্রোতের নানা ব্যাপারের মধ্যে দূরপ্রসারী সেই কর্ম্মস্রোতের একটা আভাস অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি কোরতে পারতেন। এই বর্ত্তমানের কর্ম্মস্রোত যে তার অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রবাহের সঙ্গে একান্তভাবে সম্বদ্ধ হোয়ে রয়েছে সেটা বুদ্ধিতে সকল সময় ধরা না পড়লেও অন্তরের উপলব্ধিতে অনুভব কোরতে পারতেন এবং তার সঙ্গে নিজের একাত্মযোগ অনুভব করাতে তাঁর মধ্যে সেটা কখনো ফুটে উঠতো দূরের জন্য আর্ত্তিতে; কখনো বা সেটা ফুটে উঠতো নিজের অজানা মনের সঙ্গে নিজের অন্তরঙ্গতা বোধে। কখন বা অনুভব কোরতেন যে একটা অস্পষ্ট আলোক তাঁর মধ্যে স্পষ্ট হোতে চাচ্ছে কিন্তু পাচ্ছে না। "ক্ষণিক" কবিতাটিতে কবি বলছেন যে মহাশিল্পীর ঐশ্বর্য্য এত বেশী যে কোন ক্ষয়কেই তিনি ক্ষয় বলে মানেন না। যা যত্নে এঁকে তোলেন অনায়াসে তা দেন মুছে। আমাদের লোভ ও লোলুপতা কোনো কিছুকেই আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে না—

"প্রকাশে বিকাশে বাঁধিয়া সূত্র
ক্ষয়ে নাহি মানে ক্ষয়।
যে দান তাহার সবার অধিক দান
মাটির পাত্রে সে পায় আপন স্থান।

ক্ষণ-ভঙ্গুর দিনে
নিমেষ-কিনারে বিশ্ব তাহারে
বিস্ময়ে লয় চিনে।
অসীম যাহার মূল্য সে ছবি
সামান্য পটে আঁকি
মুছে ফেলে দেয় লোলুপেরে দিয়ে ফাঁকি।"

আবার "অধরা" কবিতাটিতে কবি বলছেন যে কোনো অধরার কোনো অদৃশ্যের মাধুর্য্য তাঁর ছন্দে প্রকাশ পাচ্ছে। জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়ে তার অতীত কোনো অদৃশ্য অস্পর্শনীয় আপনাকে প্রকাশ কোরছে। যা অতীত তা আপনাকে প্রকাশ কোরছে বর্ত্তমানের মধ্য দিয়ে—

"গত ফসলের রাঙিমারে
ধরে রাখে ওর পাখা,
ঝরা শিরীষের পেলব আভাষ
ওর কাকলীতে মাখা।"

আবার "গানের খেয়া" কবিতাটিতেও এই ভাবটিই একটু নতুন রকমে প্রকাশ পেয়েছে। অতীত এবং ভবিষ্যৎ যেন বর্ত্তমানের মধ্যে আপনাকে স্ফুট কোরে তুলেছে

"ঐ মুখে চেয়ে দেখি
জানিনে তুমিই সেকি
অতীত কালের মূরতি এসেছ
নতুন কালের বেশে।
কভু জাগে মনে
যে আসেনি এ জীবনে
ঘাট খুঁজি খুঁজি
গানের খেয়া সে লাগিতেছে বুঝি
আমার তীরেতে এসে।"

সানাইয়ের সুর বিদায়ের সুর। এই প্রচ্ছন্ন দূরাভাবের বার্তা সানাইয়ের অধিকাংশ কবিতাগুলির মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। "সানাই" কবিতাটিতে কবি জগতের প্রাত্যহিক নানা সঙ্গতিবিহীন ঘটনার বর্ণনা কোরে বলছেন—

"সমস্ত এ ছন্দ ভাঙা অসঙ্গতি মাঝে
সানাই লাগায় তার সারঙের তান্।
কি নিবিড় ঐক্যমন্ত্র করেছে সে দান
কোন্ উদ্‌ভ্রান্তের কাছে
বুঝিবার সময় কি আছে!"

অরূপের মর্ম্ম থেকে যেন নিরন্তর উৎসবের মধুচ্ছন্দ তার বাঁশী বাজাচ্ছে—

"মনে হয় বিশ্বের যে মূল উৎস হোতে
সৃষ্টির নির্ঝর ঝরে শূন্যে শূন্যে কোটি কোটি স্রোতে
এ রাগিণী সেথা হোতে আপন ছন্দের পিছু পিছু
নিয়ে আসে অতীত বস্তুর কিছু কিছু।

মন যেন ফিরে
সেই অলক্ষ্যের তীরে তীরে
যেথাকার রাত্রি দিন দিনহারা রাতে
পদ্মের কোরক সম প্রচ্ছন্ন রোয়েছে আপনাতে।"

এখানেও সেই ভাবই দেখতে পাই যে অরূপ থেকে যে সৃষ্টি ফুটে উঠছে, যে স্পন্দন ধারা বস্তুরূপে প্রকাশিত হোচ্ছে সে যেন তার সঙ্গে বস্তুর অতীত অব্যক্ত কিছু, তা সঙ্গে নিয়ে আসছে। সমস্ত রূপের মধ্য দিয়ে যেন এইভাবে অরূপের একটি অব্যক্ত ছায়া আত্মপ্রকাশ লাভ কোরছে আর তারই জন্যে জেগে উঠছে কবির মনের আর্ত্তি।

এই ভাবই আবার দেখতে পাই "পূর্ণা" কবিতাটিতে—

"যেন অশ্রুত বনমর্মর
তোমার বক্ষে কাঁপে থর থর।
অগোচর চেতনার
অকারণ বেদনার
ছায়া এসে পড়ে মনের দিগন্তে,
গোপন অশান্তি
উছলিয়া তুলে ছল ছল জল
কজ্জল আঁখি পাতে॥"

"মানসী" কবিতাটিতে কবি বলেছেন যে মনের অচেনা বেদনা তাকে যেন প্রকাশ কোরতে চাচ্ছে সুন্দরের বিচিত্র পট-ভূমিকায়। এই প্রকাশিত বাণী কবিকে অতিক্রম কোরে সুদূর কালস্রোতে ভেসে যাবে—

"কাব্যখানি পাড়ি দিল চিহ্নহীন কালের সাগরে
কিছুদিন তরে;
শুধু একখানি
সূত্রছিন্ন বাণী
সেদিনের দিনান্তের মগ্নস্মৃতি হতে
ভেসে যায় স্রোতে।"

একটু বাতাসের ছোঁওয়া লেগে একটি মল্লিকা ফুল যখন গন্ধে উদ্‌ভিন্ন হোয়ে উঠে তখন সেই প্রস্ফুর্তির রহস্য যেন মহা সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর। সে নিয়ে আসে তার সঙ্গে মহা অনন্তের সুগম্ভীর আত্মবিকাশ—

"জানে না সে কখন দুলায়ে গেল চলি
বিপুল নিঃশ্বাস বেগে একটুকু মল্লিকার কলি,

উদ্ঘারিল গন্ধ তার,
সচকিয়া লভিল সে গভীর রহস্য আপনার,
এই বার্ত্তা ঘোষিল অম্বরে
সমুদ্রের উদ্বোধন পূর্ণ আজি পুষ্পের অন্তরে।"

সানাই সংগ্রহটিতে যেমন একদিকে রয়েছে বিদায়ের সুর ও দূরের আর্ত্তি তেমনি অনেকগুলি কবিতাতে নানা অবসরের সুন্দর সুন্দর চলতি ছবি এঁকে গিয়েছেন। সেগুলিকে সমালোচনার আঙ্গুলে ধরা যায় না। তার পরিচয় পাওয়া যায় তাদের অপরূপ আস্বাদে।

জন্মদিনে

বৈশাখ, ১৩৪৪

ইতিপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের যে সমস্ত কবিতা আলোচনা করা হয়েছে, দেখা যাবে যে তার অনেকগুলির মধ্যেই, রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে যে একটা দূরত্বের স্পর্শ আছে বা দূরত্বের জন্য আর্ত্তি আছে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই দূরত্বের জন্য আর্ত্তি নানাভাবে তাঁর কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে; কোনো যায়গায় বা একটা অস্ফুট বেদনা মেঘের মধ্য দিয়ে বর্ষণের মধ্য দিয়ে, ঝড়ের মধ্য দিয়ে একটা কোন অজানার প্রতি একটা অন্তর্বেদনা পরিস্ফুট হোয়ে উঠেছে। কালিদাসের মেঘদূত কবিতাটিরও রবীন্দ্রনাথ এইরকম অর্থই দিয়েছেন। প্রণয়িনীর জন্য যক্ষের যে বিরহ ব্যথা এবং মেঘের নিকট যে দৌত্য প্রার্থনা তার মধ্য দিয়ে কবি একটা বিষয়হীন মর্ম্মবেদনার পরিচয় পেয়েছেন। "সানাই"য়ের "যক্ষ" কবিতাটিতে কবি যক্ষের বিরহের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন—

"পথিক কালের মর্মে জেগে থাকে বিপুল বিচ্ছেদ ;
পূর্ণতার সাথে ভেদ
মিটাতে সে নিত্য চলে ভবিষ্যের তোরণে তোরণে
নব নব জীবনে মরণে।
এ বিশ্ব ত তারি কাব্য, মন্দাক্রান্তে তারি রচে টিকা
বিরাট দুঃখের পটে আনন্দের সুদূর ভূমিকা।
ধন্য যক্ষ সেই
সৃষ্টির আগুন-জ্বালা
এই বিরহেই

*   *   *   *

স্তব্ধগতি চরমের স্বর্গ হোতে
ছায়ায় বিচিত্র এই নানাবর্ণ মর্ত্যের আলোতে
উহারে আনিতে চাহে
তরঙ্গিত প্রাণের প্রবাহে।"

অনেক গানের মধ্যেও এই আর্তিটী একটি মিলনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে যেমন—

"ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।"

এমনি অধিকাংশ বর্ষার গানের মধ্যে একটা সুর ফুটে উঠেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় যে বর্ষা বর্ণনের মধ্যে প্রোষিত-যোষিতদের একটা বিরহ ব্যথা ধ্বনিত হোয়েছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতির মধ্যেও বর্ষাবর্ণনে এই বিরহের সুরটি ধরা পড়ে—

"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর",

সেকালে বর্ষাকালে স্বামীরা আসত ঘরে ফিরে সেইজন্যে বর্ষা ঋতুতে স্বামীদের কথা মনে পড়ে বিরহিণীদের মনে দুঃখ জেগে উঠত। কিন্তু বর্ষাকাব্যে যে বিরহের সুরের পরিচয় রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন এ তা নয়। এখানে বর্ষার প্রভাবে কবির মনে একটা অজ্ঞাত মিলনের আকাঙ্ক্ষা, একটা অজ্ঞাত দুঃখ জেগে উঠতে দেখা যায়। "যক্ষ" কবিতাটিতে সেই দুঃখের একটু ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বলেছেন যে এ হোচ্ছে অদৃশ্য আনন্দ-লোককে বাইরের জগতের মধ্যে দেখবার একটা বৃত্তি। এটা হোচ্ছে আদিম সৃষ্টির একটি বেদনা। কোনো জায়গায় তিনি এই আর্ত্তিকে ব্যাখ্যা কোরতে গিয়ে বলেছেন যে যেন সমস্ত স্পন্দমান গতি-স্রোতকে নিজের মধ্যে মূঢ়ভাবে স্পর্শ করবার বেদনাই এই আর্ত্তি। মহাগতি স্রোতের একটি অংশ দিক্‌কালের মধ্যে আবদ্ধ হোয়ে আমার আমিকে কোরেছে সৃষ্টি। এই আমার আমির মধ্যে যে গতিস্রোত প্রাণ পেয়েছে সেই গতিস্রোত এই মহাগতি স্রোতের সঙ্গে মিলিত হোতে চায় এবং তার সুব সকল সময় তাব কানে আসে। এই বাস্তবের নানা বিচিত্র খণ্ডের মধ্যে দিয়ে আমরা একটা অখণ্ড অসীমের স্পর্শ পাই এইটিই অসীমের জন্য সীমার বেদনা। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে কবি এই গতিস্রোতকে নিজের মধ্যে দ্বিধা-বিভক্তভাবে দেখেছেন, একদিকে রয়েছে আমাদের মধ্যে যা ফোটেনি, যা স্পষ্ট হয়নি অথচ যা স্পষ্ট হোতে চেষ্টা কোরছে এবং যে অংশটা আমিরূপে স্পষ্ট হোয়ে উঠেছে। এর সঙ্গে আবার রয়েছে আর একটা অংশ যা ভবিষ্যতে স্পষ্ট হোয়ে উঠতে পারে। এই অতীত ও অনাগতের ছায়া, এই অস্পষ্টতার ছায়া আমাদের স্ফুট ও ব্যক্ত অংশকে একটি অপূর্ব্বতার মহিমায় মণ্ডিত করে। স্ফুটের মধ্যে যে এই অস্ফুটের স্পর্শ তাও এই রকম আর্ত্তিরূপে প্রকাশ পেয়েছে। আবার গ্রহ-নক্ষত্রের সৃষ্টি থেকে আরম্ভ কোরে যে মহাসৃষ্টিধারার মধ্যে বনস্পতি লোকের মধ্যে প্রাণ পর্য্যায়ের মধ্যে তাদেরই সঙ্গে অখণ্ড ভাবে ফুটে উঠেছে আমাদেরই যে এই চেতনা, সেই চেতনা মূঢ়ভাবে আপনাকেই এই সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে ব্যাপ্ত করে। সেই ব্যাপ্তি, সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে নিহিত হয়ে রয়েছে আমাদের যে আত্মীয়তা তাকে স্মরণ করিয়ে

দেয়, সেই অস্ফুট চৈতন্য একটি আর্ত্তি বা কামনারূপে দেখা দেয়, প্লাবিনী স্পন্দ-গতির মধ্য থেকে সমস্ত খণ্ড ও ক্ষুদ্র আপাততঃ পৃথক ভাবে আমাদের চোখে পড়ে কিন্তু তার পূর্ণ সত্তা রয়েছে অতীত অনাগতের মধ্যে ব্যাপ্ত হোয়ে। এইজন্তেই প্রত্যেক সীমাবদ্ধের মধ্যে একটি অসীমতার ছায়া তাকে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত কোরে রয়েছে। এখানেও দেখতে পাই সীমা অসীমার মিলন বিরহ। এই নানাপ্রকার আর্ত্তির মধ্য দিয়ে আমাদের চিত্ত যে অস্ফুট ও অব্যক্তকে স্পর্শ করে এবং যে অস্ফুট ও অব্যক্ত আমাদের নিরন্তর স্ফুটতা ও ব্যক্তের মধ্যে প্রকাশ কোরছে, গড়ে তুলছে, সেইটিই হোচ্ছে কবির "মানসী"।

"জন্মদিনে" সংগ্রহের প্রথম কবিতাটিতেও আমরা এই ভাবটিই দেখতে পাই—

"আজি এই জন্মদিনে
দূরত্বের অনুভব অন্তরে নিবিড় হোয়ে এল।
যেমন সুদূর ওই নক্ষত্রের পথ
নীহারিকা জ্যোতির্বাষ্প মাঝে
রহস্যে আবৃত,
আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে,
অলক্ষ্য পথের যাত্রী অজানা তাহার পরিণাম।"

আমাদের মধ্যে যে আমিত্বের যাত্রা আরম্ভ হোয়েছে, প্রতি জন্মদিনে যাকে আমরা নূতন নূতন ভাবে দেখতে পাচ্ছি, এই যাত্রাও চলেছে একটা মহাযাত্রার দিকে। সেই যাত্রা যে কোন দুর্গম অনির্ব্বচনীয়ের দিকে ছুটেছে তা আমরা জানি না। শুধু সেই দূরত্বটুকু অনুভবের মধ্যে বুঝতে পারি।

আমাদের প্রথম জন্মদিনে আমাদের ভবিষ্যৎ সৃষ্টির সমস্তটাই থাকে জলমগ্ন। ক্রমশঃ ক্রমশঃ এই মগ্নতার আবরণ দূর হোতে থাকে কিন্তু যতই আমাদের বয়স বাড়ুক না কেন শিল্পীর তুলিতে যতই নূতন নূতন আঁকা হোক না কেন, আমাদের

অন্তরের ছবির চরম পরিচয় কখনই তাকে পূর্ণ প্রকাশ দিতে পারে না। ব্যক্ত একটি জীবনের চারিদিকে বিস্তৃত হোয়ে রয়েছে বিরাট অব্যক্ত—

"এখন হয়নি খোলা আমার জীবন-আবরণ,
সম্পূর্ণ যে আমি
রয়েছে আপন অগোচর।
নব নব জন্মদিনে
যে রেখা পড়িবে আঁকা শিল্পীর তুলির টানে টানে
ফোটেনি তাহার মাঝে ছবির চরম পরিচয়।
শুধু করি অনুভব
চারিদিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন
বেষ্টন করিয়া দিবস রাত্রিরে।"

অনেক জন্মদিনে গাঁথা এই জীবনটি এমন একটি দিনে এসে ঠেকে যখন মরণের ডাকে এই প্রতিদিনের চিহ্নিত জন্মদিনগুলি একটি অখণ্ড কালের পর্য্যায়ের মধ্যে মিশে যায়। সেদিনের কোনো স্মৃতিতে কোনো অরণ্যের মর্ম্মরের গুঞ্জরণ থাকে না। পুষ্প-বীথিকার ছায়া সেখানে তার পাখা মেলে না। উৎসবের আনন্দ সমান ভাবেই পৃথিবীতে চলে কিন্তু যে গেল তার বিচ্ছেদের বেদনা কোথাও জাগ্রত হোয়ে থাকবে না—

"জানি জন্মদিন
এক অবিচ্ছিন্ন দিনে ঠেকিবে এমনি,
মিলে যাবে অচিহ্নিত কালের পর্য্যায়ে।
পুষ্প-বীথিকার ছায়া এ বিষাদে করে না করুণ,
বাজে না স্মৃতির ব্যথা অরণ্যের মর্মরে গুঞ্জনে।
নির্মম আনন্দ এই উৎসবের বাজাইবে বাঁশি
বিচ্ছেদের বেদনারে পথপার্শ্বে ঠেলিয়া ফেলিয়া।"

আবার দেখা যায় যে এই বিরাট স্পন্দনস্রোতকে অবলম্বন কোরে কবির চিত্ত যে

একটানা একদিকে ছুটে চলেছিল কদাচিৎ তার ব্যত্যয় হোয়ে তিনি তাঁর পূর্ব্ব জীবনে উপনিষদের সংস্কারের দিক দিয়ে সংসারকে বুঝতে চেষ্টা কোরেছেন। একটি কবিতায় তিনি বলছেন যে, তিনি চলেছেন সেই নামহীন সর্ব্ববিশেষণহীন মহাসত্তার মধ্যে। তাঁর ক্ষুদ্র চৈতন্য পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর সংগমে মিলিত হবে; তখন এই বাহ্য আবরণের কি গতি হবে। সে কি কালস্রোতের রূপান্তরে ভেসে বেড়াবে—তার খবর তিনি জানেন না—

"বার বার মনে মনে বলিতেছি, আমি চলিলাম
যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়,
নাই আর আছে
এক হোয়ে যেথা মিশিয়াছে।
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন।
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর সংগমে।
এই বাহ্য আবরণ জানি নাতো শেষে
নানারূপে রূপান্তরে কালস্রোতে বেড়াবে কি ভেসে।
আপন স্বাতন্ত্র্য হতে নিঃসক্ত দেখিব তারে আমি
বাহিরে বহুর সাথে জড়িত অজানা তীর্থগামী।"

আবার আর একটি কবিতায় তিনি বলছেন—

"কালের প্রবল আবর্ত্তে প্রতিহত
ফেনপুঞ্জের মতো,
আলোকে আঁধারে রঞ্জিত এই মায়া,
অদেহ ধরিল কায়া।

সত্তা আমার জানি না সে কোথা হতে
হোলো উত্থিত নিত্য-ধাবিত স্রোতে।
সহসা অভাবনীয়
অদৃশ্য এক আরম্ভ মাঝে কেন্দ্র রচিল স্বীয়।
বিশ্ব সত্তা মাঝখানে দিল উঁকি,
এ কৌতুকের পশ্চাতে আছে জানি না কে কৌতুকী।"

আবার একটী কবিতায় বলছেন যে, তাঁর চেতনার মধ্যে আদি সৃষ্টির বাণী ঝঙ্কৃত হোয়ে চলেছে। তার কি উদ্দেশ্য তা আমাদের অজ্ঞাত। কোনো সময় বা সেই শক্তি প্রকাশের মধ্য দিয়ে আপনার পরিচয় দেয়, কোনো সময় বা বাধারূপে সেই প্রকাশকে করে ব্যাহত। কোনো সময় সেই অজ্ঞাত অথবা দুর্লক্ষ্য যিনি তাঁর প্রতিচ্ছায়া আমাদের চেতনায় প্রকাশিত হোয়ে ওঠে। কোনো সময় বা বাধায় তা হয় বিড়ম্বিত। গতিভঙ্গের ভঙ্গীতে যা প্রকাশ হোয়েছিল তা যায় ঢেকে—

"মোর চেতনায়
আদি সমুদ্রের ভাষা ওঙ্কারিয়া যায়;
অর্থ তার নাহি জানি
আমি সেই বাণী।
শুধু ছল ছল কল কল,

* * * *

স্তব্ধ মৌনী অচলের বহিয়া ইশারা
নিরন্তর স্রোতোধারা
অজানা সম্মুখে ধায়, কোথা তার শেষ
কে জানে উদ্দেশ।
আলো ছায়া ক্ষণে ক্ষণে ফিরে যায়
ফিরে ফিরে স্পর্শের পর্য্যায়।

কভু দূরে কখনো নিকটে
প্রবাহের পটে
মহাকাল দুই রূপ ধরে
পরে পরে
কালো আর সাদা।
কেবলি দক্ষিণে বামে প্রকাশ ও প্রকাশের বাধা
অধরার প্রতিবিম্ব গতিভঙ্গে যায় এঁকে বেঁকে
গতিভঙ্গে যায় ঢেকে ঢেকে ॥"

সেঁজুতি

ভাদ্র, ১৩৪৫

জীবনের ভগ্নস্তূপের মধ্যে যেটুকু অমর, অরূপ, যেটুকু চিরদিনের সত্য তাকেই ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা এই সেঁজুতিতেই করা হয়েছে। প্রথমে "জন্মদিনে" কবিতাটিতে, কবি স্মরণ কোরেছেন প্রাচীন অতীতকে যেখানে পাওয়া যায় অরূপ প্রাণের জন্মভূমি। কবি বলছেন যে এই জীবনযাত্রা বহন কোরতে কোরতে অনেক তৃষ্ণা, অনেক ক্ষুধা, অনেক স্থূল ভিক্ষামুষ্টির আসক্তিতে নিজেকে পূর্ণ কোরেছেন, কিন্তু তথাপি তিনি জানেন যে সমস্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি মানুষ তাঁর মধ্যে রয়েছে যার মর্য্যাদা কেউ ক্ষুণ্ণ কোরতে পারে না। সেই যে আনন্দস্বরূপ অন্তরে রয়েছেন তাঁরই ভালবাসা কবির মধ্য দিয়ে সমস্ত প্রকৃতিতে সঞ্চারিত হয়েছে এবং ভাষায় ও ছন্দে তাকে অমৃত করে রাখতে তিনি চেষ্টা করেছেন। সেই অন্তরস্থ মানুষের মধ্যে সন্ধান পাওয়া গেছে অমৃতের, এই জীবন যখন শেষ হবে তখন হয়ত দূর যাত্রাপথে সেই চরম মানুষটির যথার্থ অর্থ প্রকাশিত

হবে। মানুষ যখন নিরাসক্ত হোয়ে নির্লোভ হয়ে পৃথিবীর সম্মুখে দাঁড়ায় তখনি সে এই প্রকৃতির যথার্থ অর্থ, লোভ ও লোলুপতা, হিংসা ও দ্বেষ মানুষের মধ্যে এনে দেয় কেবল ধ্বংসের ইতিহাস—

"প্রাচীন অতীত, তুমি
নামাও তোমার অর্ঘ্য; অরূপ প্রাণের জন্মভূমি
উদয়শিখরে তার দেখো আদিজ্যোতি। করো মোরে
আশীর্ব্বাদ, মিলাইয়া যাক তৃষ্ণাতপ্ত দিগন্তরে
মায়াবিনী মরীচিকা। ভরেছিনু আসক্তির ডালি
কাঙালের মতো, অশুচি সঞ্চয়-পাত্র করো খালি,
ভিক্ষামুষ্টি ধূলায় ফিরায়ে লও, যাত্রাতরী বেয়ে
পিছু ফিরে আর্ত্তচক্ষে যেন নাহি দেখি চেয়ে চেয়ে
জীবন-ভোজের শেষ উচ্ছিষ্টের পানে।"

যাবার মুখে কবিতাটিতে কবি বলেছেন যে অসীম আকাশে অসীম কালের বুকে যে প্রাণের কাঁপন অনাদিকাল নৃত্য কোরছে তারি আভাস পাওয়া যায় প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্যের মধ্যে, তার অর্থ মৃত্যুর সীমা ছাড়িয়ে যায়। সে সত্যেরই ছবি। সেই সত্যই চিরন্তন আমি হোয়ে আমার মধ্যে প্রকাশ পায়, সেই আমিই যথার্থ কবি। এই জীবনে আর যা কিছু আসে তাই মৃত্যুতে যায় ঢেকে, মৃত্যুতেই তার লয়, সেগুলির লয় হোলেও যে নিষ্কারণ মানুষটি গানে ও শিল্পের মধ্য দিয়ে অসীমের ইসারা আমাদের মনের কাছে পৌছে দেয় সেই মানুষটি বিশ্বপ্রাণেরই একটি সত্য স্বরূপ—

"যাক্ এ জীবন,
যাক্ নিয়ে যাহা টুটে যায়, যাহা
ছুটে যায়, যাহা
ধূলি হয়ে লোটে ধূলি' পরে, চোরা

মৃত্যুই যার অন্তরে, যাহা
রেখে যায় শুধু ফাঁক।
যাক্ এ জীবন পুঞ্জিত তার জঞ্জাল নিয়ে যাক্।
টুকরো যা থাকে ভাঙা পেয়ালার,
ফুটো সেতারের সুরহারা তার,
শিখা-নিবে-যাওয়া বাতি,
স্বপ্ন-শেষের ক্লান্তি বোঝাই রাতি ;—
নিয়ে যাক্ যত দিনে দিনে জমা করা
প্রবঞ্চনায় ভরা
নিষ্ফলতার সযত্ন সঞ্চয়।
কুড়ায়ে ঝাঁটায়ে মুছে নিয়ে যাক, নিয়ে যাক শেষ করি'
ভাঁটার স্রোতের শেষ-খেয়া দেওয়া তরী।

অসীম আকাশে যে প্রাণ-কাঁপন অসীম কালের বুকে
থাকে অবিরাম, তাহারি বারতা শুনেছি ওদের মুখে।
যে মন্ত্রখানি পেয়েছি ওদের সুরে
তাহার অর্থ মৃত্যুর সীমা ছাড়ায়ে গিয়েছে দূরে।
সেই সত্যেরি ছবি
তিমির প্রান্তে চিত্তে আমার এনেছে প্রভাত-রবি।
সে রবিরে চেয়ে কবির সে বাণী আসে অন্তরে নামি'—
'যে আমি রয়েছে তোমার আমার সে আমি আমারি আমি'
সে আমি সকল কালে,
সে আমি সকল খানে,
প্রেমের পরশে যে অসীম আমি বেজে ওঠে মোর গানে।"

"অমর্ত্ত্য" কবিতাটিতে কবি বলছেন যে কবির মন নিত্যকাল বাহিরের প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় শোভা ও সৌন্দর্য্যের প্রীতিতে নিমগ্ন হোয়ে রয়েছে। দেহের অতীত যেন আর কোনো একটা দেহ বস্তুর বাঁধনকে ছিন্ন কোরে বিপুল অনুভূতিময় হোয়ে আনন্দময় দ্যুতিতে তাঁর গানের মধ্যে প্রকাশ লাভ কোরেছে। প্রকৃতির প্রতি প্রীতির গভীরতার মধ্যে সেই অদেহী দেহের ইঙ্গিতই প্রকাশ পাচ্ছে, আর মৃত্যুর পর এই দেহই তার অমর হোয়ে থাকবে। এইটিই হোচ্ছে রবীন্দ্রনাথের "অতিরিক্ত মানুষ" বা "surplus man"—

"যে দেহেতে রূপ নিয়েছে অনির্ব্বচনীয়
সকল প্রিয়ের মাঝখানে যে প্রিয়,
পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে
কেবল রসে, কেবল সুরে, কেবল অনুভাবে।"

"পলায়নী" কবিতাটিতে বিশ্বের চঞ্চল দিকটিকে স্পষ্ট কোরে বর্ণনা করা হোয়েছে। এ বিশ্বে যাকিছু আমরা দেখতে পাই সমস্তই ছুটে চলেছে অব্যক্তের দিকে; কোনো কিছুকে চিরস্থায়ী করার মোহতেই দুঃখ, যা আছে সব ভেসে যাবে কিছু টিকবে না—

"ওরে মন, তুই চিন্তার টানে
বাঁধিস্‌নে আপনারে,
এই বিশ্বের সুদূর ভাসানে
অনায়াসে ভেসে যারে॥
কী গেছে তোমার কী হয়েছে আর
নাই ঠাঁই তার হিসাব রাখার,
কী ঘটিতে পারে জবাব তাহার
নাইবা মিলিল কোনো।
ফেলিতে ফেলিতে যাহা ঠেকে হাতে,
তাই পরশিয়া চলো দিনে রাতে,

যে সুর বাজিল মিলাতে মিলাতে
তাই কান দিয়ে শোনো ॥"

কবি স্মরণ কবিতাটিতে বলেছেন যে তিনি কিছুই চান্‌নি কিছুই রাখেন নি। ভালোমন্দের কোনো জঞ্জাল আর নেই। চলে যাওয়া ফাল্গুনের ঝরা ফুলের মধ্যে ক্ষণকাল আসন পেতেছিলেন মাত্র। তাঁর যথার্থ স্বরূপ রয়েছে সৌন্দর্য্য শোভায় পরিপূর্ণ ভাষাহীন তরুলতা বনস্পতিদের মধ্যে—

"দিই নাই, চাই নাই রাখিনি কিছুই
ভালোমন্দের কোনো জঞ্জাল,
চলে-যাওয়া ফাগুনের ঝরা ফুলে ভূঁই
আসন পেতেছে মোর ক্ষণকাল।

* * * *

যে আমি চায়নি কারে ঋণী করিবারে,
রাখিয়া যে যায় নাই ঋণভার
সে আমারে কে চিনেছ মর্ত্ত্য কায়ায়
কখনো স্মরিতে যদি হয় মন,
ডেকোনা ডেকোনা, সভা, এসো এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শাল বন ॥"

"ঘরছাড়া" কবিতাটিতে এই ভাবেরই একটি প্রতিধ্বনি উঠছে—

"পথিক চলিল একা
অচেতন অসংখ্যের মাঝে।
সাথে সাথে জনশূন্য পথ দিয়ে বাজে
রথের চাকার শব্দ হৃদয়বিহীন ব্যস্ত সুরে
দূর হোতে দূরে।"

"জন্মদিন" কবিতাটিতে কবি আবার তাঁর পুরাণো ভাবকেই অভিব্যক্ত কোরছেন, বলছেন যে তাঁর যথার্থ স্বরূপটি হোচ্ছে এইখানে যে তিনি পৃথিবীকে ভালবাসতেন। তাঁর এই আনন্দরূপই যথার্থ অমৃত ও সত্য—

"তাহারে ডাক দিয়েছিল পদ্মানদীর ধারা,
কাঁপন-লাগা বেণুর শিরে দেখেছি শুকতারা;
কাজল-কালো মেঘের পুঞ্জ সজল সমীরণে
নীল ছায়াটি বিছিয়েছিল তটের বনে বনে;
ও দেখেছে গ্রামের বাঁকা বাটে
কাঁখে কলস মুখর মেয়ে চলে স্নানের ঘাটে,
সর্ষে তিষির ক্ষেতে
দুই-রঙা স্বর মিলেছিল অবাক আকাশেতে;
তাই দেখেছে চেয়ে চেয়ে অস্তরবির রাগে
বলেছিল, এই তো ভালো লাগে।
সেই যে ভালোলাগাটি তার যাক্ সে রেখে পিছে
কীর্ত্তি যা সে গেঁথেছিল, হয় যদি হোক মিছে;
না যদি রয় নাই রহিল নাম,
এই মাটিতে রইল তাহার বিস্মিত প্রণাম॥"

আবার "প্রাণের দান" কবিতাটিতে তিনি বলেছেন—

"অব্যক্তের অন্তঃপুরে উঠেছিল জেগে,
তার পর হতে শুরু, কী ছেলে খেলায়
নিজেরে ঝরায়ে চলো, চলাহীন বেগে,
... ...
মৃত্যুর উৎসাহ সেও অফুরন্ত বুঝি
জীবনের বিত্তনাশ করে পদে পদে।

পরিতাপ হীন আত্মক্ষতি
মিটায় জীবনযজ্ঞে মরণের ক্ষুধা।
এমনই মৃত্যুর সাথে হোক মোর চেনা,
প্রাণেরে সহজে তার করিব খেলেনা।"

এই সমস্ত কবিতার মধ্য দিয়ে কবি তাঁর সম্ভাব্যমান আসন্ন মৃত্যুকে নিজের কাছে সহজ কোরে নিতে চাচ্ছেন, মৃত্যুকে নানারূপে দেখে তার তত্ত্বকে উপলব্ধি কোরে মৃত্যুর ভয় থেকে আপনাকে মুক্ত কোরতে চাচ্ছেন।

আবার "নিঃশেষ" কবিতাটিতে বলছেন—

"তবু যদি চাও শেষ দান তার পেতে,
ঐ দেখো ভরা ক্ষেতে
পাকা ফসলে দোদুল্য অঞ্চলে
নিঃশেষে তার সোনার অর্ঘ্য রেখে গেছে ধরাতলে।
সে কথা স্মরিয়ো, চলে যেতে দিয়ো তারে,
লজ্জা দিয়োনা নিঃস্বদিনের নিঠুর রিক্ততারে।"

আবার "প্রতীক্ষা" কবিতাটিতে তিনি বলছেন যে মহাকালের মধ্যে যে মহা সত্য আছে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তারই দর্শন আমরা নূতন কোরে পাব—

"যার পরিচয় কারো মনে নাই,
যার নাম কভু কেহ শোনে নাই,
না জেনে নিখিল পড়ে আছে পথে
যার দরশন মাগি'—
তারি সত্যের অপরূপ রসে
চমকিবে মন অদ্ভূত পরশে,
মৃত পুরাতন জড় আবরণ
মুহূর্ত্তে যাবে ভাগি,'

যুগ যুগ ধরি' তাহার আশায়

মহাকাল আছে জাগি।"

"পালের নৌকা" কবিতাটিতে কবি বলছেন—

"বারেক ফেলা বারেক তোলা ফেলতে ফেলতে যাওয়া

একেই বলে জীবনতরীর চলন্ত দাঁড় বাওয়া।

তাহার পরে রাত্রি আসে, দাঁড়টানা যায় থামি,

কেউ কারেও দেখতে না পায় আঁধার তীর্থগামী।"

আরেকটি কবিতায় কবি বলছেন যে সত্যের যথার্থ রূপ কোনো সময় হয়ত আবছায়ার মত একটু স্পর্শ দিয়ে গিয়েছে কিন্তু তাকে স্পষ্ট কোরে জানা যায় নি। মর্ত্যের বুকে তিনি রয়েছেন অমৃত পাত্রে ঢাকা—

"তারি আহ্বানে সাড়া দেয় প্রাণ, জাগে বিস্মিত সুর,

নিজ অর্থ না জানে।

ধূলিময় বাধা বন্ধ এড়ায়ে চলে যায় বহু দূর

আপনারি গানে গানে।"

অনেক কুশ্রীতা অনেক গ্লানি অনেক হিংসা তিনি দেখেছিলেন তথাপি চিরন্তন শান্ত শিবের বাণী তিনি শুনতে পেতেন। যা জানবার তা কিছু জানা হয় নি, ছুটেছেন অজানা না-পাওয়ার পেছনে, তারই আনন্দে বিশ্ব নৃত্যলীলায় তিনি মেতে উঠেছেন এবং বিশ্বাস করেন—

"সেই ছন্দেই মুক্তি আমার পাব,

মৃত্যুর পথে মৃত্যু এড়িয়ে যাব",

তারপরে এই জীবনে কি অবশিষ্ট থাকবে তা বলা কঠিন—

"কি আছে জানি না দিন অবসানে মৃত্যুর অবশেষে;

এ প্রাণের কোনো ছায়া

শেষ আলো দিয়ে ফেলিবে কি রং অস্ত-রবির দেশে,

রচিবে কি কোনো মায়া।

জীবনেরে যাহা জেনেছি, অনেক তাই,
সীমা থাকে থাক, তবু তার সীমা নাই।
নিবিড় তাহার সত্য আমার প্রাণে
নিখিল ভুবন ব্যাপিয়া নিজেরে জানে ॥"

রোগশয্যায়

১৩৪৭, পৌষ

প্রাণ যেমন অনিঃশেষ, মৃত্যুও তেমনি অনিঃশেষ, অবিশ্রাম খেয়া বেয়ে নামহীন সমুদ্রের দিকে আমাদের যাত্রা—অলক্ষের খেয়া পাড়ি দেওয়া, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রাণ চলেছে এই রকমে। মৃত্যুর কবলে এসে যা একান্তভাবে ফুরিয়ে যায় বলে মনে হয় তারও কিছু বাকি থাকে। সেই বাকির ফাঁকের মধ্য দিয়ে চলে আবার জীবনের যাত্রা, তার লাভও যেমন অফুরাণ তার ক্ষতিও তেমনি অফুরাণ। অবিশ্রাম অপচয়ে সঞ্চয়ের আলস্য যায় ঘুচে তাতেই আসে শক্তি—

"চলমান রূপহীন যে বিরাট, সেই
মহাক্ষণে আছে তবু ক্ষণে ক্ষণে নেই,
স্বরূপ যাহার থাকা আর নাই থাকা,
খোলা আর ঢাকা
কী নামে ডাকিব তারে অস্তিত্ব প্রবাহে
মোর নাম দেখা দিয়ে মিলে যাবে যাহে ॥"

বিশ্বনাথ অজস্র দিনের আলো দিয়ে দুই চক্ষুকে পূর্ণ কোরেছিলেন নানারূপে। তাঁর এ ঋণ শোধ দেবার সময় যখন হয় তখন নানা রোগের মধ্য দিয়ে সে সংবাদ তিনি আমাদের জানিয়ে দেন। কবি বলছেন যে এই সংসারে আমরা অতিথি মাত্র। যেথায় বিশ্বনাথের রথ চলেছে সেইখানেই তিনি রচনা কোরবেন

তাঁর জগৎ। অর্থাৎ এই পৃথিবীর সমস্ত ছেড়ে দিয়ে তবু এর যা কিছু বাকি থাকে তাই দিয়ে মহাযাত্রার অনুকূল যাত্রাপথ তাঁর চিত্তে নেবেন এঁকে—

"যেথা তব রথ
শেষ চিহ্ন রেখে যায় অন্তিম ধূলায়
সেথায় রচিতে দাও আমার জগৎ।
অল্প কিছু আলো থাক্
অল্প কিছু মায়া।
ছায়াপথে লুপ্ত আলোকের পিছু
হয়তো কুড়ায়ে পাবে কিছু—
কণামাত্র লেশ
তোমার ঋণের অবশেষ॥"

মহাকালের মধ্যে সৃষ্টির যে নানা ব্যর্থ চেষ্টা চলেছিল তার আভাস পাওয়া যায় যখন প্রবল রোগের আঘাতে নানা দুঃখ ও বেদনার মধ্য দিয়ে দেহ ফিরিয়ে আনতে চায় তার স্বস্থতাকে। এই বিরূপ কদর্য্য দেহ মৃত্যুর পর হয়ত বা কি নব কলেবরে আবার সমুত্থিত হবে,—

"আদিমহার্ণব গর্ভ হোতে
অকস্মাৎ ফুলে ফুলে উঠিতেছে
প্রকাণ্ড স্বপ্নের পিণ্ড
বিকলাঙ্গ অসম্পূর্ণ—
অপেক্ষা করিছে অন্ধকারে
কালের দক্ষিণ হস্তে পাবে কবে পূর্ণদেহ,
বিরূপ কদর্য্য নেবে সুসংগত কলেবর
নব সূর্য্যালোকে,
মূর্তি কার দিবে আসি মন্ত্র পড়ি,
ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিবে বিধাতার অন্তর্গূঢ় সংকল্পের ধারা॥"

জীবনের রঙ্গভূমিতে নানা প্রাণী অপর্য্যাপ্ত শক্তির সম্বলে দলে দলে উঠেছে এবং তলিয়ে গেছে। সেই শক্তির সম্বলই ছিল তার ভ্রম, তার অপরাধ তাই ক্রমে অসহ্য হোয়ে তার মহা ভারকে দিয়েছে লুপ্ত কোরে। এই বিশ্বের কোনখানে যেন দারুণ একটি অক্ষমা সর্ব্বদা উপচিত হোয়ে উঠছে। দৃষ্টির অতীত যে ত্রুটি তাও সে সহ্য করে না। সম্বন্ধের দৃঢ় সূত্র সে ছিন্ন করে। পুরাতন প্রাণকে ধ্বংস কোরে আবার নূতন প্রাণকে বরণ কোরে আনে······

"হে অক্ষমা,
সৃষ্টির বিধানে তুমি শক্তি যে পরমা
শান্তির পথের কাঁটা তব পদাঘাতে
বিদলিত হয়ে যায় বার বার আঘাতে আঘাতে ॥"

নানা বিপ্লবের মধ্যে এই বিশ্ব যে একটি অসীম সামঞ্জস্যে পূর্ণ হোয়ে রয়েছে একথাটি কবি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি কোরতে পেরেছিলেন—

"আমি কবি তর্ক নাহি জানি,
এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে—
লক্ষ কোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে
বহন করিয়া চলে প্রকাণ্ড সুষমা,
ছন্দ নাহি ভাঙে তার সুর নাহি বাধে,
বিকৃতি না ঘটায় স্খলন ;
ঐ তো আকাশে দেখি স্তরে স্তরে পাপড়ি মেলিয়া
জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপ ॥"

কবি যখন আরোগ্যের পথে তখন এই সত্যটি তাঁর মনে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় এসে প্রতিভাত হোলো যে কল্প আরম্ভের প্রথম মুহূর্ত্তখানি যেন তাঁর কাছে উদ্ভাসিত হোয়েছে। যেন তাঁর এই একটি জন্ম নব নব জন্মসূত্রে গাঁথা। একটি দৃষ্টের অন্তঃপুরে অদৃশ্য হোয়ে চলেছে অনেক সৃষ্টিধারা—

"কল্প আরম্ভের
অন্তহীন প্রথম মুহূর্ত্তখানি
প্রকাশ করিল মোর কাছে ;
বুঝিলাম, এই এক জন্ম মোর
নব নব জন্মসূত্রে গাঁথা।
সপ্তরশ্মি সূর্য্যালোক সম
একদৃশ্য বহিতেছে
অদৃশ্য অনেক সৃষ্টিধারা ॥"

আর একটি কবিতায় কবি বলছেন—

"ক্ষুদ্র যত বিরুদ্ধ প্রমাণে
মহানেরে খর্ব করা সহজ পটুতা,
অন্তহীন দেশ কালে পরিব্যাপ্ত সত্যের মহিমা
যে দেখে অখণ্ডরূপে
এ জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক ॥"

আর একটি কবিতাতে কবি বলছেন যে তাঁর কীর্ত্তিকে তিনি বিশ্বাস করেন না। দিনে দিনে তা হবে বিনষ্ট। তবে তিনি যে এই পৃথিবীকে ভালবেসেছিলেন এইটিই হচ্ছে চরম সত্য—

"আমি জানি—যাব যবে
সংসারের রঙ্গভূমি ছাড়ি
সাক্ষ্য দেবে পুষ্পবন ঋতুতে ঋতুতে
এ বিশ্বেরে ভালবাসিয়াছি।
এ ভালোবাসাই সত্য, এ জন্মের দান।
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার ॥"

আর একটি কবিতাতে তিনি বলছেন—

"ভালোবাসা যা পেয়েছি আমার জীবনে,
তাহারি নিঃশব্দ ভাষা
শুনি এই আকাশে বাতাসে ;
তারি পুণ্য অভিষেকে করি আজ স্নান।
সমস্ত জন্মের সত্য একখানি রত্নহার রূপে
দেখি ঐ নীলিমার বুকে ॥"

আবার আর একটি কবিতায় তিনি বলছেন যে মানবচিত্তের সাধনায় যে সত্যের রূপ গূঢ় আছে সেই সত্য সুখ দুঃখের অতীত। যারা জীবনে এই সাধনায় ব্রতী তাঁরাই মানবসৃষ্টির চরম লক্ষ্য আর সমস্তই মায়ার ছায়া মাত্র। সেই সাধকদের পক্ষে দুঃখ ও সুখ কোনোটাই সত্য নয়। তাঁদের ইতিহাসে তার কোনো চিহ্ন থাকে না। আর একটি কবিতাতে কবি অতি সুন্দর ভাবে তাঁর জীবনের তত্ত্ব দৃষ্টিকে এবং মূল প্রার্থনাটিকে ব্যক্ত কোরেছেন—

"তীরে তীরে অতীত কীর্ত্তির পানে
ফিরে ফিরে না যেন তাকাই ;
সুখে দুঃখে নিরন্তর
লিপ্ত হোয়ে আছে যে আপনা
আপন—বাহিরে তারে স্থাপন করিতে যেন পারি
সংসারের শত লক্ষ ভাসমান ঘটনার সমান শ্রেণীতে,
নিঃশঙ্ক নিঃস্পৃহ চোখে দেখি যেন তারে
অনাত্মীয় নির্ব্বাসনে ;
এই শেষ কথা মোর,
সম্পূর্ণ করুক মোর পরিচয় অসীম শুভ্রতা ॥"

আরোগ্য

ফাল্গুন, ১৩৪৭

আরোগ্য গ্রন্থখানিতে একটী কবিতায় কবি জগতের মধ্যে আমাদের চারিদিকে যে সমস্ত নানা দৃশ্য ছুটে চলেছে সেগুলিকে আতসবাজীর সঙ্গে উপমা দিয়েছেন, আবার বলেছেন যে এই চারিদিকের খেলা এ সমস্তই যেন মায়া। দৃশ্য-চিত্রগুলি যেন সাজঘরের নটনটির নৃত্য। এর পিছনে রয়েছেন স্তব্ধ নটরাজ—

"বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে
আতশবাজির খেলা আকাশে আকাশে
সূর্য্য তারা ল'য়ে
যুগযুগান্তের পরিমাণে।
অনাদি অদৃশ্য হতে আমিও এসেছি,
ক্ষুদ্র অগ্নিকণা নিয়ে
এক প্রান্তে ক্ষুদ্র দেশে কালে।

*　　*　　*

ছায়াতে পড়িল ধরা এ খেলার মায়ার স্বরূপ,
শ্লথ হয়ে এল ধীরে
সুখ দুঃখ নাট্যসজ্জাগুলি,
দেখিলাম, যুগে যুগে নটনটি বহু শত শত
ফেলে গেছে নানা রঙা বেশ তাহাদের
রঙ্গশালা—দ্বারের বাহিরে।
দেখিলাম চাহি
শত শত নির্ব্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্য প্রাঙ্গণে
নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী।"

বলা বাহুল্য যে এইভাবে জগৎকে দেখা কবির পক্ষে একটু নূতন। জগৎকে "Magic phantom shades that come and go" এইভাবে দেখতে কবি অভ্যস্ত নন, নৈবেদ্য গ্রন্থে কবি লিখেছেন—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়"

কিন্তু শেষের জীবনের কাব্যগুলি আলোচনা কোরলে দেখা যায় যে শুধু দেহ সম্বন্ধে নয় খ্যাতি যশ প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই কবি বৈরাগ্য-ভাবাপন্ন হোয়েছেন। তিনি খুঁজে বেড়িয়েছেন তাঁর আনন্দ স্বরূপ কোন্‌টি। এই জগৎকে যে তিনি ভালবেসেছেন এবং গানে ও ছন্দে যে সেই প্রীতিকে রূপ দিয়েছেন তাঁর সেই আমিটি যথার্থ স্থায়ী আমি। আর একটি কবিতাতে তিনি বলেছেন যে তরুণ বয়সে যখন ভালবাসা হৃদয়ে এসেছিল তখন সে ভালবাসা ছিল বাতাসের মতন ধৈর্য্যহীন, অপরিচয়ের সঙ্গে সে ঘনিয়ে আনত পরিচয়, অভাবিত রহস্যের ভাষায়। চারিদিকে যাহা স্থির, পরিমিত এবং নিত্যপ্রত্যাশিত তারই মধ্যে সে আপনাকে দিত উন্মুক্ত কোরে কিন্তু আজ পরিণত বয়সে সেই ভালবাসা স্নিগ্ধ সান্ত্বনার স্তব্ধতায় স্থির হোয়ে রয়েছে—

"আজ সেই ভালোবাসা স্নিগ্ধ সান্ত্বনার স্তব্ধতায়
রয়েছে নিঃশব্দ হয়ে প্রচ্ছন্ন গভীরে।
চারিদিকে নিখিলের বৃহৎ শান্তিতে
মিলেছে সে সহজ মিলনে,
তপস্বিনী রজনীর তারার আলোয় তার আলো,
পূজারত অরণ্যের পুষ্প অর্ঘ্যে তাহার মাধুরী।"

আবার আর একটি কবিতায় সংসার থেকে বিদায় নেওয়ার আগে নিত্যের যে শান্তিরূপ আছে, এ জন্মের যে সত্য অর্থ এবং পরিচয় আছে তাকে স্পষ্ট করে দেখবার জন্য কবি আর্ত্তি প্রকাশ করেছেন—

"এ আমির আবরণ সহজে খলিত হয়ে যাক,
চৈতন্যের শুভ্রজ্যোতি

ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।
সর্ব্ব মানুষের মাঝে
এক চির মানবের আনন্দ কিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকিরিত।
সংসারের ক্ষুব্ধতার স্তব্ধ ঊর্ধ্বলোকে
নিত্যের যে শান্তিরূপ তাই যেন দেখে যেতে পারি।"

শেষ লেখা

ভাদ্র, ১৩৪৮

শেষ লেখা গ্রন্থখানিতে কবি বলছেন যে এ সংসারের সমস্তই পরিবর্ত্তনের বেগে চলেছে, এ হোচ্ছে কালের ধর্ম্ম। কিন্তু মৃত্যু আসে একান্ত অপরিবর্ত্তনে তাই সে সত্য নয়। এ বিশ্বের মধ্যে আমরা আছি বলে যাকে জানি সেই হোচ্ছে আমাদের অস্তিত্বের প্রধান সাক্ষ্য। পরম আমির সত্যে তার সত্যতা—

"সব-কিছু চলিয়াছে নিরন্তর পরিবর্ত বেগে,
সেই তো কালের ধর্ম।
মৃত্যু দেখা দেয় এসে একান্তই অপরিবর্তনে
এ-বিশ্বে তাই সে সত্য নহে,
এ-কথা নিশ্চিত মনে জানি।

বিশ্বেরে যে জেনেছিল আছে ব'লে
সেই তার আমি
অস্তিত্বের সাক্ষী সেই,
পরম আমির সত্যে সত্য তার
এ-কথা নিশ্চিত মনে জানি ॥"

আর একটা কবিতাতে তিনি বলছেন যে জীবনের স্বরূপ অচিন্তনীয়। জীবন উঠছে একটা অজ্ঞেয় রহস্য থেকে এবং প্রকাশলাভ করেছে একটা অলক্ষিত পথ দিয়ে। এ সংসারে যা কিছুতে আমরা আনন্দ পাই, যা কিছু রেখে যায় তার স্পর্শ আমাদের অন্তরে, সে সমস্তই আমাদের অজ্ঞাতে আমাদের জীবনকে পূর্ণ কোরে তোলে এবং জীবনের সমাপ্তির দিকে সেই অন্তরের রূপকার যেন এই সমস্ত আবরণের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজের ছবিটিকে স্পষ্ট কোরে দেখতে পান—

"জন্মের প্রথম গ্রন্থে নিয়ে আসে অলিখিত পাতা,
দিনে দিনে পূর্ণ হয় বাণীতে বাণীতে
আপনার পরিচয় গাঁথা হয়ে চলে
দিনশেষে পরিস্ফুট হয়ে উঠে ছবি,
নিজেরে চিনিতে পারে
রূপকার নিজের স্বাক্ষরে,
তারপরে মুছে ফেলে বর্ণ তার রেখা তার
উদাসীন চিত্রকর কালো কালি দিয়ে;
কিছু বা যায় না মোছা স্বর্বর্ণের লিপি
ধ্রুবতারকার পাশে জাগে তার জ্যোতিষ্কের লীলা ॥"

আমাদের বাহিরে যে অন্তর্য্যামী পুরুষ রয়েছেন তিনি জগতের সৃষ্টি-ধারার মধ্য দিয়ে নানা বিচিত্র সৌন্দর্য্যের লাবণ্যের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন আত্ম-প্রকাশ কোরেছেন, অপরদিকে তেমনি আমাদের অন্তরের অন্তর্য্যামী পুরুষরূপে আমাদের চেতনা রূপে নিজেকে প্রকাশ কোরেছেন। এই চেতনার মধ্য দিয়ে

চলেছে বাহিরের ও অন্তরের মিলন। একই অন্তর্যামী পুরুষের দুইটি প্রকাশ এবং দুইরূপের মধ্য দিয়ে তাঁর লীলা পরিস্ফুট হচ্ছে। দুইটি রূপই একই অন্তর্যামীর রূপ সেইজন্যে বাহিরের রূপ অন্তরের রূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়ে আপন সার্থকতা লাভ করে। অন্তরের রূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতে গেলেই অন্তরের যে পৃথক সম্পত্তি, পৃথক দান, তাহার সহিত যুক্ত হোয়ে বাহিরের রূপটির একটি নূতন আবির্ভাব ঘটে। প্রকৃতি যা আমাদের দেয় আমরা প্রকৃতিকে শুধু তা ফিরিয়ে দিই নে, তাকে অনেক গুণে সুন্দর ও শোভন করে ফিরিয়ে দিই। বাহিরে যা ছিল চঞ্চল তা আমাদের মধ্যে এসে অন্তঃশিল্পের দ্বারা একটা চিরন্তনত্ব লাভ করে। বাহিরের যে ক্রিয়া-স্রোত চলেছে তা একটা স্তরে এসে আপনাকে জীবস্রোতরূপে পরিণত করে। নানা পশুপক্ষী পতঙ্গের মধ্য দিয়ে এই জীবস্রোত ছুটে চলেছে। কিন্তু সেখানে যতটুকু চেতনার আভাস আছে তা'তে কোনো স্বাধীন কর্তৃত্ব নাই। তাই সেখানকার প্রকাশ instinctএর দ্বারা সীমাবদ্ধ। পাখীর গলায় সুর আছে সেই সুর বিভিন্ন পক্ষীর কণ্ঠে বিভিন্নরূপ। কিন্তু প্রত্যেকটি সুরই প্রত্যেক পাখীর কণ্ঠের দ্বারা সীমাবদ্ধ, তাতে ব্যক্তিত্ব নেই, কর্তৃত্ব নেই, শিল্প নেই। মানুষের মধ্যে এসেই চেতনার প্রকাশ শিল্পরূপে আপনার পরিচয় দিতে পারে। পাখীর গলায় সুর আছে কিন্তু মানুষ গান গায়। এই গান গাওয়ার মধ্য দিয়ে মনুষ্যলোকের চেতনার একটা নূতন দান, একটা নূতন কর্তৃত্ব, একটা নূতন প্রকাশ আপনাকে ব্যক্ত কোরতে পারে, অথচ এই প্রকাশ কোনো-রূপ জৈব প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত নয়। নিষ্প্রয়োজনের আনন্দ থেকে এই সৃষ্টির উৎস উৎসারিত হয়। জৈব প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত আমাদের যে আমি আছে তাকে ছাড়িয়ে রয়েছে আমাদের মধ্যে একটি অতিরিক্ত আমি, একটি আনন্দরূপ আমি, সেই আমিরই সৃষ্টি প্রকাশ পায় শিল্পে ও সাহিত্যে। বাহিরের জগতের যে অন্তর্যামী নিরন্তর নানারূপ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ কোরে চলেছেন তাঁরই মধ্যে চলেছে এই নিষ্প্রয়োজনের আনন্দের সৃষ্টি, সেইজন্য আমাদের এই অতিরিক্ত আমির সঙ্গে বাহিরের রূপকার আমি রয়েছে।

এই উভয়ের মধ্যে ঐক্য অনুভব কোরতে পারি। এইজন্য কবি অনেক স্থলে বলেছেন যে এই দেহটা ঝরে পড়লে এবং এই দেহের সঙ্গে যুক্ত হোয়ে রয়েছে যে খ্যাতি, কীর্ত্তি, যশ, মান, লোভ, হিংসা, দ্বেষ সেগুলি ঝরে পড়লে যেটি বাকী থাকবে সেটি হচ্ছে এই আনন্দরূপ আমি। এই আমি নিত্য আমি। একটি মহাসত্তার বিকাশে আমাদের মধ্যে এই আনন্দময় প্রকাশ দেশকালকে অতিক্রম কোরে মৃত্যুকে অতিক্রম কোরে অমৃত হোয়ে রয়েছে। পরবর্ত্তী কাব্যগ্রন্থগুলির অনেক কবিতার মধ্যেই কবি এই কথাটি প্রকাশ কোরতে চেয়েছেন যে তিনি যে পৃথিবীকে ভালবাসেন, মানুষকে ভালবাসেন, সেই ভালবাসার মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর আনন্দস্বরূপ, সেইটিই তাঁর অমৃতস্বরূপ, সেইটিই থাকবে অমর হোয়ে। আর যা কিছু পেয়েছেন চারিদিকের মাটি থেকে তা তিনি ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন।

বলাকা থেকে আরম্ভ কোরে দেখতে পাই যে আমাদের চারিদিকের জগৎ এবং আমাদের অন্তরের জগৎ উভয়েই যেন দুইটি ধারার একটি মহাকর্ম্মস্রোত বা স্পন্দস্রোত বা ক্রিয়া-প্রবাহ। অতীত বর্ত্তমান ও অনাগতকে ব্যাপ্ত কোরে এই কর্ম্ম-ধারা তাহার নিরুদ্দিষ্ট গতিতে ছুটে চলেছে। এই জন্যই কবির কাব্যে তরী ভাসাবার উপমাটা, ঘাটে অঘাটের উপমাটা, এপারে ওপারের উপমাটা নানাভাবে ব্যবহৃত হোয়েছে। এই ক্রিয়া-স্রোতের যথার্থ স্বরূপ কি তাহা নির্ণয় করা যায় না। তবে এই স্রোতের গতিকে যখন আমরা অতীত ও ভবিষ্যৎ থেকে পৃথক কোরে শুধু বর্ত্তমানের মধ্যে সংহত কোরে দেখি তখনই আমরা দেখি বস্তু, আমরা দেখি সীমা, কিন্তু যথার্থত এই মহাগতি স্রোত থেকে তার একটি খণ্ডকে পৃথক কোরে দেখা যায় না। এই জন্যে কবি সকল সময়ে বলেন, সে সীমার মধ্যে অসীম এবং অসীমের মধ্যে সীমা, এই সীমা অসীমার সম্পর্কের মধ্যে এই জন্যে কোনো অস্পষ্টতা বা হেঁয়ালি নেই। অসীম যেমন সীমার মধ্য দিয়ে খণ্ডের মধ্য দিয়ে আমাদের চোখে প্রকাশিত হোচ্ছেন তেমনি একটু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে গেলে আমরা বুঝতে পারি যে প্রত্যেক সীমাবদ্ধ খণ্ডও ক্ষুদ্র অতীত ও ভবিষ্যৎকে নিয়ে

আপন ইতিহাস রচনা কোরেছে এবং আপনাকে প্রকাশ কোরে চলেছে। আমাদের নিজেদের মধ্যেও আমরা দেখি যে যেটুকুকে আমরা আমাদের বর্ত্তমান-কালের আমি বলে থাকি, সেটুকু প্রকাশ পাচ্ছে একটি অস্পষ্ট ছায়ালোকের মধ্য দিয়ে, আমাদের বর্ত্তমান আমিটুকু সেই অস্পষ্ট ছায়ালোকের ঈষৎ অভিব্যক্তি মাত্র। আমাদের সমস্ত আমিটা তার অভিব্যক্ত অংশ থেকে অনেক দূরে রয়েছে ছড়িয়ে। সমস্ত জীবন ভরে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নানা অনুভূতির মধ্য দিয়ে এই অস্পষ্ট ছায়ালোকটি আপনাকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ অভিব্যক্ত করে চলেছে। যে অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎরূপে এই বর্ত্তমান আমিটির চরম প্রকাশ ঘটবে সেইটিই হচ্ছে আমাদের ideal আমি বা রবীন্দ্রনাথের মানসী। এই কর্ম্মস্রোতের সত্তার মধ্যে যখন সমস্ত বর্ত্তমানকে নিমগ্ন করে দেখতে পারি তখন সেইটিই হচ্ছে সীমার অসীম রূপ। তখন আমরা সীমার মোহকে, বস্তুব মোহকে, ক্ষণিকের মোহকে আমাদের এই ছোট-আমির মোহকে অতিক্রম করতে পারি, তবু সীমার মধ্যে যে রূপ প্রকাশ পায় তা মিথ্যা নয়। আমাদের ভালবাসাও যেমন সত্য আমাদের মোহও তেমনি সত্য। কিন্তু অসীমার perspective-এ দেখলে সীমার রূপ পরিবর্ত্তিত হয়। সেই পরিবর্ত্তিত রূপও সীমা ও অসীমা উভয়কেই ব্যাপ্ত করে রয়েছে এবং সেই জন্যই তাহাও সত্য। আমাদের চারিদিকের জগৎ যেমন নানা বস্তুতে সমাকীর্ণ ভাবে দেখি, আমাদের অন্তরের মধ্যেও স্মৃতিতে অনুভূতিতে আমরা আমাদের চৈত্ত জীবনের বিশৃঙ্খল ভাবে, বিপর্য্যস্ত ভাবে, নানা বস্তু দেখতে পাই। কেবল মাত্র প্রবাহের মধ্য দিয়েই আমরা তাদের একটা ঐক্য সম্পাদন করতে পারি, নানা রকমে নানা ছবিতে। কবির শেষ পর্য্যায়ের কাব্যগুলিতে এই সত্যানুভূতিটি ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। কোন জায়গায় হয়ত তিনি বিশৃঙ্খল ভাবে বিপর্য্যস্ত নানা ঘটনার ছবি দিয়েছেন, কিন্তু তার মধ্য দিয়ে এই ইঙ্গিতটিই প্রচ্ছন্নভাবে দ্যোতিত হয়েছে যে পৃথক পৃথক ভাবে দেখলে দেখা যায় যে প্রত্যেকটি বস্তুই যেন সম্পর্ক-বিহীন বিপর্য্যস্ত ঘটনা মাত্র, কিন্তু মহাকাল প্রবাহের মধ্য দিয়ে যে ক্রিয়াস্রোত প্রকাশ পাচ্ছে সেই দৃষ্টিতে দেখলে সে সমস্তগুলি যেন একটি অখণ্ড অর্থে সার্থক

হয়ে ওঠে। একেবারে শেষকালের কবিতাগুলিতে মাঝে মাঝে কবির চেতনায় একটি অন্তহীন চৈতন্যস্বরূপের আভাস পাওয়া যায়। তাহার তুলনায় আর সমস্তই যেন মায়া-কল্পিত মরীচিকা মাত্র। এই জাতীয় কবিতার মধ্যে তাঁর প্রাক্তন জীবনের, উপনিষদের ছাপটি বেশ সুব্যক্ত হয়ে ধরা পড়ে, কিন্তু তখনি একে কর্ম্মস্রোত সম্বন্ধে তাঁর যে তত্ত্বদৃষ্টির পরিচয় আমরা দিয়েছি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বলে মনে করা যায় না। এগুলি অবস্থা বিশেষের এক একটি বিশেষ দ্যোতনা মাত্র। মূল স্রোতের গতি এতে ক্ষুণ্ণ হয় নি। অনেক কবিতা পুরাপুরি উদ্ধৃত করতে পারলে বক্তব্য কথাটি হয়ত আরও বিশদ ভাবে প্রকাশ করা যেতে পারত। কিন্তু দুটি কারণে তা সম্ভব হয় নি, একটি গ্রন্থ-বাহুল্য অপরটি বিশ্বভারতীয় গ্রন্থস্বত্বের প্রতি-অবিক্ষেপ।

আর্ট ও রবীন্দ্রনাথ

প্রাচীনেরা বলেন যে বিধাতার যে সৃষ্টি আমাদের চারিদিকে প্রসারিত হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গকে প্রলুব্ধ করে ও আমাদের চিত্তকে বিমুগ্ধ করে তাহাকে অতিক্রম করিয়া কবি-প্রজাপতি এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর উপর একটি অলৌকিক বিশ্ব রচনা করেন। এই সৃষ্টির নিয়ম বিধাতার সৃষ্টিকে অতিবর্ত্তন করিয়া যে নূতন রাজ্য নানা সূত্রজালে বিরচিত করিয়া এই জীবনকে আচ্ছাদিত করে, তাহাই কাব্যলোক বা শিল্পলোক। এই পৃথিবী আমাদের জীবন-ধারণের ক্ষেত্র। ইহারই নিয়মে সমস্ত প্রাণ পর্য্যায় একই কৌশলে নিরন্তর উৎপন্ন হইতেছে। ইহার সহিত নিরন্তর দ্বন্দ্বে আমাদের দেহ মন বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের দেহের সহিত দেহরক্ষণ, পোষণ, বিধারণের এমন একটি স্মৃতি জড়িত আছে যে সে

তাহার বলে স্বাভাবিক জীবনধারণের উপযোগী ব্যাপারে আপনাকে নিরন্তর দক্ষ করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের এই দেহ উত্তরাধিকার সূত্রে নিম্নতম প্রাণিলোক হইতে পরম্পরাক্রমে আমাদের নিকট পৌছিয়াছে। যে শিরা, যে ধমনী, যে নাড়ি, যে পেশী, যে অস্থি, যে কন্ডরা, যে স্নায়ু, প্রাণি-জগতের ইতিহাসে যে কাজের জন্য উপযুক্ত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার একটি নিভৃত স্মৃতি বাসনারূপে তাহার মধ্যে লীন হইয়া রহিয়াছে। যখনই প্রয়োজন ঘটে তখনই আমাদের দেহযন্ত্রের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন প্রকারের বাসনা, বিভিন্ন প্রকারের আকুতি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে এবং তাহার ফলে জীবনযাত্রার উপযোগী বহু কার্য্য আমাদের দেহযন্ত্র অন্য-নিরপেক্ষভাবে আপনিই করিতে পারে। ইহার সঙ্গে আমাদের মন যখন তাহার নূতন রাজ্য প্রসারিত করে এবং তাহার আপন ব্যবস্থায় আমাদের দেহযন্ত্রকে চালিত করে, তখন বহির্লোকের সহিত সংগ্রামে মানুষ অদ্বিতীয় হইয়া দাঁড়ায়। এই মনের মনন-শক্তির ফলে প্রকৃতির নানা রহস্য মানুষের নিকট প্রতিদিন আবিষ্কৃত হইতেছে এবং তাহার সুযোগ লইয়া মানুষ নানা যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। আদিম মানুষ প্রথম যখন পাথর সূচালু করিয়া কিংবা ধনুর্ব্বাণ প্রস্তুত করিয়া কিংবা দূর হইতে পাথর ছুঁড়িবার কৌশল আয়ত্ত করিয়া প্রথম যন্ত্র আবিষ্কার করে, তখন হইতেই পশুলোক মানবের নিকট পরাভূত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যন্ত্রকৌশলে যে জাতি অধিকতর সুনিপুণ সেই জাতি অপর জাতির উপর আধিপত্য করিয়া থাকে। কিন্তু দেহ বা মন উভয়ের কোনটিই যথার্থত মানুষকে পশুলোকের উপর স্থাপিত করিতে পারে না। দেখা গিয়াছে যে পশুর মধ্যেও এমন একটি বাসনা বা আকুতি আছে যাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া মানুষের মধ্যে বুদ্ধিরূপে দেখা দিয়াছে। এই বুদ্ধিবৃত্তির ফলে মানুষ পশু হইতে অধিকতর বলশালী হইয়াছে, কিন্তু পশুলোকের সহিত দ্বন্দ্বে এখনও জিতিয়াছে বলিয়া বলা যায় না। মানুষ আপন বুদ্ধিবলে বৃহৎ পশুদের নিরন্তর বধ করিয়া থাকে, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও ক্ষুদ্র কীটাণুর আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার যন্ত্র মানুষ আবিষ্কার করিতে

পারে নাই। বলের আধিক্যে বা প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারের শক্তির আধিক্যে মানুষের যথার্থ মহত্ত্ব বা উচ্চতা নির্দ্ধারিত হয় না। সাধারণত তর্কশাস্ত্রের গ্রন্থে দেখা যায় যে বুদ্ধির দ্বারাই মানুষ পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু নিম্নস্তরের বুদ্ধি যে পশুদেরও আছে তাহা অস্বীকার করা চলে না।

বস্তুতঃ যে বৃত্তি মানুষকে পশু হইতে উচ্চতর করে সে বৃত্তি শক্তি নয়, সে বৃত্তি দেহ-নিরপেক্ষ আনন্দ। পশুজাতি এবং যে পর্য্যন্ত মানুষকে পশুজাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে সে পর্য্যন্ত মানুষও, জগৎকে আপন ভোগের চক্ষুতে দেখিয়া থাকে। এই ভোগ প্রধানত ইন্দ্রিয়-লালসার অনুগামী। কিন্তু মানুষের মধ্যে আর একটি বৃত্তি আছে যাহার ফলে এই ভুবনমোহিনী প্রকৃতির শস্যশ্যামল অঞ্চল, তাহার বিচিত্র পুষ্পরাজির বর্ণচ্ছটা, গন্ধভারমন্থর বায়ুর স্পর্শ, বিহঙ্গকুলের কলকাকলী মানুষের চিত্তকে অনিমিত্ত আনন্দের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ করিয়া যায়। এই আনন্দের কোন দেহজ কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, বুদ্ধির স্পন্দনের মধ্যে ইহার মূল আবিষ্কার করা যায় না এবং আমাদের শক্তি সঞ্চয়েও ইহা কোন আনুকূল্য করে না। কেবলমাত্র মানুষই এই আনন্দের অধিকারী, এইখানেই মানুষের স্বর্গ। আমাদের দেশের প্রাচীনেরা এই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির আনন্দের সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন এবং আমাদের মধ্যে এমন একটি পৃথক সত্তার সন্ধান লাভ করিয়াছেন, যেখান হইতে এই আনন্দ নির্ঝরের ধারার ন্যায় নিরন্তর প্রস্রুত হইতেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই অন্তরুৎস ইংরেজীতে তর্জ্জমা করিতে গিয়া personality বলিয়াছেন।

যেখানে আমরা আমাদের প্রয়োজনের মধ্যে আবদ্ধ, যেখানে আমরা দেহযন্ত্রের অধীন, যেখানে সুবিধা অসুবিধার পাটোয়ারী চিন্তায় আমাদের বুদ্ধি স্পন্দিত, সেখানে এই অধ্যাত্মলোকের আভাস পাওয়া যায় না। কবিগুরু বলেন যে এই অধ্যাত্মলোকের মধ্যে আমরা যে আত্মার স্ফুরণ পাই তাহা স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন। নরলোকের মধ্যে প্রকৃতিলোকের মধ্যে তাহা নিরন্তর আপনাকে ব্যক্ত করিতেছে, কিন্তু সেই অভিব্যক্তির মধ্যে কোন প্রয়োজনের দাবী মিটাইতে হয় না। যখন আমরা

বুদ্ধির জগতে, বিজ্ঞানের আলোচনায় আমাদিগকে স্পন্দিত করিয়া তুলি, তখন যে সত্য যে শক্তির সহিত আমাদের দ্বন্দ্ব ও বিনিময় চলে, সে লোক ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই লোকের সত্যতা আমরা অনুভব করিতে পারি, কিন্তু বুদ্ধিলোকের প্রমাণের দ্বারা ইহাকে আমরা স্থাপন করিতে পারি না। চক্ষুর দ্বারা আমরা দেখি, ইন্দ্রিয়ান্তরের যোগ্য হইয়াও তাহা যদি ইন্দ্রিয়ান্তরের দ্বারা বেদ্য না হয় তবে তাহাকে আমরা বলি ভ্রম। চক্ষুতে যাহা দেখিলাম সর্প, হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া তাহা যদি দেখি রজ্জু—তবে এই সর্প দেখাকে আমরা বলি ভ্রম। আবার চক্ষুতে যখন দেখি আকাশের সূর্য্য একটি থালার মত—কিন্তু যুক্তিতে যখন দেখি তাহা পৃথিবী অপেক্ষা ৪০ লক্ষ গুণ বড়, তখন আমরা যুক্তিকেই বিশ্বাস করি এবং চাক্ষুষ জ্ঞানকে অশ্রদ্ধা করি। সাধারণত যখন আমাদের মনে কোন ইন্দ্রিয়জ প্রত্যয় উৎপন্ন হয় এবং সে প্রত্যয় কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বা বুদ্ধির দ্বারা বাধিত না হয় তখন তাহাকে আমরা সত্য বলি। ইহাই বাহ্য বিজ্ঞানের বা scieuceএর সত্য নির্দ্ধারণ প্রণালী। কিন্তু অন্তরে আমাদের অধ্যাত্মলোকে যখন আমাদের কোন একটি বিশেষ প্রকাশ, বিশেষ অনুভব উৎপন্ন হয়, তখন তাহার সত্যতার জন্য আমরা অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা করি না। কাজেই বাহ্যলোকের সত্য-নির্দ্ধারণ প্রণালী ও অন্তর্লোকের সত্য-নির্দ্ধারণ প্রণালী এক নহে। যে বৃত্তির দ্বারা মানুষ তাহার আপন আনন্দে, আপন অধ্যাত্মলোকে শিল্প বা কাব্য রচনা করিয়া থাকে, সেই বৃত্তিকে কোন বহির্লোকের প্রমাণপুঞ্জের সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া আত্ম-সংস্থাপন করিতে হয় না। জীবন যেমন আপন স্বাচ্ছন্দ্যে আপনি প্রবাহিত হয়, সেই স্বাচ্ছন্দ্য আমরা অনুভব করি, কিন্তু তাহাকে আমরা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি না, তেমনি যে ব্যক্তি আমাদের মধ্যে রসসৃষ্টি করে সে আপন স্বাচ্ছন্দ্যে আপন রচনা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, আমাদের বুদ্ধির দ্বারা আমরা তাহাকে অল্পই নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি।

"এ কী কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী,

আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই ?
অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা ল'য়ে তুমি কথা কহ,
মিশায়ে আপন সুরে।

কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীত-স্রোতে কূল নাহি পাই,
কোথা ভেসে যাই দূরে।

সে মায়ামূরতি কি কহিছে বাণী,
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি,
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি
রহস্যে নিমগন।

এ যে সঙ্গীত কোথা হ'তে উঠে,
এ যে লাবণ্য কোথা হ'তে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন কোথা হ'তে টুটে
অন্তর-বিদারণ।

নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চ'লে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণীভরে।

যে-কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে-ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এসেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।
কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কেহ এক বলে কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বৃথা বার বার,—
দেখে তুমি হাস' বুঝি।
কে গো তুমি, কোথা রয়েছ গোপনে,
আমি মরিতেছি খুঁজি।

তাঁহার Personality গ্রন্থে তিনি বলেন, "For Art, like life itself, has grown by its own impulse, and man has taken his pleasure in it without definitely knowing what it is. And we could safely leave it there, in the subsoil of consciousness, where things that are of life are nourished in the dark."

কিন্তু বর্ত্তমান যুগে যাহা সূক্ষ্ম, যাহা নিভৃতে অন্তর্লীন হইয়া রহিয়াছে, যাহা গোপনে রহস্যপুরে আপন মন্ত্রজাল সৃষ্টি করিতেছে, তাহাকে আমরা বিশ্বাস করিতে চাই না; অন্তঃপুরবাসিনীকে হাটের মাঝে আনিয়া আলো ফেলিয়া সকলের সম্মুখে তাহার ফটোগ্রাফ তুলিতে না পারিলে তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই আমাদের সংশয় হয়, কারণ আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করি।

শিল্প-সৃষ্টি সম্বন্ধে কোন বিচার উঠিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, নানা লোকে নানা আদর্শ স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন এবং যাহা আপন স্বাচ্ছন্দ্যে আমাদের গোপনে অন্তর্লোক হইতে উচ্ছ্বসিত হইতেছে তাহাকে আমাদের মুঠার মধ্যে অনিবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন। প্রজাপতির সৃষ্টির ন্যায় কবির সৃষ্টিও যে অলৌকিক এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে কোন সংশয় ছিল না। কিন্তু

পশ্চিম সাগর হইতে মেঘবিন্দু উত্থিত হইয়া আমাদের দেশে আজ করকাবৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছে। কেহ বলেন যে সর্ব্বহৃদয়-সম্বন্ধ হইলেই তাহাকে আর্ট বলা চলে; কেহ বলেন আর্ট জীবনের ব্যাখ্যা; কেহ বলেন আর্ট দৈনন্দিন সমস্যার সংশয় দূর করিবে; কেহ বা বলেন আর্ট জাতীয় চিত্তের অভিব্যক্তি। বাহির হইতে শিল্প-সৃষ্টির মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে গেলেই বিপদ অনিবার্য্য।

শিল্প-সৃষ্টির কোন লক্ষণ দিতে গেলেই এই প্রশ্ন উঠে যে কোন্ লক্ষ্যকে উদ্দেশ্য করিয়া লক্ষণ রচনা করিব। একটি স্থির রথচক্রকে বর্ণনা করিতে গেলে সেই চক্রের নেমি, অক্ষ প্রভৃতির ও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধের বর্ণনা করিতে হয়। কিন্তু ৬০ মাইল বেগে যে রথচক্র ছুটিয়াছে তাহার বর্ণনা দিতে গেলে তাহার গতির পরিমাণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং নেমি ও অক্ষের মূল্য ক্ষীণ হইয়া যায়। যে শিল্পসৃষ্টি আপন স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে ছুটিয়াছে, যে ঝরণার জল সানুগাত্র দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া ঝর্ঝর নিনাদে ফেন-ভঙ্গিতে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাকে কোনও দেশ-কালের ব্যবস্থার মধ্যে, কোনও বিশেষ স্থানীয় প্রয়োজনের বন্ধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা দুরূহ হইয়া উঠে। কোন প্রাণীর লক্ষণ দেওয়া যায় কিন্তু কোন প্রাণধর্ম্মের লক্ষণ দেওয়া দুষ্কর। এ সমস্ত স্থলে, লক্ষণ দিতে গেলেই তাহার স্ফূর্ত্ত রূপকে তার স্ফূর্ত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মৃত করিয়া লক্ষণ দিতে হয়। এইজন্য আর্টের লক্ষণ মেলা সুলভ নহে।

আর্টের কোন লক্ষণ না দিতে পারিলেও নেতিমুখে তাহার স্বরূপের বর্ণনা দেওয়া চলে। আর্ট আর কোন বস্তুর উপায় নহে; ইহা কোন সামাজিক বা কোন দৈশিক প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় নহে, কারণ অন্য-নিরপেক্ষভাবে ইহা স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত। দেশে প্রচুর ম্যালেরিয়া, লোকে কুইনাইন খাইতে চাহে না, কবি যে কুইনাইনের গান বাঁধিয়া কুইনাইন খাইতে লোকদের প্ররোচিত করিবেন এমন জবরদস্তি কবির উপর করা চলে না। ইংরেজীতে একটা কথা আছে Art for Art's sake, অর্থাৎ শিল্প-সৃষ্টি আর কাহারও অপেক্ষা রাখে না। এই অনুশাসনের বিরুদ্ধে একটা মনোভাব প্রবল হইয়া উঠে যে বিনা প্রয়োজনে

আনন্দ অনুভব করিবার আমাদের কোন অধিকার আছে কি না। অন্য কোন প্রমাণ লীলার মধ্যে অবতরণ না করিয়াও আমাদের অধ্যাত্মলোকের শিল্পসৃষ্টির স্বাচ্ছন্দ্যে আমরা এ কথা বলিতে পারি যে হৃদয়নিস্যন্দী আনন্দধারায় অভিষিক্ত হইবার অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। যদি মানুষের এ অধিকার না থাকিত তবে আমাদের অন্তরাত্মার এই আনন্দ-সৃষ্টি ব্যর্থ হইত। আমাদের দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা অকুতোভয়ে এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে রসই কাব্যের প্রাণ এবং এই রস কোন প্রয়োজন-সিদ্ধির উপকরণ নয়। এই রসোল্লাস অলৌকিক; লৌকিক কোন বন্ধনের মধ্যে ইহাকে বাঁধা যায় না। এইখানেই কবি ও প্রজাপতির সৃষ্টির পার্থক্য। এইখানেই পশু ও মানুষের পার্থক্য। পশুর সমস্ত বৃত্তি তাহার প্রয়োজন-সিদ্ধিব অনুকূলে ধাবিত হয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে অন্তর্যামীর এমন একটা স্বচ্ছন্দ, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বতন্ত্র আনন্দ-সৃষ্টি সম্ভব যাহা কোন দৈহিক বা জৈব প্রয়োজনের মধ্যে আবদ্ধ নহে। মানুষের মধ্যে তাহার ইন্দ্রিয়-বৃত্তি, তাহার জৈব বৃত্তি, তাহার মনন-বৃত্তি অতিক্রম করিয়া আর একটি স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বতঃস্ফূর্তির নির্ঝর আছে, সেইটিই আলৌকিক রসসৃষ্টির নির্ঝর। মনুষ্য জীবনের ইহাই প্রধান রহস্য। মানুষের মধ্যে ভয় আছে, শোক আছে, ক্রোধ আছে, বিস্ময় আছে, জুগুপ্সা আছে, শৃঙ্গারবৃত্তি আছে এবং সমস্ত বৃত্তিগুলি মানুষের আত্মরক্ষার সঙ্গীতে মুখর। আবার এই বৃত্তিগুলিই আর একটি রসধারায় এমন করিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে যেথানে ভয়ে ভীতি নাই, ক্রোধে দ্বেষ নাই, শোকে দুঃখ নাই, শৃঙ্গারে আসক্তি নাই। এথানে একটি নূতন মূর্চ্ছনায় রসের অন্তর্লোক এমন করিয়া উদ্ভাসিত হয় যে সকল বৃত্তির মধ্য দিয়াই আনন্দের একটি প্লাবন বহিয়া যায়। এইখানেই মানুষ তাহাকে প্রয়োজনের গণ্ডী হইতে মুক্ত করে। যে যুদ্ধ করিতে যায় সে চায় যে কাড়া-নাকাড়ার বাজনায় তাহার মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে, যে দেব-পূজা করিতে চায় সে চায় এমন একটি মন্দির করিবে যাহাতে তাহার হৃদয় ঔদাত্ত্য ও মহত্ত্বের ভারে আপনিই অবনত হইয়া পড়ে। সে চায় প্রোদ্ভাসিত ধূপ গন্ধে, বিচিত্রবর্ণের পুষ্পসম্ভারে, তাহার নিভৃত অন্তঃস্থল প্রফুল্ল

হইয়া উঠুক। মানুষের সমস্ত বৃত্তির মধ্য দিয়া মানুষ যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তাহা অনুভব করিয়া হৃষ্ট হইতে চায়। আমাদের যেটুক ধনের প্রয়োজন শুধু সেইটুকু পাইলেই আমরা সুখী হই না, আমরা চাই ধনী হইতে। যেটুকু জ্ঞানে আমাদের চলে সেইটুকুতেই আমরা সুখী হই না, আমরা চাই জ্ঞানী হইতে। আমরা যে আমাদের প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বড়, ঐটুকু অনুভব করিতে না পারিলে আমরা আমাদিগকে তুচ্ছ মনে করি। নানাবিধ তথ্যে আমাদের মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ করিয়া আমরা শান্তি পাই না, আমরা চাই নূতন কিছু করিতে, আমরা চাই সৃষ্টি করিতে। যাহা আছে তাহাতে আমাদের কুলায় না, নিত্য নূতন উপকরণ সৃষ্টি করিলে তবে আমাদের আনন্দ।

এই পৃথিবীর নিকট যখন আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া সন্নিহিত হই, তখন দেখি বর্ণ গন্ধ স্পর্শ। বৈজ্ঞানিকও ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই পৃথিবীর সন্নিহিত হন, কিন্তু এই বর্ণ গন্ধ স্পর্শের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্বন্ধ নাই। তিনি ব্যস্ত থাকেন ইহাদের অন্তর্নিহিত স্পন্দন-শক্তির পরিচয় নির্ণয়ে। স্পন্দাত্মক যাহা কিছু বহির্জগতে থাকুক না কেন, তাহার সহিত বর্ণ গন্ধ ও সঙ্গীত লোকের কি সম্পর্ক তাহা বিজ্ঞান নির্ণয় করিতে চেষ্টা করে না। বিজ্ঞান বলে, এই পরিচয়ের স্পন্দনকে লোকে দেখে লাল, এই পরিচয়ের স্পন্দনকে লোকে দেখে পীত, কিন্তু পীত ও লাল লইয়া বৈজ্ঞানিকের কোন ব্যস্ততা নাই, তাহার আদর্শ ইহাদের আভ্যন্তরীণ স্পন্দ-সত্তা লইয়া। কিন্তু আমাদের মনোলোক এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা লইয়া, এই বর্ণ গন্ধ গান লইয়া নিরন্তর ব্যস্ত থাকে। ইহাদের অন্তরালে কি স্পন্দশক্তি আছে তাহার পরিচয় আমরা সাধারণ ভাবে আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা পাই না। তাহাদের পরিচয় পাইতে হইলে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতিকে যন্ত্রের মধ্য দিয়া বিশ্লেষণ করিতে হয়। এই জগতের রূপ শব্দ গন্ধ প্রভৃতি নিরন্তর আমাদের সম্মুখীন হইয়া আমাদের অন্তরের বীণাকে ঝঙ্কৃত করিয়া, আমাদের মধ্যে নিরন্তর রসসৃষ্টি করিয়া থাকে, সেইজন্য মানুষের সহিত আমাদের পরিচয়ে আমরা যেমন নিরন্তর তাহার সহিত আমাদের প্রীতি ও স্নেহের বিনিময় করিয়া থাকি, এই

জগতের সহিত পরিচয়েও আমরা তেমনি আমাদের প্রীতির স্পর্শে এই জগৎকে অভিষিক্ত করিয়া থাকি। আমাদের সহিত এই প্রীতির সম্পর্কে চেতনাবিহীন বৃক্ষ বনস্পতি প্রভৃতি আমাদের প্রতি স্নেহ বিকিরণ করে কি না, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আমাদের ব্যবহারে আমরা তাহাদিগকে যেন মনুষ্যলোকের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই মনে করি। শকুন্তলা নাটকে, শকুন্তলা যখন আলবালে জলসেচন করেন তখন তাঁহার মনে হয় "তুবরাবেদি বিঅ মং কেসর রুক্‌খও বাদেরিদ পল্লবাঙ্গুলীহিং" বাতেরিত পল্লবাঙ্গুলী দ্বারা কেসর বৃক্ষটি যেন আমাকে আমন্ত্রণ করিতেছে। আবার শকুন্তলা বলিতেছেন, 'হলা রমণীএ কালে ইমস্‌স লদাপাঅবমিহুণস্‌স বদিঅরো সংবুত্তো জং ণবকুসুমজোব্বণা বনজোসিণী বদ্ধপল্লবদাএ উবভোঅক্‌খমো বালসহআরো' অর্থাৎ অতি রমণীয় সময়ে এই লতাপাদপযুগলের মিলন ঘটিয়াছে, এই বনজ্যোৎস্না লতাটী যেমন নব কুসুমে যৌবনবতী হইয়াছে তেমনি এই তরুণ সহকার বৃক্ষটিও বহু পল্লব বিশিষ্ট হওয়াতে ইহাকে উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কালিদাসের সমস্ত মেঘদূত কাব্যটিতে প্রকৃতি কেমন সচেতন হইয়া প্রকাশ পায় তাহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতিকে এমনি আত্মীয় করিয়া দেখিতে গেলে তাহাকে আমরা আমাদের স্বজাতীয় বলিয়া মনে না করিয়া পারি না। আমরা যেমন আমাদের অন্তর্লোকে সুখ ও দুঃখের রসে নিরন্তর নৃত্য করিয়া চলিয়াছি, আমাদের সম্মুখস্থ প্রকৃতিও তেমনি আনন্দ-লীলায় আমাদের চক্ষুর সম্মুখে নৃত্য করিয়া চলিয়াছে। এই দৃষ্টিতে বহির্লোক দেখাকে কবি বলেন তাহাদের personality স্বীকার করা।

"The world appears to us as an individual and not merely as a bundle of invisible forces. For this, every body knows, it is greatly indebted to our senses and our mind. This apparent world is man's world. It has taken its special feature of shape, colour and movement from the peculiar range and quality of our perception. It is what our sense

limits have specially acquired and built for us and walled up. Not only the physical and chemical forces but man's perceptual forces are its potent factors—because it is man's world and not an abstract world of physics and metaphysics.

কবি বলেন যে আমাদের অন্তরের জারক রসে আমাদের অনুভূতির অপরোক্ষ চেতনা সিঞ্চনে আমরা বহির্জগৎকে নিরন্তর চেতনাময় করিয়া তুলিয়া তাহাদের সহিত ভাব বিনিময় করি এবং তাহাদের অধ্যাত্মলোকের সামগ্রী করি। যতক্ষণ বহির্জগৎকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শ করি ততক্ষণ তাহারা অতিথি মাত্র; কিন্তু যখনই আমাদের অন্তরের রসের মন্ত্র আমাদের রসলোকে তাহাদের সঞ্জীবিত করিয়া তোলে তখন তাহারা হয় আমাদের রসের সামগ্রী, আমাদের বন্ধু। বহির্লোকের সহিত অধ্যাত্মলোকের এই রসাভিষিক্ত পরিচয় যত নিবিড় হইয়া উঠে, ততই মানুষ তাহার মনুষ্যত্বের উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিতে পারে।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে সূর্য্য চন্দ্র তারার সমস্ত গতাগতির বিবরণ সুনিবদ্ধ সত্যরূপে আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন্তু তথাপি তাহা সাহিত্য নহে, কিন্তু প্রভাতে অরুণোদয় কিংবা সন্ধ্যায় অস্তাচল চূড়াচ্ছটার বর্ণনা সাহিত্য, কারণ তাহাতে সূর্য্যের উদয় এবং অস্ত আমাদের অন্তরে কি আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছে তাহারই পরিচয় দেওয়া হয়। সূর্য্যের সহিত এই বান্ধবতার পরিচয় একটা নূতন সৃষ্টি। ইহা যেন দুইটী অন্তরঙ্গ চেতনের নিবিড় আলিঙ্গন। উপনিষদে লিখিত আছে, ন বা অরে মৈত্রেয়ি বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি—বিত্তের জন্য বিত্ত প্রিয় নয়, আমি বিত্তকে চাই বলিয়া বিত্ত প্রিয়। আমাদের ধনের মধ্যে আমরা আমাদের অনুভব করি এবং এই আত্মপ্রীতিই ধনপ্রীতি রূপে প্রকাশ পায়। যখন বাহিরের জগৎ আমাদের অন্তরকে বিশেষ ভাবে নাড়া দেয় তখন সেই নাড়ার মধ্যে আমাদের চেতনা উদ্দীপ্ত হইয়া আনন্দরূপে প্রকাশ পায়। বৈজ্ঞানিক যে দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখেন সেটি

রূপরসের আনন্দময় দৃষ্টি নয়, তাহা রূপ ও রসের অন্তর্নিহিত স্পন্দলোকের গাণিতিক পরিমাণ-পরিচয়ের মধ্যে নিবদ্ধ। কবি বা শিল্পী তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া তিনি যে বাহিরের জগৎকে কি চোখে দেখিয়াছেন, কি আনন্দে তাঁহার হৃদয় শিহরণময় হইয়াছে তাহারই পরিচয় দিতে চেষ্টা করেন। একটি গোলাপ কি জিনিষ, তাহার ক'টী পাপড়ি, কি রকম তার রং, তাহার গাছের পাতা কি রকম, এ একজাতীয় পরিচয়, আর গোলাপটি আমার কেমন লাগিয়াছে, তাহা অন্যজাতীয় পরিচয়। এই দ্বিতীয় জাতীয় পরিচয়, কোন ঘটনার পরিচয় নহে, কোন প্রাকৃতিক নিয়মের পরিচয় নহে, ইহা অনুভূতির পরিচয়। এ সেই জাতীয় পরিচয় যাহাতে বস্তুর পরিচয় দিতে গিয়া আমরা আমাদের নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকি। এই জন্যই এই পরিচয় অন্য সত্য হইতে এত বিভিন্ন জাতীয়। ইহার প্রামাণ্য স্বতঃ-সংবেদ্য। বাহিরের জগতের ঘটনার প্রামাণ্য তাহার অবাধিতত্বের উপর নির্ভর করে এবং সেই জন্য তাহাদের প্রামাণ্য স্বতঃস্ফূর্ত নহে। কিন্তু অনুভবের প্রামাণ্য অন্য কিছুর উপর অপেক্ষা করে না। তাই কবি বলিয়াছেন,

"সেই সত্য, যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনম স্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

আমাদের অন্তরের অনুভূতি তাহার স্বাচ্ছন্দ্যে এবং তাহার লীলায় আপনাকে প্রকাশ করিয়া আনন্দ অনুভব করে, তাহার পিছনে কোন প্রয়োজনের তাগিদ নাই। মোগলেরা যখন ভারতবর্ষে রাজ্য করিত তখন অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক যুদ্ধ, অনেক প্রিয় অপ্রিয় ঘটনা ঘটিয়াছিল, তথাপি তাহারা ছিল দেশের মানুষ। এই দেশকে তাহারা ভালবাসিত এবং অন্তরের স্বপ্ন শিল্পের ভাষায় প্রকাশ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিত। কিন্তু ইংরেজ আসিয়াছে এখানে বাণিজ্য করিতে, তাই ইংরেজ যখন দরবারী ঠাট চালাইতে চেষ্টা করে তখন তাহার মধ্যে প্রাচীন বাদশাহী ঔদার্য্যের পরিবর্ত্তে শুষ্ক আফিসের তুচ্ছতা প্রকাশ পায়।

ইংরেজের কাছে ভারতবর্ষের প্রকৃতি আনন্দের ধন নহে, তাহার কাছে ইহা একটি বিরাট ব্যবসার ক্ষেত্র মাত্র। তাই ইংরেজ এদেশে প্রাসাদের পরিবর্ত্তে গুদাম নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

আমাদের অন্তরের অনুভূতিকে আমাদের অধ্যাত্মলোকের রসস্পর্শকে আমাদের আনন্দ-পুরুষের স্বচ্ছন্দ ব্যক্তিকে প্রকাশ করার ভঙ্গিকে আর্ট বলা যাইতে পারে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি আর্টের উদ্দেশ্য, কিন্তু কবিগুরুর মতে এ কথা ঠিক নহে। যে উপায়ে বা প্রকারে, যে দ্বার পথে আমাদের অধ্যাত্মলোক আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, আমাদের অধ্যাত্ম ব্যক্তি তাহার রসালোড়নের পরিচয় দিয়া থাকে, তাহাই আমাদের নিকট সুন্দর বলিয়া মনে হয়। এইজন্য সৌন্দর্য্যকে উদ্দেশ্য বা উপেয় বলিয়া স্বীকার করা যায় না, সৌন্দর্য্য উপায় মাত্র। আমাদের অধ্যাত্ম ব্যক্তির অনুভব কোন বিশ্লেষণ নয়; তাহা রসের মূর্ত্ত স্পর্শ। সেই জন্য কবি আপনাকে ছবিতে ও গানে প্রকাশ করিয়া থাকেন। কবি বলিতেছেন—

The principal object of art being the expression of personality and not of that which is abstract and analytical, it necessarily uses the language of picture and music. This has led to a confusion in our thought that the object of art is a production of beauty; whereas beauty in art has been the mere instrument and not its complete and ultimate significance.

সচ্ছিদ্রকুম্ভে জল ঢালিলে যেমন ঢালার শেষ হয় না পণ্ডিতবর্গের মধ্যে তেমনি সাহিত্য ক্ষেত্রে মতদ্বন্দ্বের শেষ নাই। কেহ বলেন কবির বক্তব্য বিষয়ই তাহার আর্টের পরিচয়; কেহ বলেন বক্রোক্তিই কাব্যের জীবিত; কেহ বলেন অলঙ্কারবাহুল্যই কাব্যের শিল্পত্বের পরিচায়ক। বস্তুতঃ এই জন্যই এ সমস্ত তর্ক ভিত্তিবিহীন যে, কোনও বহিঃকল্পিত উদ্দেশ্য শিল্পের যথার্থ স্বরূপকে প্রকাশ করিতে

পারে না। আত্মানুভব যখন আপন স্বাচ্ছন্দ্যে স্বপ্রকাশ হইয়া উঠে তখনই তাহা হয় শিল্প, সেই শিল্পের ভঙ্গির মধ্যেই বক্রোক্তি থাকিতে পারে, অনুপ্রাস থাকিতে পারে, উপমা থাকিতে পারে, বস্তু ব্যঞ্জনা থাকিতে পারে; কিন্তু সেগুলি আত্মানুভবের স্বপ্রকাশের ভঙ্গি মাত্র; আর্টের আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায় বা অবয়ব মাত্র, তাহারা আর্টের নিয়ামক ধর্ম্ম নহে।

লক্ষণ দিতে গেলেই লক্ষ্য বস্তুর বিশেষ বিশেষ প্রাণপ্রদ ধর্ম্মকে বিশ্লেষণ করিয়া পৃথক করিতে হয়। কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে আর্টের স্বরূপ থাকে না। এইজন্য আর্টের কোন প্রাণপ্রদ ধর্ম্মকে পৃথক করিয়া আর্টের লক্ষণ দেওয়া চলে না। আর্টের মধ্যে এমন একটি ঐক্য আছে যে বিশ্লেষণ করিতে গেলেই সে ঐক্য ব্যাহত হয়। যখন কোন পানকরস আমরা পান করি তখন সেই তরল দ্রব্যের মধ্যে শর্করা, এলা, মরিচ প্রভৃতি নানাবিধ বস্তুজাত মিশ্রিতভাবে রহিতে দেখিয়া থাকি, কিন্তু পান করিবার সময় তাহাদের পৃথক আস্বাদগুলি একত্র নিমগ্ন হইয়া একটি অখণ্ড অপূর্ব্ব আস্বাদে প্রকাশ পায়। আমরা যখন দুগ্ধ পান করি তখন দুগ্ধের মধ্যে যে বহুবিধ দ্রব্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জড়িত রহিতে দেখি তাহাদের প্রত্যেকের আস্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব নয়, একটি অখণ্ড রসই আমরা আস্বাদ করিয়া থাকি, তেমনি আর্টকে বিশ্লেষণ করিলে যে যে উপাদান পাওয়া যায়, সেই সেই উপাদানের সমষ্টিতে বা পৃথকগ্রহণে আর্টকে পাওয়া যায় না। আর্ট সমষ্টি নহে, আর্ট একটি অখণ্ড ঐক্য; আর্ট একটি অখণ্ড ঐক্য বলিয়াই তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী বিভিন্ন উপাদানের সঞ্চয়নে আর্টের পরিচয় হয় না।

বাহিরের জগতের সহিত তরু পুষ্প ও বিহঙ্গের সহিত যখন আমরা একান্ত বন্ধুভাবে সন্নিহিত হই এবং আমাদের অন্তরের রসে বাহিরের জগৎ অভিষিক্ত হইয়া উঠে, তখন বাহিরের জগতের যে প্রাণপ্রদ ধর্ম্মটি আমাদের হৃদয়কে আলোড়িত করে সেই আলোড়ন যখন স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশে নির্ঝর-ধারায় নামিয়া আসে তখন তাহা হয় আর্ট। যে যথার্থ শিল্পী নয়, সে যদি একটি গাছ আঁকিতে যায়, তবে তাহার অনুলিপি মাত্র করিবে, কিন্তু কোন শিল্পী যদি সেই গাছ আঁকে

তবে তাহাতে অনুকরণের বাহুল্য না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের চেতনার অনুরণনে তাহা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। এই জন্যেই আর্টের মধ্যে তথ্যের বাহুল্য নাই অথচ ব্যঞ্জনার প্রাগ্‌ভারে তাহা ভূয়িষ্ঠ। শিল্পীর অন্তরের সহিত বাহ্য জগতের অন্তরের যে সন্নিধান ও প্রসন্নতা আনন্দে প্রচুর হইয়া উঠে তাহারই আবেগ আর্টের মধ্য দিয়া প্রকাশ লাভ করে। কিন্তু তাই বলিয়া একথা বলা যায় না যে, আর্টের অভ্যন্তরে কোন তত্ত্ব নাই বা সত্য নাই। আর্টের মধ্যে যে সত্য আছে তাহা আমাদের জীবনের অনুভবের সত্য। সে অনুভব তথ্য নয়, অনুকৃতি নয়, তাহা আমাদের অন্তরের আলোকে নির্ভাসিত। কবি মধ্য যুগের কোন মহিলা কবির একটি কবিতা ইংরেজীতে তর্জ্জমা করিয়া ইহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

I salute the life which is like a sprouting seed,
With its one arm upraised in the air, and the
other down in the soil ;
The life which is one in its outer form and its inner sap ;
The life that ever appears, yet ever eludes.
The life that comes I salute and the life that goes ;
I salute the life that is revealed and that is hidden
I salute the life in suspense, standing still like a mountain,
And the life of the surging sea of fire ;
The life that is tender like a lotus, and hard
like a thunder-bolt.

উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন, 'কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ' যদি এই আকাশ আনন্দময় না হইত তবে আমরা বাঁচিতাম কি করিয়া? শিল্পীর চক্ষুতে সমস্ত প্রকৃতি আনন্দময়। প্রকৃতিকে আপন আনন্দের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারাই শিল্পীর সার্থকতা। আমাদের অন্তরের মধ্যে

বহির্জগতের যে একটি আনন্দময় পরিচয় আছে, শিল্পী তাহারই আভাষ দিতে চেষ্টা করেন—

"There falls the rhythmic beat of life and death :
Rapture wells forth and all space is radiant with light.
There the unstruck music is sounded ; it is the love music of three worlds.
There millions of lamps of sun and moon are burning ;
There the drum beats and the lover swings in play.
There love songs resound, and light rains in showers."

পাখীও আকাশে ওড়ে এবং বিমানপোতও আকাশে ওড়ে—কিন্তু আমাদের অন্তরের মধ্যে এ উভয়ের পরিচয় এক নহে।

"বিধাতার দান পাখীদের ডানা দুটি।
রঙের রেখায় চিত্র-লেখায় আনন্দে উঠে ফুটি;
তারা যে রঙীন পান্থ মেঘের সাথী।
নীল গগনের মহা পবনের যেন তারা এক জাতি।
তাহাদের লীলা বায়ুর ছন্দে বাঁধা
তাহাদের প্রাণ, তাহাদের গান আকাশের সুরে সাধা।
তাই প্রতিদিন ধরণীর বনে বনে
আলোক জাগিলে এক তানে মিলে তাহাদের জাগরণে।
মহাকাশ তলে যে মহা শান্তি আছে—
তাহাতে লহরি কাঁপে থরথরি তাদের পাখার নাচে।"

আর বিমান-পোতের কথা বলা যায়,

"তারে প্রাণ দেব করে নি আশীর্ব্বাদ।
তাহারে আপন করেনি তপন মানেনি তাহারে চাঁদ।
আকাশের সাথে অমিল প্রচার করি।

কর্কশ স্বরে গর্জ্জন করে বাতাসেরে জর্জ্জরি
আজি মানুষের কলুষিত ইতিহাসে,
উঠি মেঘলোক স্বর্গ আলোকে হানিছে অট্ট হাসে।
যুগান্ত এল বুঝিলাম অনুমানে।
অশান্তি আজ উদ্যত বাজ কোথাও না বাধা মানে;
ঈর্ষা হিংসা জ্বালি মৃত্যুর শিখা,
আকাশে আকাশে বিরাট বিলাসে জাগাইল বিভীষিকা।"

প্রাচীন ভারতবর্ষের হিমালয়ের সানুতলে শালকুঞ্জের ছায়াতলে নীবারক্ষেত্র বেষ্টিত নিভৃত তপোবন-কুঞ্জে মানুষ ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মকে চারিদিকে প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল, যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু য ওষধীষু যো বনস্পতিষু যো বিশ্বম্ ভুবনম্ আবিবেশ, অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টঃ রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, তখন হইতেই ভারতবর্ষীয়দের সাহিত্যে ও শিল্পে এই ভুবনের অন্তর্য্যামী ও মানুষের অন্তর্য্যামী এই উভয়ের মধ্যে চিত্ত-বিনিময় আরম্ভ হইয়াছে। এই যে উভয় জগতের মধ্য দিয়া একই অন্তর্য্যামীর আত্মবিনিময়ের প্রকাশভঙ্গি ইহাই আর্টের লীলা-নিকুঞ্জ। মানুষ নিরন্তর অনুভব করে যে, যে মুষ্টিমেয় শক্তিপুঞ্জের মধ্যে তাহার জীবনযাত্রার সঙ্গতি নিহিত রহিয়াছে, তাহাকে অতিক্রম করিয়া তাহার মহত্ত্ব। আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে আমরা দেখিতে পাই যে, সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার প্রতি কবিদের কোন লক্ষ্য নাই। তাঁহারা চান ধীরোদাত্ত, ধীরোললিত নায়ক; বড় বড় রাজাদের জীবন ব্যাপার লইয়া তাহাদের নাট্য; জীমূতবাহনের ন্যায়, রামচন্দ্রের ন্যায় মহাপুরুষদের অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের চরিত্র অঙ্কন পদ্ধতি। মানুষের মধ্যে যে মহত্ত্ব এবং ঔদাত্ত্য আছে সকল মানুষকে অতিক্রম করিয়া যে তেজোভিভাবিত্ব, অধৃষ্যত্ব ও অভিগম্যত্ব আছে, যাহার সম্মুখে আসিয়া কবি অনুভব করেন যে তাঁহাদের চরিত্র অঙ্কন করিবার চেষ্টা তাঁহার চাপল্য মাত্র—"রঘুণাম অন্বয়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্ বিভবোঽপি সন্। তদ্গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ॥" সেই মহৎ চরিত্রকে অঙ্কিত করিয়া

কবি আপনাকে ধন্য মনে করেন। মানুষের মধ্যে যাহা কেবলমাত্র সর্ব্বজীব-সাধারণ ধর্ম্ম তাহা আমাদের অন্তরকে তেমন স্পর্শ করে না, যেমন স্পর্শ করে তাহাদের অতিমানুষ ধর্ম্ম। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটি বাড়তি মানুষ আছে, একটি অতিমানুষ আছে। বেদের ঋষি বলিয়াছেন,

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ
স ভূমিং বিশ্বতোবৃত্ব অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলং
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চভব্যং
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি।

আমাদের এই দশাঙ্গুলি পরিমিত হৃৎপুণ্ডরীকের মধ্যে যিনি বাস করিতেছেন তিনিই সহস্রশীর্ষা মহাপুরুষ। তিনিই এই পৃথিবীর সমস্ত বস্তুরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন ও জন্মমরণের মধ্য দিয়া আপনার বিচিত্র রূপ প্রদর্শন করিতেছেন এবং তিনিই অমৃতময় হইয়া সকল সত্যের পরম নিদান হইয়া রহিয়াছেন। মানুষ আপনার মধ্যে এই অজর অমরকে প্রত্যক্ষ করে তাই সে প্রয়োজনের সীমাকে অতিক্রম করিতে চায়, তাই সে এমন বল চায়—যে বলে তার প্রয়োজন নাই, এমন জ্ঞান চায়—যে জ্ঞানে তার কোন আবশ্যকতা নাই—এমন ধন চায় যে ধন সে বিলাইয়াও শেষ করিতে পারিবে না। প্রতিনিয়ত মৃত্যু দেখিয়াও সে চায় সে অমর হইবে। দেহে যদি অমর না হইতে পারে তবে অন্ততঃ কীর্ত্তিতে সে অমর হইবে। অষ্টাদশ বর্ষের রাজস্ব ব্যয় করিয়া সে তোলে সমুদ্র প্রান্তরে কোনারকের অভ্রভেদী মহামন্দির, মিশরের নীল নদীতীরে সে তোলে অভ্রভেদী পিরামিড্, সে লিখিয়া যায় তার ইতিবৃত্ত কোটি কোটি ইষ্টক ফলকে। প্রতিদিনের জনতার মধ্যে গবাক্ষবিহীন মন্দির তুলিয়া সে তাহার আপন পার্থক্যের অনুভব, আপন স্বতন্ত্রতার অনুভব, আপনার নিঃসঙ্গতার অনুভব সূচনা করিতে চায় তার দেবমন্দিরে। মন্দিরের ঘণ্টা-ধ্বনি প্রতিনিয়ত লোককে এই কথা জানাইয়া দেয় যে মহাশূন্যতা পরিপূর্ণ করিয়া এক মহান্ আহ্বান ধ্বনি তার অন্তরে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে। মানুষের মধ্যে তাহার সমস্ত

প্রয়োজন বৃত্তিকে অতিক্রম করিয়া এই যে এক মহামানব মহাদেব, মহা অন্তর্য্যামী অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টিতে নিরন্তর এই বাহ্য জগৎ অলৌকিক জগতে পরিণত হইতেছে। তিক্ত, কটু, কষায়, লবণাম্ল রস মধুর রসের আপ্লাবনে পূর্ণ হইতেছে। এই আপ্লাবন ভূমি আর্টের ভূমি। এই অমৃতময় পুরুষের আস্বাদনই আর্ট। সেই জন্য আর্ট সৃষ্টি করে এবং আর্টের যে আস্বাদ আমরা গ্রহণ করি তাহা অমৃতত্বের রেখায় অভিনন্দিত। তাই যাহা তুচ্ছ যাহা ক্ষণিক, যাহা মুহূর্ত্তের তাগিদের জিনিষ, যাহা প্রয়োজনের ক্ষুধায় ক্ষুধার্ত্ত, তাহাকে লইয়া আর্ট সফলকাম হইতে পারে না। অমৃতের আস্বাদন শাশ্বতের স্পর্শে দীপ্ত। কোন প্রাচীন আলঙ্কারিক বলিয়াছেন—

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ
স যৎ প্রমাণং কুরুতে বিশ্বং তৎপরিবর্ত্ততে।

অপার কাব্য সংসারে কবিই প্রজাপতি, তাহার যাহা স্বানুভূত প্রত্যক্ষ তাহাতেই বিশ্ব পরিবর্ত্তিত হয়। উপনিষদের কবি বলিয়াছেন—

বেদাহমেতম্ পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভিতরে বাহিরে এই অমৃতময় পুরুষের স্পর্শলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত কাব্য, তাঁহার শিল্প তাঁহার সমস্ত চিত্তস্ফুরণ এই মহা অমৃতের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তাই তাঁহার বাণী চিরন্তন, অক্ষয় ও শাশ্বত। ভিতরে বাহিরে তিনি এই অন্তর্য্যামী পুরুষকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাঁহার সমস্ত উচ্ছ্বাস ইহারই আনন্দে উদ্বেলিত। প্রথম যেদিন প্রভাত-উৎসব লেখেন, তখন তিনি লিখিয়াছিলেন,

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি',
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি।

এই একটি ভাব সমস্ত জীবন বহিয়া গভীর হইতে গভীরতর হইয়া চলিয়াছিল; ইহারই মধ্যে, এই প্রকৃতির মধ্যে, এই মানুষের মধ্যে, ভিতরে বাহিরে তিনি অন্তর্য্যামীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। পরমগুরু রবীন্দ্রনাথের দেহযন্ত্রের মধ্য দিয়া ভিতরে বাহিরে অন্তর্য্যামীর যে আত্মপ্রকাশ, যে কাব্য, সঙ্গীত, চিত্র ও ভাব প্রবাহের আনন্দ-লীলা নির্ঝরের ধারায় প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে তাহাই রবীন্দ্রনাথ। তাই তিনি শরীরী হইয়াও অশরীরী, ক্ষয়িষ্ণু হইয়াও অক্ষয়, মৃত্যুর পাশগত হইয়াও তিনি মৃত্যুঞ্জয়।